তিনশতকের রিষড়া
ও
তৎকালীন সমাজ চিত্র
(দ্বিতীয় খণ্ড)

বিংশ শতাব্দী

শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী

প্রথম প্রকাশ ঃ
দোল পূর্ণিমা,
২রা চৈত্র, ১৩৮২

প্রকাশক ঃ
রিষড়া সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
পরিষদের পক্ষে—

যুগ্মসম্পাদক ঃ
শ্রী দেবানন্দ ব্রহ্মচারী,
শ্রী রমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
প্রেম-মন্দির। ৫ নং শ্রীমানি
ঘাট লেন, রিষড়া-হুগলী।

প্রচ্ছদ পট ঃ—
শিল্পী—শ্রী পশুপতি কুণ্ডু।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রী শ্যামল কুমার দেব।
স্মৃতি-প্রেস।
৩ নং জি, টি, রোড,
কোন্নগর, হুগলী।

ব্লক মুদ্রণ ঃ
প্রিন্টার্স উইং
১২১, ঠাকুরবাটী স্ট্রীট,
শ্রীরামপুর।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। প্রেম-মন্দির, রিষড়া।
২। বাণী বিতান।
৩৬ নং জি, টি, রোড, রিষড়া।

আমাদের কথা।

রিষড়া সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদের প্রথম কার্যক্রম হিসাবে আমরা রিষড়ার স্থায়ী অভাব পুরণ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী রচিত 'তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র' নামক ইতিহাস গ্রন্থটির প্রকাশনার ভার গ্রহণ করি। আমাদের সে উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে গত ৩৮।৭৫ তারিখে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন যে ইতিহাস বলতে সাধারণতঃ রাজারাজড়াদের কাহিনীই বোঝায়। লেখক কিন্তু সেই প্রচলিত পথে না গিয়ে সাধারণ মানুষের তৎকালীন আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতি এবং কয়েটি বংশের বিবরণ ও রিষড়ার সুসন্তানগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রামাণ্য গ্রন্থাদি থেকে সংকলন করে পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া রিষড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু লুপ্তপ্রায় ও অজ্ঞাত তথ্যও তিনি পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে। তাঁর এই দীর্ঘ পরিশ্রম ও সার্থক প্রচেষ্টার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং রিষড়ার নাগরিকবৃন্দকে লেখকের এই মহৎ কার্যে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের আহ্বান জানান।

(আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগের অনুপস্থিতিতে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন উপলক্ষে হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় বলেন যে বাংলাদেশের মধ্যে হুগলী জেলা বিশেষতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী গ্রাম ও শহরগুলি শিক্ষা সংস্কৃতি ও বহু মনীষীর জন্মভূমি হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। লেখকের রচিত এই আঞ্চলিক ইতিহাস যে হুগলী জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। লেখকের প্রশংসনীয় অনুসন্ধিৎসা ও উদ্যমকে তিনি বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। তাঁর বিশ্বাস এই গ্রন্থের মাধ্যমে এতদঅঞ্চলে রিষড়া তার যথাযোগ্য গৌরবময় স্থান অধিকার করবে।

সভাপতি হিসাবে শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন যে লেখক রিষড়াকে কেন্দ্র ক'রে এতদঅঞ্চলের প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাতে তিনি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছেন। বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ এই ইতিহাস গ্রন্থের তিনি বহুল প্রচার কামনা করেন।

এই প্রসঙ্গে রচিত স্মরণিকা গ্রন্থের উদ্বোধন উপলক্ষে স্থানীয় পৌর প্রধান শ্রীযদুগোপাল সেন লেখকের দীর্ঘ পরিশ্রমের সার্থক রূপায়ন লক্ষ্য করে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং লেখকের কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে মাল্য ভূষিত করেন। (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হওযায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আশাকরি রিষড়ার স্থায়ী ও নবাগত অধিবাসীরা প্রত্যেকে এই ইতিহাস গ্রন্থটি সংগ্রহ ক'রে লেখকের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা দান করবেন।

যে সমস্ত নাগরিক ও পরিষদের সভ্য ইতিমধ্যে আর্থিক সাহায্য ও সদুপদেশ দানে আমাদের প্রারব্ধ কাযকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করেছেন তাঁদের আমরা এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই।

নমস্কারান্তে—

প্রেম-মন্দির, রিষড়া।
দোশরা চৈত্র, ১৩৮২।

শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীরমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক।

অভিমত।

৬। **উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মিলন। (২৯।১১।৭৫)**

"আপনার বহু শ্রমসহকারে রচিত গবেষণা মূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থে ··· রিষড়া শহরের তিনশতকের বহু লুপ্ত ও জ্ঞাতব্য তথ্য ইহার মধ্যে সংযোজিত করিয়া হুগলী জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি ······ গ্রন্থের চিত্রগুলি ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

নমস্কারান্তেঃ— শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায় [সভাপতি]

চানক, পার্করোড বারাকপুর ৩১।১২।৭৫

৭। আপনার সঙ্কলিত 'তিন শতকের রিষড়া' গ্রন্থখানি অমূল্য সম্পদ। আপনার জীবন সাধনার দ্বারা রিষড়ার ইতিহাসের যে ভিত্তি গ্রথিত করিয়াছেন— তাহা প্রস্তরের ন্যায় উপাদানে গ্রথিত হইয়া বহু যুগকে আলোকিত করিবে— তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের আশায় রহিলাম"

ইতি— শ্রদ্ধানত শ্রীকানাই ঘোষ।

স্থানাভাব বশতঃ পত্রগুলির সংক্ষিপ্তকরণের ত্রুটি মার্জ্জনীয়— লেখক।

লেখকের নিবেদন

গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে যে সমস্ত সুধী, সাহিত্যিক, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাঁদের অভিমত ও শুভেচ্ছার বাণী পাঠিয়ে আমাকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

যে দুরূহ কার্য আমি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম, ভগবৎ কৃপায় তার উদ্‌যাপন করতে পারায় নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করছি। রিষড়ার প্রত্যেকটি পরিবারে বইখানি স্থান পেলে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফলতা লাভ করবে।

অনিবার্য কারণে দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে - সে ত্রুটি মার্জনীয়। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাগুলি আলোচনামূলক না হয়ে কেবলমাত্র তথ্যমূলক হওয়ায় পাঠকবর্গের হয়তো কিছুটা অসুবিধার কারণ হবে কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ফলে ১৯৬৫ র পরিবর্তে রিষড়া পৌরসভা ১৯৬৬ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। ১৯৭৫ সালটি তার অস্তিত্বের ও কর্মধারার হীরক জয়ন্তী বর্ষ। তারই স্মারক হিসাবে রবীন্দ্রভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ।

একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার্য যে পৌরসভা কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ সাহায্য না করলে দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ৫্ টাকা ধার্য করা সম্ভব হত না।

যে সমস্ত পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থমধ্যে তাঁদের বংশের বা পিতৃগণের সংস্থার উল্লেখ না থাকার ফলে অসন্তুষ্ট হবেন তাঁদের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন যে এই গ্রন্থটি একটি আংশিক চিত্র মাত্র এবং রিষড়ার একটি সাংস্কৃতিক অভাব পূরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমার সে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী

ইতি—

বিনীত— লেখক

শ্রী কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী

৩৫ নং দেওয়ানজী ষ্ট্রীট
রিষড়া-হুগলী।
দোলপূর্ণিমা, ২রা চৈত্র, ১৩৮২।

প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি
(অভিমত)

১। কলকাতা ৭০০০৩২/২৯.৯.৭৫

আপনার নিষ্ঠা, সততা ও দেশের ইতিহাস—ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আশাকরি শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হবে।" শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানবেন। ইতি— বিনয় ঘোষ।

৪৭/৩ যাদবপুর সেণ্ট্রাল রোড, কলিকাতা।

২। ১৪/২ ভট্টাচার্যপাড়া লেন,
শাঁতরাগাছি, হাওড়া-৪ ৬/১০/৭৫

"এমন নিপুণ ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান, বিশেষতঃ একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে অবলম্বন করে, এমন গভীর অনুসন্ধান আমি অন্য কোথাও লক্ষ্য করিনি। শুনেছি আপনি বৃদ্ধ। আপনার পক্ষে এমন একটি পরিশ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।"

ইতি— ভবদীয়—
শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(M. A. Ph. D., Head of Deptt. of Modern Indian Languages, Dean of the faculty of Fine Arts & Music, Uuiversity of Cal.)

৩। "আপনার লিখিত 'প্রথমখণ্ড' অত্যন্ত সুখপাঠ্য। এ ছাড়া আমার মনে হয় যে, এই পুস্তকটি তদানীন্তন কালের হুগলী তথা বাংলার ইতিহাস। আপনার উদ্যম, অধ্যাবসায় এবং প্রচেষ্টার সার্থক রূপ দিতে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে বা হচ্ছে তার জন্যে আপনি সমস্ত রিষড়া বাসীর পুরোধা হিসাবে আগামীদিনের রিষড়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এই প্রার্থনা করি"

এস, মুখার্জ্জি, ১/৯/৭৫
সিকিউরিটি অফিসার, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া।
কলিকাতা।

৪। "I congratulate you for bringing out this excellen Volume. One can easily realisse how much time, energy and labour are involved to write a history of this nature. We are partiuularly interested to see some of the news of Serampore and the missionaries of the 19th Ceentury.

with all good wishes. T. V. Philip
Principal (Aetg)

সূচীপত্র

(বিংশ শতাব্দী)

সমাপ্ত।

অৰ্দ্ধনারীশ্বর মন্দির—১৯৬৪

রিষড়া প্রেমমন্দিরের সৌজন্যে।

চম্পাবিবির দরগা পৃঃ—২৯
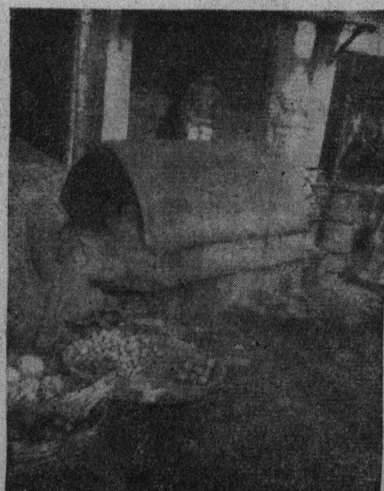
অবিরাম সাইকেল চালনায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ। পৃঃ—৪৯৫
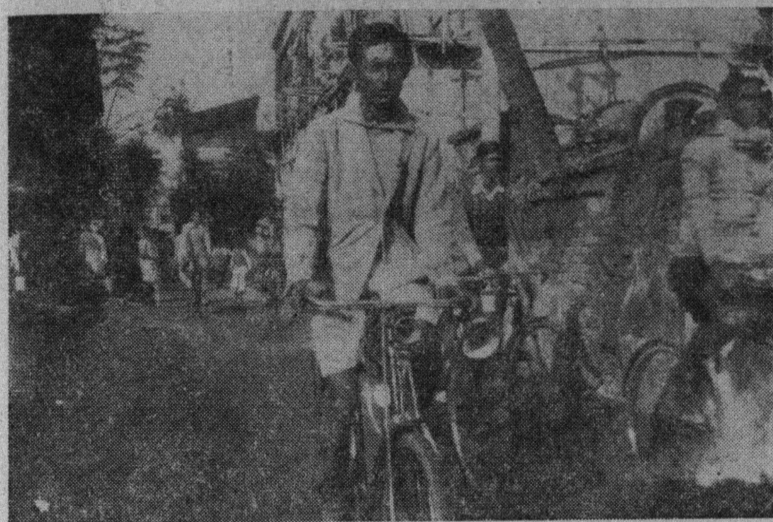
১০।১২।৩৩ তারিখে গৃহীত চিত্র। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

পদব্রজে কাশীধাম যাত্রায় অংশ গ্রহণকারীগণ। পৃঃ—৪৭৫

বামদিক থেকে—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনীরোদবরণ চক্রবর্ত্তী
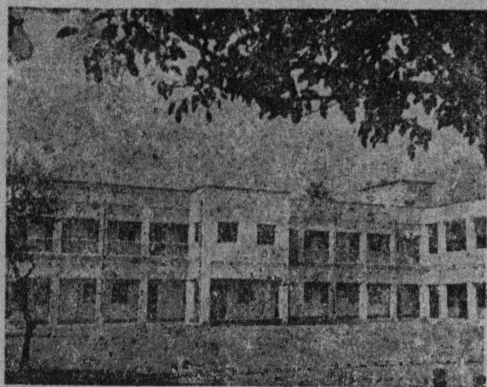
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়—১৯৫২
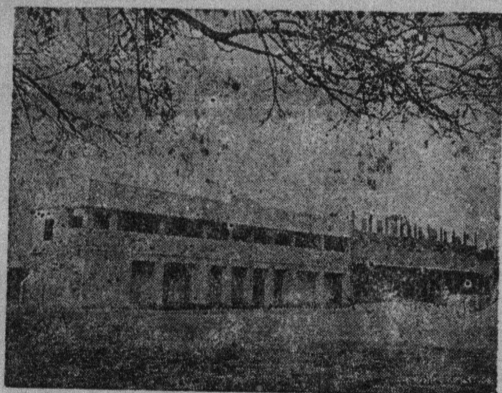
বিদ্যাপীঠ—১৯৫২

দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান। পৃঃ১৭৪

শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

বিশিষ্ঠ বীমা বিশেষজ্ঞ

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীসুধীর কুমার মিত্র
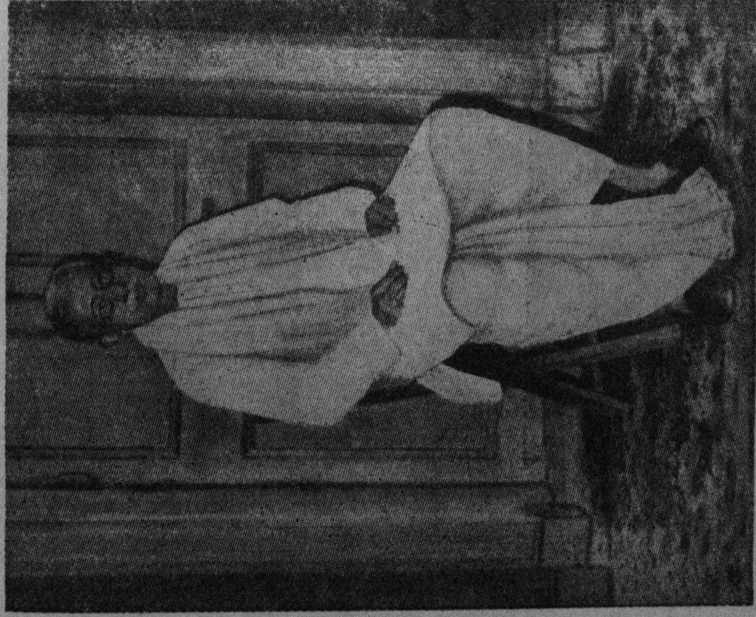
৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সোনাবাবু) পৃঃ— ৬৭৬

বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকা লেখক ও উদ্বোধন উৎসবে প্রধান অতিথি

পৌর-সভাপতিগণ

১৯১৫—১৯১৭

প্রথম সভাপতি—মিঃ পি, টী, রোজ

সভাপতি—মিঃ ই, হেওয়ার্ড

১৯১৭—১৯১৯

সভাপতি

মিঃ টি, ডব্লু, পামার

১৯১৯—১৯২৩
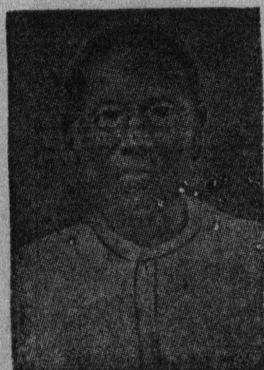
অস্থায়ী সভাপতি—৺পূর্ণ চন্দ্র দাঁ

১৯১৮

অস্থায়ী সভাপতি—৺নৃসিংহদাস বসু

১৯২০
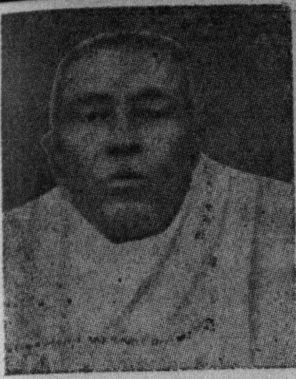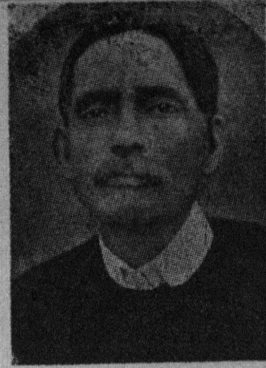
অস্থায়ী সভাপতি
শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়
১৯২৩

সভাপতি
৺বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯২৩-১৯২৯

সভাপতি
ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষাল
১৯২৯ ও ১৯৩৪-৪০

সভাপতি
৺নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৩২-৩৯, ১৯৪০—৪৪
১৯৪৯—৫৪ (মৃত্যুপর্য্যন্ত)

সভাপতি
৺বটকৃষ্ণ ঘোষ
১৯৪৫—১৯৪৯
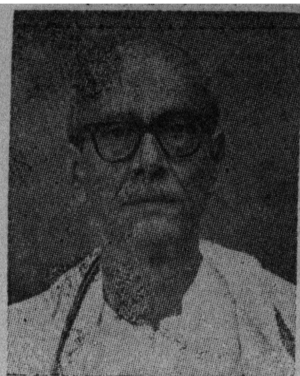
অস্থায়ী সভাপতি
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৪৭
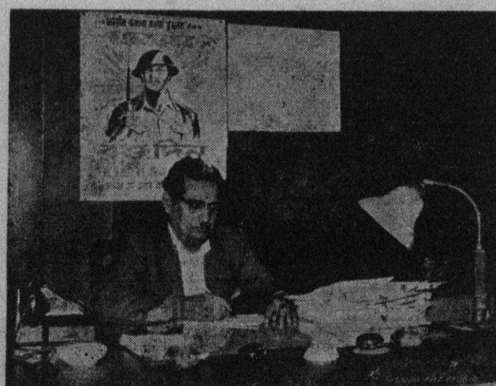
সভাপতি ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২।৩।৬৩ – ১।৭।৬৭
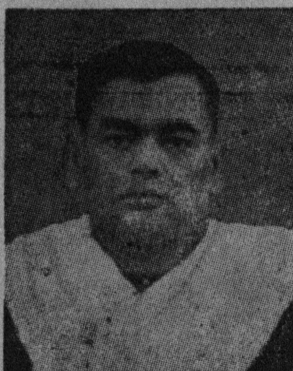
সভাপতি
৺সুশীল চন্দ্র আওন
৯৫৪—১৯৬৩ (মৃত্যুপর্যান্ত)
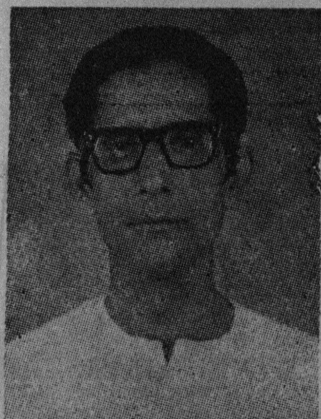
বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযদুগোপাল সেন
২।৭।৬৭ থেকে অদ্যাবধি ।

পৌর সহ-সভাপতিগণ
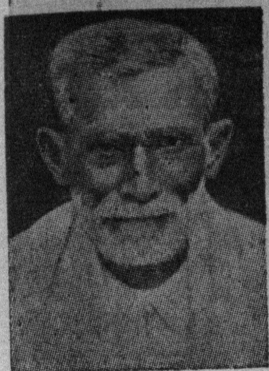
সহ-সভাপতি
৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
১৯২১—১৯২৫

সহ-সভাপতি
৺রাধারমণ লাল
১৯২৫-২৮, ১৯৪৮-১৯৬৩
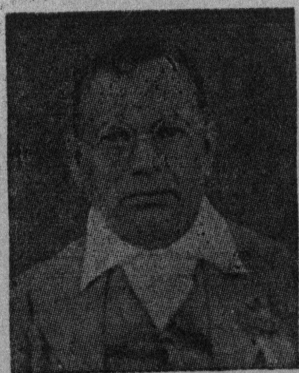
সহ-সভাপতি
ডাঃ প্রাণতোষ লাহা
১৯২৮, ১৯৩৪—১৯৪৫

সহ-সভাপতি
৺অতুলচন্দ্র হড়
১৯২৯—১৯৩৪

পৌর সহ-সভাপতিগণ

সহ-সভাপতি
৺শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৪৫—৪৮
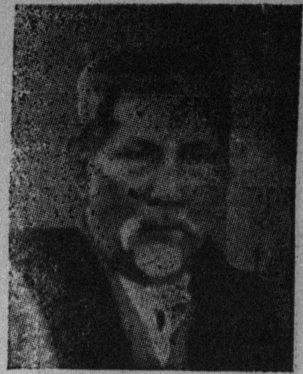
অস্থায়ী সহ-সভাপতি ১৯৫৪
জনাব ইব্রাহিম খাঁ

অস্থায়ী সহ-সভাপতি
শ্রীপঞ্চানন দাঁ
১৯৫৭
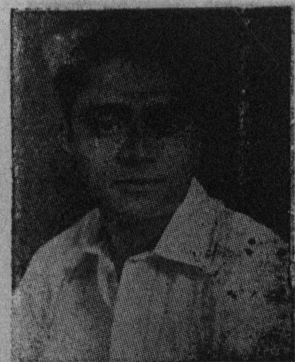
অস্থায়ী সহ-সভাপতি
শ্রীগীতানাথ দাস ১৯৬০—৬১

(আলোক চিত্রগুলি পৌরসভার সৌজন্যে প্রাপ্ত)
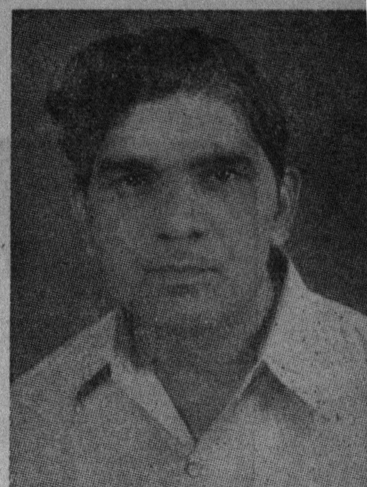
সহ-সভাপতি জনাব মহম্মদ সিদ্দিক।
১৯৬১—১৯৬৭

বর্ত্তমান সহ-সভাপতি শ্রীকাশীনাথ সি
২।৭।৬৭ থেকে অদ্যাবধি।
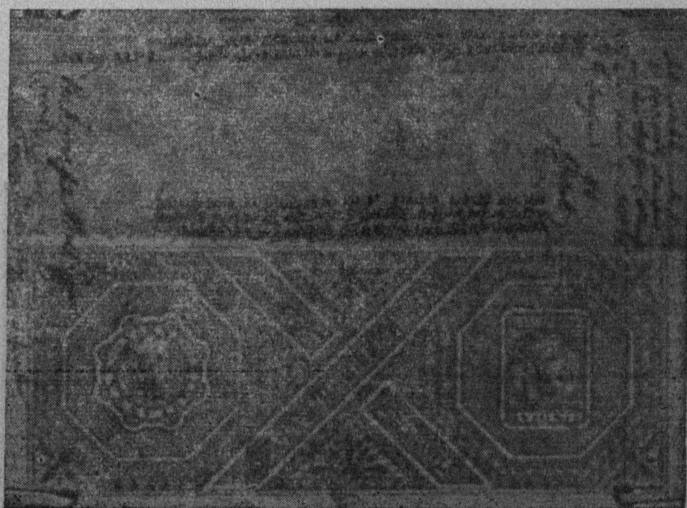
বার্কমায়ার ব্রাদার্স কর্ত্তৃক ভট্টাচার্যদের নিকট থেকে জমি লীজ গ্রহণের দলিল। তাং ১০।৫।১৮৭৬ লীজ গ্রহিতা সর্ব্বশ্রী উইলিয়ম বার্কমায়ার, জন বার্কমায়ার, হেনরি বার্কমায়ার ও এ্যাডাম বার্কমায়ার। লীজ দাতা সর্ব্বশ্রী গদাধর ভট্টাচার্য্য, বদন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য।

পৃঃ—২১১ (সর্ব্বশ্রী গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য ও কার্ত্তিক ভট্টাচার্যের সৌজন্যে)

হেমচন্দ্র দাঁ স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠাতা ৺প্রমথনাথ দাঁ

শ্রীজ[illegible]দেব দাঁর সৌজন্যে—পৃঃ ৪৩৪

হেমচন্দ্র দাঁ স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহরিধন দাঁ

শ্রী প্রদীপকুমার দাঁর সৌজন্যে—পৃঃ ৪৩৪
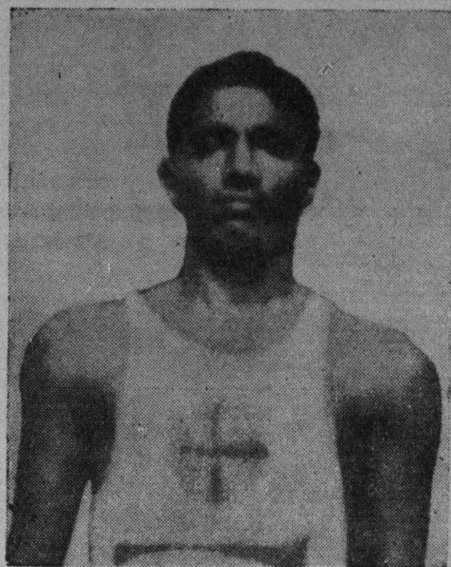
৺রতনকৃষ্ণ হড়—পৃঃ ৪৬৭

জন্ম—১৯শে আষাঢ় ১৩২১ মৃত্যু—৫ই মাঘ ১৩৬০

শ্রীললিত মোহন হড়ের সৌজন্যে

কংগ্রেস কর্মী শ্রীললিত মোহন হড়কে প্রদত্ত তাম্রপত্র—১৯৭২ পৃঃ ৬৮০

বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভার একাংশ।

পৃঃ—৪৪১
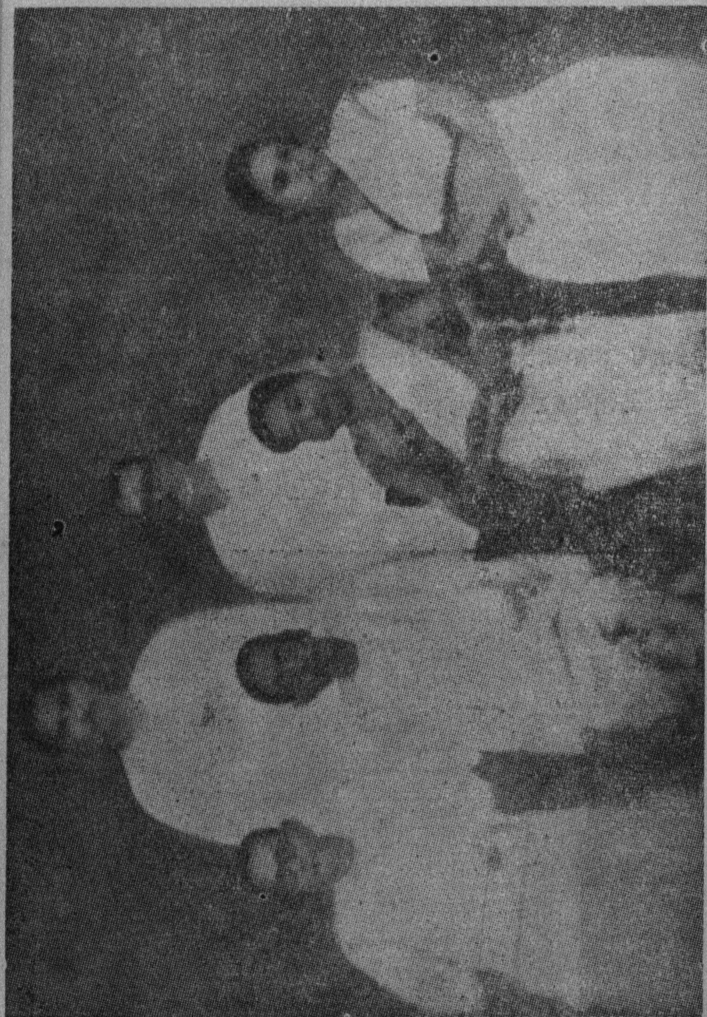
উপবিষ্টঃ বামদিক থেকে—শ্রীভূষণ বোস, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বোস, মিস্ মনোরমা বোস, শ্রীমতী প্রতিমা বোস।

দণ্ডায়মানঃ ঐ সম্পাদক—শ্রীকুমুদকান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়।

লেলিন ময়দানে উদ্বোধন উপলক্ষে গৃহীত চিত্র পৃঃ—৫০৫

উদ্বোধক—প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, পার্শ্বে সোভিয়েত বার্ত্তা বিভাগের উপাধ্যক্ষ শ্রীএম, এ, চুডিনোভ।

রবীন্দ্র ভবনের শিলান্যাস করছেন পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ। দক্ষিনে পৌর সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ। পৃঃ—৬৮৭
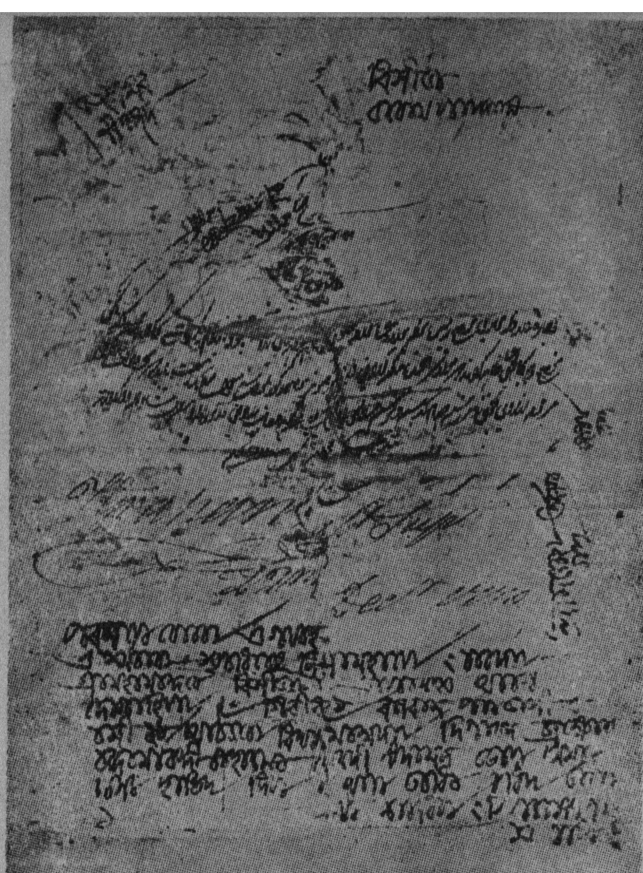
বিংশ শতাব্দী।

বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী রিষড়ার অধিবাসীদের অনেকেরই জানা আছে। কাজেই সেই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ক'রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ক'রে ব্যয় বাহুল্য ঘটানো সমীচীন বলে মনে হয় না। তবে আমাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল, সেই কারণে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী পাঠকবর্গ ও পৃষ্ঠপোষকগণ মার্জনা করবেন বলে আশা করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনোত্তর যুগে স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির বাৎসরিক ও অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে প্রকাশিত কার্য বিবরণীর মধ্যে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের পুর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ও প্রথম অবদান হিসাবে রিষড়া রেলওয়ে ষ্টেসন স্থাপনের কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

ষ্টেসন হল বটে কিন্তু তখনও রাস্তা ঘাটের বিশেষ উন্নতি হয় নি, বিশেষ ক'রে পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশ ও ডাঃ প্রাণতোষ লাহা ষ্ট্রীটের শেষার্দ্ধের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় তাই বামনদাস বাবু এই রাস্তার উন্নতি কল্পে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর পৌর সভার সদস্য হিসাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন :—

"Now that the 'Mydan' portion of Baruipara Lane has been in constant use by Rly. passengers to the Rishra Station, the road be properly levelled and repaired with earth or cinders, as funds will permit.

১৯০১ খৃঃ শ্রীরামপুর পৌর সভা কর্তৃক বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীকে রিষড়ার কল কারখানাতে টেলিফোন সার্ভিস দেবার

জন্যে কোন্নগর থেকে রিষড়া পর্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে পোষ্ট বসাবার অনুমতি প্রদত্ত হয়।

এর পর বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কল কারখানার সেপ্টিক ট্যাঙ্কের জল গঙ্গায় পড়ে তার জল দূষিত ক'রে তোলার প্রতিবাদে লেখনি চালনা করেন। সেপ্টিক ট্যাঙ্ক কমিটি অবশ্য তাঁকে ডেকে শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দেন যে বিধিবৎ প্রক্রিয়ায় সংশোধিত সেপ্টিক ট্যাঙ্কের জল স্বাভাবিক জলের মতই নির্দোষ, কাজেই তার সংমিশ্রণে ভাগীরথীর জল দূষিত হবার আশঙ্কা অমূলক। যাই হোক, স্রাব নিঃসরণকারী পাইপটি জলের উপরে না রেখে, জলের ভিতরে কিছুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯০৩ সালের নির্বাচনে দেওয়ানজী বংশের তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং বামনদাস বাবু উভয়েই জয়ী হয়েছিলেন। বামনদাস বাবু আবার তখন ছিলেন শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

তখন এ্যাসেসমেণ্টের কাজ পৌর সদস্যরাই সম্পন্ন করতেন। এখনকার মত বাইরের এ্যাসেসর নিযুক্ত হতেন না। এই কাজ ছিল অত্যন্ত পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ। ১৯০৬/০৭ সালের কার্য বিবরণীতে তদানীন্তন পৌর সভাপতি রাজা কিশোরী লাল গোস্বামী মহাশয় উক্ত কাজের জন্যে যাঁদের সম্বন্ধে প্রশংসা সূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে তিনকড়ি বাবু ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন নীরবকর্মী। রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভা প্রসঙ্গে তাঁর কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৯০৩ সালেই বামনদাস বাবুর উদ্যোগে রিষড়া রেটপেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন (করদাতা সমিতি) গঠিত হয়। পরলোকগত হেমচন্দ্র দাঁ ও কৃষ্ণ লাল দাঁ ছিলেম এই করদাতা সমিতির উৎসাহী সভ্যদের অন্যতম। বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবে 'কৃষ্ণলাল-মাণিলাল দাঁ' ছিলেন তখন কলকাতা বড় বাজার থেকে আরম্ভ ক'রে বারাণসী ধাম

পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবেই পরিচিত। হেমচন্দ্র দাঁ ছিলেন সেযুগের বিত্তবানদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বস্তি অঞ্চলের অবাঙালী বাড়ীওয়ালারা আপদে বিপদে তাঁর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

এদিকে ১৯০৬ সালের নির্বাচনে স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র দাঁ ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় উভয়ে জয়লাভ করলেও বামনদাস বাবু মাত্র কয়েকটি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর লোক-প্রীতি ছিল এতই প্রবল এবং কর্মদক্ষতা ছিল এতই সুবিদিত যে ঐ বৎসরই কোন্নগর নিবাসী অতুল চন্দ্র মিত্রের মৃত্যুতে যে উপনির্বাচন হয় তাতে তিনি কোন্নগর ওয়ার্ড থেকে (৪নং ওয়ার্ড) নির্বাচিত হন।

শ্রীরামপুর পৌর সভার পৃথগীকরণ।

১৯০৮ সালের জুন মাসে শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ দে বংশের সন্তান বরদাপ্রসাদ দে মহাশয় ভাইসচেয়ারম্যানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করায় বামনদাস বাবু সর্বসম্মতিক্রমে ঐ পদে নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি বিশ্বম্ভর সেনের নির্মিত গঙ্গার ঘাটের উত্তর পার্শ্বে একটা লম্বা পাঁচিল ও কয়েকটা ধাপ গেঁথে দিয়ে পল্লীর স্ত্রীলোকদের পৃথক-ভাবে স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দেন।

এর পরই তিনি রিষড়ায় একটা পুলিশ ফাঁড়ি এবং স্বতন্ত্র মিউনি-সিপ্যালিটি স্থাপনে যত্নবান হন। ফাঁড়ি বলতে তখন সেই মাহেশ ফাঁড়ি, অথচ এ গ্রামে চুরি ডাকাতির হিড়িক লেগেই ছিল। সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপও দিন দিন বেড়েই চলেছিল। বর্ত্তমান সুশীল আওন রোডে তৎকালীন অধিবাসী ৺সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ীতে (পরে ১৯০৬ খৃঃ ৺নিবারণ চন্দ্র গুপ্তকে বিক্রীত) একটা বড় রকমের ডাকাতি সংঘটিত হয়।

যাই হোক, তিনি রিষড়া ও কোন্নগরের সমন্বয়ে একটি নূতন পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব করেন। বিকল্প প্রস্তাবও কেউ কেউ

দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখের সভায় রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভা গঠনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে সরকার কর্তৃক একটি বিভাগ বণ্টন কমিটি নিযুক্ত হয়। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই কমিটির রিপোর্ট তৈরী করতে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বেশ কয়েকটা বছর কেটে যায়। অবশেষে ১৯১৫ সালের ১লা অক্টোবর তারিখ থেকে দুটা স্বতন্ত্র পৌরসভা পৃথকভাবে কার্য আরম্ভ করে।

"The old Serampore Municipality was divided under the Govt. order No. 1017-M dated 10-5-15 into the Serampore Municipality and the Rishra-Konnagar Municipality with effect from Ist October 1915."

ইতিমধ্যে কয়েকটা নূতন যান্ত্রিক আবিষ্কার এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বিস্মিত ক'রে তুলেছিল। তার প্রথমটা হল হাওয়া গাড়ী, অর্থাৎ আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানীর তৈরী চার চাকার মোটর গাড়ী। ১৯০২ সালে কলকাতায় মাত্র ২/৩ খানা আমদানী হয়েছিল এবং শোনা যায় সেই অভিনব যন্ত্রযান হাওড়া ষ্টেসনে টিকিট করে দেখান হয়েছিল। এর আগে কতলোক দেখতে ছুটেছিল কলকাতায় সেই আদ্দিকালের ঘোড়ায় টানা ট্রাম (১৮৭৩) আর হাওড়া ও কলকাতার সংযোগকারী পনটুন ব্রীজ বা ভাসমান সেতু (১৮৭৪) তার মাঝখানটা আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে খুলে সরিয়ে দেওয়া হত, বড় বড় জাহাজ চলাচলের রাস্তা করে দেওয়ার জন্যে। এর পরই দেখা দেয় কলেরগান বা ফনোগ্রাফ। রিষড়ার কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের মাধ্যমে পাড়াপ্রতিবেশীরা এই গ্রামফোনের রেকর্ডে সে যুগের

বাছাই করা কয়েকখানা গান শোনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। বৈদ্যুতিক আলো পাখার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল তখন কলকাতার মধ্যে। ১৯১৬ সালে হেষ্টিংস মিল কর্তৃপক্ষ দেওয়ানজী ষ্ট্রিটের মোড়ে পঞ্চানন্দের মন্দির পার্শ্বে একটি বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ক'রে পৌর সভার ধন্যবাদার্হ হন। রাস্তার মোড়ে এই বাতিটিই হল রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোকবর্তিকার প্রথম।

হরি সভার কথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা এবং রীতিনীতি ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত জয় করতে উদ্যত, সেই সময়েই স্বধর্মনিষ্ঠ ভক্তপ্রাণ হিন্দুরা গ্রামে গ্রামে 'হরিসভা' স্থাপন ক'রে উক্ত ভাবধারা দূরীকরণে সচেষ্ট হন।

রিষড়ায় এ বিষয়ে প্রথম অগ্রনী হন ৺চন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সহোদর। দেওয়ানজী ষ্ট্রীটে গড়গড়ী মহাশয়দের জোড়া শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এই হরিসভার বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হত এবং তারই পূর্বদিকে হড় মহাশয়দের খোলা জমিতে ভক্তবৃন্দকে খিচুড়ি-অন্ন প্রভৃতি খাওয়ান হত। মাঘ মাসের শেষে পাঁচ দিন ধরে চলত এই হরিসভার উৎসব অনুষ্টান। বাংলা ১৩০৭ সালে (ইং ১৯০১) হয়েছিল এর প্রথম অধিবেশন এবং ১৩১২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চম বাৎসরিক মহোৎসব। (আমন্ত্রণ লিপি দ্রষ্টব্য)

মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন হেটিংস মিলে কাজ করতেন এবং নিজের বাড়ীতে সম্পন্ন করেছিলেন কয়েক বৎসর শ্রী শ্রী৺শারদীয়া দুর্গা পূজানুষ্ঠান।

অনিবার্য কারণে উক্ত হরিসভার কার্য কয়েক বৎসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মদাস হড় লেনে ৺নিবারণ চন্দ্র দাসের (ডাক্তার) বাড়ীর সম্মুখে। তারপর থেকে মহেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ সহোদর

৺আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় দেওয়ানজীদিগের খোলা মাঠে উক্ত হরিসভার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সহযোগিতা করতেন তারিণীচরণ হাজরা এবং প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। (তিনি ছিলেন তখন রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী)। মাঘমাসের পরিবর্ত্তে আনুমানিক ১৩১৪ সাল থেকে বৈশাখ মাসে এক সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলত। চাতরা থেকে আসতেন 'চাতরা হরিভক্তি প্রদায়িণী' সভার প্রতিষ্ঠাতা ভূপেন্দ্র নাথ বাগচী মহাশয় এবং আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করতেন প্রভুপাদ বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী। রিষড়ার বিখ্যাত 'বান্ধব নাট্য সমাজ' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হত ভক্তিমূলক বিভিন্ন গীতাভিনয়। ১৩৪২ সালে এই হরিসভার অষ্টাবিংশতি অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছিল সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সংলগ্ন প্রাঙ্গনে। এইভাবে দীর্ঘকাল এই হরিসভার উদ্যোক্তরা গ্রামবাসীদের মনে ধর্মভাব সঞ্চারণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করতেন।

বারুই পাড়া হরিসভা।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে (বাং ১৩৩৩ সালে) রিষড়া বারুই পাড়া হরিসভার প্রথম বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদনায় ছিলেন শৈলবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং কার্যাধ্যক্ষ ও উৎসাহকের পদে ছিলেন যথাক্রমে সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরীশ চন্দ্র বৈরাগী। এই উৎসব প্রথম রাধাকৃষ্ণের দোল যাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং অদ্যাবধি সেই ভাবেই বাৎসরিক অনুষ্ঠানাদি চলে আসছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান প্রভৃতি ছিল এর অঙ্গ স্বরূপ। খড়দহ থেকে আসতেন গোস্বামী বংশের দাস বিহারী গোস্বামী ও তৎপুত্র গৌরমোহন গোস্বামী যিনি আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করতেন। বারুজীবি

সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের মন্ত্র শিষ্যও বর্ত্তমান।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হল উক্ত হরি-সভায় স্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্যে এবং বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির সুবিধার্থে শ্রীভারত চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মাতা মঙ্গলা ও পিতা রামকৃষ্ণ দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৩৭১ সালের শ্রাবণ মাসে একটি নাট মন্দির প্রতিষ্ঠা। ৺রামকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ছিলেন প্রথমে অপুত্রক। শোনা যায়, বাড়ীতে ভাগবত পুরাণাদি পাঠ করানোর ফলে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়। তাই তাদের নাম রাখেন ভারত ও পুরাণ। তিনি কয়েক বৎসর আপন বাড়ীতে ৺অভয়া দুর্গা মূর্ত্তির পূজানুষ্ঠান করেন।

১৩৭২ সাল থেকে উক্ত নাট মন্দিরে একটি সার্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতায়। (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থাগার সৃষ্টি।

রিষড়ার অভাব ছিল অনেক কিছুর; বিলম্বে হলেও তা একে একে পূরণ হ'য়ে চলেছে। ১৯০১ সালে জন্ম লাভ করে 'Daws' Family Library' — দাঁ বংশীয় কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায়। উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন ৺কৃষ্ণলাল দাঁ, হীরালাল দাঁ, নৃসিংহ চন্দ্র দাঁ প্রভৃতি।

এই গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির আদান প্রদান সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ ছিল পারিবারিক সভ্যদের মধ্যে। কাজেই এর আয়ু বর্দ্ধিত না হয়ে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে। কালক্রমে, উপযুক্ত পরিচর্যা ও পরিচালনার অভাবে তৎকালীন প্রকাশিত বহু পুস্তক সম্ভার ধ্বংস পেতে থাকে। মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বে (বকুলতলায়) দেখা যেত আবর্জনা স্তুপের মত রাশীকৃত কীটদষ্ট জীর্ণ পুস্তকাদির অংশ বিশেষ। যতদূর জানা যায়, 'এনসাইক্লোপিডিয়া' সিরিজের জ্ঞানগর্ভ

কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়েছিল।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় সৃষ্টি হয় 'রিষড়া বান্ধব সমিতির।' (Rishra Friends Society)

বান্ধব সমিতি সাধারণ পাঠাগার।

হরিদাস গড়গড়ীর একমাত্র পুত্র নিশিকান্ত গড়গড়ী এবং রামচরণ মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁদের সহপাঠী তরুণের দল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং দুই বন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থে প্রথমে 'স্মৃতিপদক' ও পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করেন। পরে এঁরাই গড়ে তোলেন একটা ছোট্ট লাইব্রেরী—প্রায় একশোখানা বই সংগ্রহ করে। বামনদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দিয়েছিলেন একটা আলমারী। যে সমস্ত উৎসাহী যুবক এই শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা তাঁদের মধ্যে ছিলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়), নরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়, নন্দ গোপাল গড়গড়ী, নারায়ণদাস মল্লিক, সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, পরেশ চন্দ্র আশ, শিবচন্দ্র আশ প্রভৃতি, এরপর যোগদান করেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ।

সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন ৺নন্দ গোপাল গড়গড়ী (যাঁদের প্রদত্ত জমির উপর বর্ত্তমানে গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ) ৺নারায়ণ দাস মল্লিক মহাশয় নিয়েছিলেন প্রাত্যহিক পুস্তক সরবরাহের (লাইব্রেরিয়ানের) গুরু দায়িত্ব ভার। এরপর যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে উক্ত কাজের ভার গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ৺নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বার্দ্ধক্যহেতু শ্রীরামনিধি বন্দোপাধ্যায়ের উপর উক্ত কাজের ভারার্পণ ক'রে অবসর গ্রহণ করেন। তখন কেরোসিন তেলের আলো ও মোমবাতি

জ্বালিয়ে কাজ চালাতে হত সান্ধ্য অবসর টুকুর সীমার মধ্যে। 'বান্ধব সমিতি' যে কেবল মাত্র গ্রন্থাগার স্থাপন করেই ক্ষান্ত ছিলেন তাই নয়, সমিতির সভ্যদের মধ্যে দু'একজন বৈকালে লাইব্রেরী কক্ষে দুঃস্থ ছাত্রদের গৃহশিক্ষকের কার্যও করতেন এবং স্থানীয় এম,ই, স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাও প্রচলন করেন।

বহু মনীষীর শুভাগমনে পাঠাগারের বাৎসরিক ও অন্যান্য অধিবেশনগুলি সার্থকতা পূর্ণ হয়েছিল। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ সি, ভি, রমণ, সুশীল কুমার ঘোষ M. R. A. S. (London) হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গ্রন্থাগারের সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যে অভিভাষণ প্রদান করেন তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের মাসিক বসুমতীতে। (জ্যৈষ্ঠ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা।)

এই গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ১৩৪১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবর্ত্তকে লেখেনঃ— "রিষড়া ফ্রেণ্ডস সোসাইটী — স্থাঃ ১৯০৭, সভ্য — ৬৫, পুস্তক ২১০০।"

নিজস্ব গৃহের অভাবে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বাড়ীতে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে কিছু কিছু প্রাচীন পুস্তক বিনষ্ট হয় এবং বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই পাঠাগারের দীর্ঘ পট পরিবর্ত্তনের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাঁদের বিভিন্ন কার্য বিবরণীর মধ্যে। ১৯৫২ খৃঃ প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্তৃক এই পাঠাগারের নিজস্ব গৃহের দ্বারোদঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৭ সালে পাঠাগারের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে সুবর্ণ

জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় মাননীয় মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন বসুমতী সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই পাঠাগারে কিছুদিন একটি শিশু বিভাগও খোলা হয়েছিল কিন্তু নানা কারণে তার অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গড়ে উঠেছিল অনাথ আশ্রম সংলগ্ন 'বয়েজ ইউনিয়ন লাইব্রেরী।' বান্ধব সমিতি সাধারণ পাঠ মন্দিরে প্রদত্ত উক্ত লাইব্রেরীর নামাঙ্কিত কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে তার স্মৃতি বিধৃত হয়ে আছে।

এর পর কয়েকটি 'বয়েজ লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে রিষড়া ব্যায়াম সমিতি ও হেলথ্ এ্যাসোসিয়েসন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি ছিল এই শ্রেণীর অন্যতম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শিল্প প্রধান অঞ্চল রিষড়ায় অবাঙালী অধিবাসীদের মধ্যেও ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠে লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্থাপনের চেতনা। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামীচেতন প্রকাশ স্মারক গোপীচাঁদ পুস্তকালয় (হিন্দী), যার বর্তমান রূপ হল "রাধা-রমণলাল হিন্দী পুস্তকালয়"। ১৯৩৯ খৃঃ এ্যাডাম বার্কমায়ার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় "আঞ্জুমান ফলাহুল মুসলেমিন এবং এঁদেরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় নৈশ বিদ্যালয় ও কবিরুদ্দীন ইত্তাহাদিয়া লাইব্রেরী। উক্ত সমিতির বহুবিধ উন্নতিমূলক কার্যের স্বীকৃতি হিসাবে পৌর সদস্যগণ কর্তৃক ৩০।১০।৫৮ তারিখে বস্তি অঞ্চলের লং রোড নামক রাস্তাটি 'আঞ্জুমান রোড' হিসাবে অভিহিত হয়।

এর পরই উল্লেখযোগ্য হল—মোড়পুকুর সাধারণ পাঠাগার, যার জন্ম হয় ১৯৬০ সালের ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্ম দিবসে ১৫০ খানা পুস্তকের সমন্বয়ে। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সেন মহাশয় দীর্ঘ ৭ বছর কাল বিনা ভাড়ায় তাঁর

২/১ খানি ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। গভঃ কলোনীর ২২৮ নং প্লটটি পুনর্বাসন দপ্তর কর্তৃক পাঠাগারকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রীত হওয়ায় তারই উপরে নির্মিত নিজস্ব ভবনে ২৩।১।৬৬ তারিখে পাঠাগারের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ইহার কার্যারম্ভ হয়। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীবাসুদেব চ্যাটার্জী, সহঃ সভাপতি শ্রীকমলাকান্ত গাঙ্গুলী (সংগঠন) ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সেন (সাধারণ), যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য ও শ্রীসুনীল দাসগুপ্ত। ১৯৭২ সালে সভ্য সংখ্যা দাড়ায় ২৫০, এবং পুস্তক সংখ্যা ছিল ৩০০০।

রিষড়া নওজোয়ান সংঘ পরিচালিত পাঠাগার ও মৈত্রতীর্থ প্রভৃতি পাঠাগারের জন্ম হয় এর পরবর্তী কালে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য 'পাঠ্যপুস্তক পাঠাগারের' উদ্বোধন হয় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক ১৯৬৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর 'পথিকৃতের' সভ্যদের প্রচেষ্টায়।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার

১৯৬৩ সালে মাহেশ-রিষড়া-শ্রীরামপুর সংযুক্তভাবে যে 'স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবাষিকি উৎসব সমিতি' গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম কার্যসূচী অনুযায়ী স্বামীজীর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার্থে উক্ত গ্রন্থাগা-রের জন্যে 'বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তি ভবন'-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিচালন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিবিধ বিষয়ে সরকারী অনুমোদন লাভে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়ায় ১৯৬৭ (বাং ১৩৭৪) বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র দিবসে গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন হয় এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট মহকুমা বা টাউন লইব্রেরী হিসাবে পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থাগারের ৫টি বিভাগ খোলা হয়—সাধারণ বিভাগ, মহিলা বিভাগ, শিশু বিভাগ, গবেষণা বিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগ। গ্রন্থাগারের পরিচালন ভার ন্যস্ত হয় একটি শক্তিশালী সমিতির উপর। সভ্যদের

মধ্যে মহকুমা শাসক, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক, রিষড়া পৌর প্রধান, বিধান কলেজ অধ্যক্ষ প্রভৃতি অন্যতম।

গ্রন্থাগারের নৈমিত্তিক ব্যয়-নির্বাহ বাবদ বাৎসরিক ১২ শত টাকা এবং পুস্তকাদি ক্রয় বাবদ বাৎসরিক ১ ৮ শত টাকা শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত হয়, তাছাড়া, একজন গ্রন্থাগারিক, একজন সহায়ক, একজন দপ্তরী ও দারোয়ানের বেতনাদির ব্যয়ও শিক্ষা বিভাগ বহন করে থাকেন। ১৯৭১ সালে এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল ৬৬৭৮ আর সদস্য সংখ্যা ৪৫৮। এর মধ্যে শিশু বিভগের পুস্তক সংখ্যা ১২৩০, হিন্দি বিভাগের ৪৮০, বাকী ৪৯৬৮ সাধারণ বিভাগের, এছাড়া, দৈনিক পত্রিকা সংখ্যা ৪, মাসিক পত্রিকা ২০ এবং সাপ্তাহিক অন্যান্য পত্রিকার সংখ্যা ১২। বহুলোকের দানে এই গ্রন্থাগারটি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থাগারের পরিবেশ এবং কক্ষাদির সুসমাবেশও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য উৎসবাদি উপলক্ষে বহু সুবক্তার আগমন এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ রচনা সম্ভারে পরিপূর্ণ স্মরণী পুস্তিকাগুলিও বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য।

বাঙালী কবি গ্রন্থাগারের মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন আলো আর সৌন্দর্যের। তাই তিনি আনন্দে গেয়ে উঠেছেন :—

"এসেছে জোয়ার ভেঙেছে দুয়ার
ঘুচেছে অন্ধকার।
প্রাণের আলোকে তাই দিকে দিকে
গড়েছি গ্রন্থাগার॥"

স্বদেশী আন্দোলন।

ইতিপূর্বে রিষড়ায় যে সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল বা সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়েছিল তার সঙ্গে রাজনীতির কোন

নাম গন্ধ ছিল না। রাজনৈতিক চেতনার প্রথম উন্মেষ দেখা দেয় লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনাকে উপলক্ষ ক'রে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলা দেশে যে তীব্র আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, রিষড়ার তরুণ সমাজ তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। প্রতি-রোধের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরাও পথে নেমে আসেন। সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা ক'রে তাঁরাও দেশব্যাপী মুখরিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দেন।

যত দূর জানা যায়, পূর্বোক্ত করদাতা সমিতির সভ্যগণের উদ্যোগে ত্রিলোক রাম দাঁ ঘাটের সংলগ্ন প্রাঙ্গনে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। সেই সভায় জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ; সঙ্গে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। বক্তৃতা শেষে অগণিত মানুষের সামনে স্তুপীকৃত বিলাতী বস্ত্রের অগ্ন্যুৎসব হয়েছিল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মাধ্যমে। রাষ্ট্রগুরু সেদিন শুধু বিলাতী বস্ত্রেই আগুন দিয়ে যান নি, দেশ-প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিটি তরুণের বুকে।

তখন থেকেই চলতে থাকে গোপনে ছোরা খেলা, অসিখেলা, লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষার অনুশীলন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ অসি-চালনা শিক্ষক 'মর্ত্তাজা' সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কয়েকজন যুবক, রিষড়ার কালীতলার নিকটবর্ত্তী ৺নিবারণ চন্দ্র আওনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, অসি-চালনা শিক্ষাকালীন নাকের উপর তিনি যে আঘাত পান তার ক্ষত-চিহ্ন আমরণ বিদ্যমান ছিল।

তখন থেকেই স্বদেশী বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের কার্যে জনসাধারণের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয় যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সালে মাহেশে 'বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল' এবং ১৯০৭ সালে কল্যাণজী (রামপুরিয়া) কটন মিল।

খাদি বস্ত্র পরিধানের প্রচলন তখন থেকেই আরম্ভ হয়। মোট-

কথা বিলাতীদ্রব্য বর্জনের একটা হিড়িক পড়ে যায় এবং তার স্থানে দেখা দেয় স্বদেশী ভোগ্যপণ্য যদিও বিলাতী দ্রব্যের তুলনায় তাদের মান ছিল নিকৃষ্ট।

রজনীকান্ত সেনের গান গেয়ে যুবকের দল খাদিবস্ত্র ফিরি করে বেড়াতে লাগলেন দলে দলে :—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।" ইত্যাদি

বিলাতী দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান নিবারণ আন্দোলনও রূপ পরিগ্রহ করে এই সময়ে। 'পশ্চিম বঙ্গ' পত্রিকায় ৩য় বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪) প্রকাশিত 'চন্দনগরে বিপ্লবের পদধ্বনি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে ১৯১৫ খৃঃ যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) যখন চন্দনগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তখন তিনি মাঝে মাঝে গোন্দল পাড়ায় আসতেন এবং বাইরে থেকে আনা আগ্নেয়াস্ত্র বাজরার ভেতর লুকিয়ে পাঠাতেন বৈদ্যবাটী হাটে আর ছদ্মবেশী ক্রেতার দল সেই সব বাজরা কিনে নিতেন। শেষ বারে নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কিছু রিভলবার ও কার্তুজ সরবরাহ করেন এবং তাঁর গোপন বাসের ব্যবস্থা করা হয় রিষড়ার এক বাগান বাড়ীতে।

সেইখান থেকেই তিনি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ময়ূরভঞ্জের দিকে যাত্রা করেন। জার্মাণীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ ক'রে সেখান থেকে অস্ত্রাদি সংগ্রহ ক'রে ইংরেজকে ভারত ছাড়ার পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন রাসবিহারী বসু, পূর্বোক্ত যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সেকথা ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।

অনুশীলন পার্টির কর্মীদেরও রিষড়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয়। রিষড়ার যশস্বী চিকিৎসক ডাঃ চন্দ্রকুমার দের (প্রথম এম, ডি) কন্যা চপলা দেবীর পুত্র প্রমথ নাথ মিত্র

(নৈহাটী) ছিলেন এই অনুশীলন সমিতির প্রথম সভাপতি। সহ-সভাপতি—অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন, সম্পাদক—সতীশ চন্দ্র বসু।

শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি।

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহসমস্যা দিন দিন অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠতে থাকে অথচ বিদ্যালয়ের এমন অর্থসঙ্গতি ছিল না যে নূতন জমি ক্রয় ক'রে তার উপর গৃহাদি নির্মান করেন। ডাঃ ক্রফোর্ড তাঁর মেডিকেল গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন যে ১৯০১ খৃঃ রিষড়া গার্লস স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৮। একটা লম্বা গ্যারেজ ঘরের মধ্যে এতগুলি বালিকাদের স্থান সংকুলান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠে। সম্পাদক হিসাবে পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয় তাই ১৯০২ সালে জি, টি, রোড ও দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে নবীন চন্দ্র মল্লিকের কাছ থেকে একখণ্ড জমি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন উদ্দেশ্য ক্রয় করেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালে বার্কমায়ার ব্রাদার্সের অন্যতম (জন, উইলিয়ম, এ্যাডাম ও হেনরি) এ্যাডাম বার্কমায়ারের বদান্যতার গৃহসমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তিনি ৺কালীকুমার দের দৌহিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিকট থেকে ক্রয় করা সমস্ত সম্পত্তি বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দান করে যান। বালক বিদ্যালয়ের জন্যে প্রকাণ্ড হলঘর সমেত চারখানা ঘর নির্মাণ ক'রে দেন। পরবর্তী কালে এর পশ্চিমাংশে আরও চার কামরা ঘর সংযোজিত হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে নির্মিত হয় উত্তর সীমানায় একটি বাংলো প্যাটার্নের স্কুল বাড়ী। শোনা যায়, ঐ স্থানেই নাকি ছিল কালীকুমার দের (বক্সীর) প্রকাণ্ড আটচালা। (পৃঃ ২৬৪)

তাঁর এই মহৎদানের কথা পরিচালক সমিতি তাঁদের বার্ষিক কার্য বিবরণীতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বার বার উল্লেখ করেছেন। আরও

উল্লেখ করেছেন যে "The School building together with all the landed properties have been vested in a Board of Trustees, who in turn delegated the management to the School Committee."

এই বিদ্যালয়ের পরিবেশটি ছিল খুবই মনোরম। পূর্বদিকের বারাণ্ডার অদূরেই প্রবাহিতা ছিল পুণ্যসলিলা ভাগীরথী আর উত্তর-পশ্চিমে পাকা পাঁচিল ঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গন। ছোটাছুটি, খেলাধূলা করার এমন সুযোগ এর আগের বিদ্যালয় ভবনে ছিল না প্রতি-বৎসর পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে পুস্তক সম্ভারের সঙ্গে একসরা মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থাও ছিল ছাত্রদলের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। বলা বাহুল্য, পুরস্কার বিতরণী সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও উপস্থিত থাকতেন বার্কমায়ার ব্রাদার্সের প্রতিনিধি বর্গ এবং জেলা-শাসক বা মহকুমা শাসক শ্রেণীর ন্যায় বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ।

পরিত্যক্ত পুরাতন 'বঙ্গ বিদ্যালয় ভবনটি' প্রায়ই খালি পড়ে থাকত। মাঝে মাঝে স্থানীয় থিয়েটার ক্লাবকে বা অন্যান্যদের ভাড়া দেওয়া হত। এই গৃহের দক্ষিণেই ছিল পোষ্ট অফিস বা ডাকঘর। রাস্তার অপর পারে ডাক পিওন জহরলাল পালের দোকানে এক পয়সার চারখানা গুটকে কচুরি ছিল সে যুগে অত্যন্ত মুখরোচক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে নবীন পাকড়াশী লেনের সংযোগ স্থলে ফেলু মোদকের খাবারের দোকানের গজা ও সিঙ্গাড়ার সুখ্যাতি রিষড়ার সীমানা অতিক্রম ক'রে উত্তরে শ্রীরামপুর গোস্বামী বাড়ী ও উত্তরপাড়ার রাজ পরিবার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আধুনিক কালে নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় রিষড়ার বাগান বাড়ীতে অবস্থান কালে এই খাস্তার গজার প্রসিদ্ধি ভুলতে পারেন নি। (হুঃ জেঃ ইতিহাস)

বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ঘন ঘন বদল হলেও হেড পণ্ডিত ও সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন দুই অচলায়তন স্তম্ভ স্বরূপ।

সম্পাদকের পদে ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয় একটানা ছত্রিশ বছর অর্থাৎ মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত (১৯২০ পর্যন্ত)।

নারায়ণ দাস মল্লিক, বিনোদ পণ্ডিত এবং মহেন্দ্র মাষ্টার (বিদেশী) ছিলেন যথাক্রমে তৃতীয় চতুর্থ ও শিশু শ্রেণীর শিক্ষক। ৺মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন, তারপর যোগদান করেন ৺মাণিকলাল দে।

এই সময় শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্তৃক উক্ত বিদ্যালয় দু'টিকে যথাক্রমে বাৎসরিক ৯০, টাকা ও ৯৬, টাকা হারে অনুদান প্রদত্ত হত। বার্কমায়ার ব্রাদার্সের পক্ষ থেকে দেওয়া হত পঞ্চাশ টাকা, তিন আনা নয় পাই। ১৯১১ খৃঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট পামার সাহেব ছাত্রদের মধ্যে প্রথম Sports চালু করেন এবং তার জন্যে বিশেষ পুরস্কারও প্রদত্ত হয়।

বিভূতি ভূষণ গুপ্ত মহাশয় ছিলেন তখন বালিকা বিদ্যালয়ের একমাত্র পণ্ডিত। তিনি কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করার অব্যবহিত পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে ছিলেন তা সঠিক জানা যায় না তবে ১৯১৮ সালে চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য মহাশয় (পূর্ববঙ্গ বাসী, পরে স্থায়ীভাবে রিষড়ার অধিবাসী) ঐ পদে একাই পাঁচ মাস কাজ চালিয়ে দিয়ে ছিলেন, আর তার জন্যে বোনাস পেয়েছিলেন ২০ টাকা। তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত উক্ত শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ২৬/৯/৫৯ তারিখের সভায় পৌর সদস্যগণ বাঙ্গুর কলোনীর একটি রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত করেন।

ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় (প্রায় শতাধিক) একজন সহকারী মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হয়েছিলেন এবং এর পর ৺কুমুদ নাথ হড় মহাশয় কিছুদিন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ দাবা খেলোয়াড়।

এই দাবা খেলা নিয়ে মাহেশ ও রিষড়া অঞ্চলে তাঁর বহু সময় অতিবাহিত হত।

এই সময় সহকারী সম্পাদক ছিলেন ৺গোপাল চন্দ্র মল্লিক মহাশয়। তাঁদের আদি নিবাস হরিপাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর মাতামহ ৺নীলাম্বর মল্লিক মহাশয়ের আহ্বানে তিনি রিষড়ায় এসেছিলেন। তিনি তখন ছিলেন কলকাতার প্যারী এণ্ড কোম্পানীর হেডক্লার্ক। তখন সদাগরী অফিসের বাবুদের সাজপোষাকই ছিল আলাদা। কোট-প্যান্টের পরিবর্তে তখন ধুতি, চাপকান ও চাদরই ব্যবহৃত হত। বুকের কাছে শোভা পেত ঘড়ির চেন আর ভিতর পকেটে থাকত মূল্যবান ঘড়ি। তিনি পূর্ণবাবুকে বিদ্যালয়ের হিসাব নিকাশের কাজে সাহয্য করতেন। ১৯২৬ সালে তিনি সাতকড়ি, বিনয়কৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ এই তিন পুত্র রেখে পরলোক গমন করেন। বিদ্যালয় পরিচালক কমিটি ২৮ ১১-২৬ তারিখের সভায় তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ৺বিনকৃষ্ণ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একজন প্রখ্যাত 'ফ্লুট' বাদক এবং বহু অভিনয় আসরে তিনি তাঁর বাদ্য প্রতিভা প্রদর্শন করেন। ইঁহাদেরও বহু জায়গাজমি ছিল। রিষড়ার বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপন উপলক্ষে তার অধিকাংশই বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিকের সৌজন্যে)।

উক্ত বিদ্যালয়ের বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাসিক ৪ টাকা হারে বৃত্তি লাভ ক'রে বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করে। তাদের মধ্যে সর্বশ্রী বিশ্বনাথ আশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার ঘোষ ও মহীতোষ ধাড়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বালিকারাও এ বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না, তাদের মধ্যেও দু'চারজন মাসিক ২ টাকা হারে নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করে।

উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের গোড়ার কথা।

১৯১৮ খৃঃ কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বারো-

পর্যটন উপলক্ষে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে গ্রামে গ্রামে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার কল্পে এই ধরণের উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন। তার পর থেকেই রিষড়া ও মাহেশের অধিবাসীরা একান্তভাবে অনুভব করতে থাকেন স্ব স্ব গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ের অভাব। আর কত কাল তাঁদের গ্রামের ছাত্রদল যাবে পদব্রজে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় ক'রে শ্রীরামপুর বা কোন্নগর স্কুলে। জি, টি, রোডের অবস্থা ছিল তখন :—"In the early twenties, the stretch of the Grand Trunk Road that lay through Rishra, was as elsewhere also, in shambles. It was all cobbles and dust." (Advocate B. N. Ash,-Rishra Mupty. Golden Jubilee Celebration Publication).

চলতে লাগল আলোচনা ও পরামর্শ। শেষ পর্যন্ত ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে রিষড়া এম, ই, স্কুলের কার্য নির্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :—"Resolved that a memorial be submitted to Sir Archi Birkmyre, Bart through the Manager, Hastings Jute Mill, praying for financial help to raise the status of the M. E. School to that of an H. E. School."

Sd/ Hiralal Daw,

Secretary.

দুর্ভাগ্যক্রমে উপরোক্ত আবেদন ফলপ্রসূ না হলেও পরিচালক সমিতি উপযুক্ত পাত্রের কাছেই তাঁদের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। স্যার আর্চি ছিলেন মহানুভব দানশীল এ্যাডাম বার্কমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। এ্যাডাম বার্কমায়ার কেবল মাত্র বিদ্যালয়কে অট্টালিকা ও ভূসম্পত্তি দান করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁরই সদিচ্ছাক্রমে স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৮ খৃঃ জি, টি, রোডের পশ্চিম পার্শ্বে "কারমাইকেল

চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী।" বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল (১৯১২-১৭) এই ডিস্পেন্সারী স্থাপনের কয়েক বৎসর আগে এসেছিলেন হেষ্টিংস মিল পরিদর্শনে, সেই স্মৃতিরক্ষার্থে এবং তাঁর সম্মানার্থে উক্ত অবৈতনিক চিকিৎসালয়টি তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়। কালক্রমে এই অবৈতনিক চিকিৎসালয়ে একটি কলেরা ওয়ার্ডও সংযুক্ত হয়।

এই নিঃশুল্ক চিকিৎসাগারের কল্যাণকর অবদান দীর্ঘকাল ধরে রিষড়া ও মোড়পুকুর অঞ্চলের অধিবাসীরা উপভোগ ক'রে এসেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান মিল কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত চিকিৎসালয়টি রূপান্তরিত ক'রে ওভারসিয়ার নিবাসে পরিণত করেছেন। বলা বাহুল্য, হেষ্টিংস মিলের মধ্যে অবস্থিত ডিস্পেন্সারীটী কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যের জন্য সীমাবদ্ধ। উক্ত চিকিৎসালয়টি ছিল জনসাধারণের হিতার্থে একটি অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ডাঃ প্রাণতোষ লাহা, এল, এম, এস, ছিলেন ইহার সর্বজন প্রিয় চিকিৎসক।

এ্যাডাম বার্কমায়ার সাহেবের বহুবিধ জন কল্যাণ কর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে পৌরসদস্যগণ ৯/৯/২৭ তারিখের সভায় ২নং বস্তি রোডটী এ্যাডাম বার্কমায়ার রোড হিসাবে অভিহিত করেন।

যাই হোক, ১৯২১ সালে পূর্বোক্ত উপায়ে এম, ই, স্কুলটিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত না হওয়ায় কালীতলা নিবাসী ৺গোবিন্দ লাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় ১৯২২ সালে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার প্রাঙ্গনে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টি দ্বিতলে পরিণত ক'রে (৮টি কক্ষ বিশিষ্ট) সেইখানেই উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, কারণ তার ফলে উপযুক্ত জায়গাজমি ক্রয় করার অতিরিক্ত ব্যয়

নিবারিত হবে। উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী দীর্ঘকাল পরে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে ৺সত্যব্রত বন্দোপাধ্যায় এবং আরও উনত্রিশ জন বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্র বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির নিকট দাখিল করা হয় কিন্তু সে প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। প্রেসিডেণ্ট পামার সাহেব প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন কারণ বার্কমায়ার সাহেবের ট্রাষ্ট ডিডের সর্তের সঙ্গে প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের যেন কোথায় একটা গরমিল ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্ত্তী কালে উক্ত এম, ই, স্কুলের পরিচালক সমিতির সভাপদে নির্বাচিত হন এবং তাঁর মৃত্যুতে ১৬/২/৪১ তারিখের সভায় কমিটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালে মাহেশের অধিবাসীদের চেষ্টায় সেখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রিষড়ার কয়েকজন ছাত্রও উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে যায়।

স্বর্গীয় নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উক্ত এম, ই, স্কুলের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য। তিনি সরকারী সাহায্য পুষ্ট উক্ত বিদ্যালয়টিকে জনসাধারণের স্কুলরূপে পরিগণিত করার জন্যে সচেষ্ট হন। বলা বাহুল্য, বিলম্বে হলেও ট্রাষ্টিগণের অন্যতম শ্রদ্ধেয় শ্রীভূষণ বসু মহাশয়ের প্রযত্নে ট্রাষ্টডিডের কয়েকটি আপত্তিকর উপ-ধারা সংশোধিত হওয়ায় নরেন্দ্রকুমারের প্রস্তাব প্রকারন্তরে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এই সময় (১৯২৩ সালে) বিদ্যালয়ের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, ষষ্টীতলা ষ্ট্রীট নিবাসী ৺তারক চন্দ্র ঘোষ, বি, এ,। ১৯২৫ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে তাঁর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ উপলক্ষে কার্যকরী সমিতি তাঁর শিক্ষকতা কার্যের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক তাঁকে উপযুক্ত বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপনেরও ব্যবস্থা করেন।

তাঁর পরই প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এবং সহঃ প্রধান শিক্ষক ৺এককড়ি.বন্দ্যোপাধ্যায় আই, এ। এই সময় বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১০ এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ৩ জন। ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬৪ এবং ছাত্রী সংখ্যা ১২২। ছাত্রদের সংশোধিত বেতনের হার ছিল আট আনা থেকে দু'টাকা, আর বালিকাদের তিন আনা থেকে চারি আনা। প্রধান শিক্ষক সহ পরিচালক সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ১০। তখন একই সমিতি উভয় বিদ্যালয়ের পরিচালনা করতেন।*

উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়।

১৯২৬ সাল থেকে চারটা বছর কেটে গেল। উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের আশা যখন প্রায় নিরাশায় পরিণত হতে চলেছে তখন হঠাৎ ১৯৩০ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন্নগর নিবাসী কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে রিষড়ার ছাত্র দলের খেলা ধূলা উপলক্ষে একটা বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হওয়ায় রিষড়ার ছাত্র সমাজ অতঃপর একযোগে কোন্নগর বিদ্যালয়ে যোগদান করতে বিরত থাকেন। এই ছাত্রদলের অগ্রণী ছিলেন সর্বশ্রী অনিলকুমার দাঁ ও সহদেব পাল। গ্রামময় সৃষ্টি হয় একটা তুমুল আন্দোলন। 'রিষড়ায় উচ্চ বিদ্যালয় চাই' এই দাবী তখন সোচ্চার হয়ে উঠে।

স্বর্গীয় নরেন্দ্রকুমার এগিয়ে আসেন ছাত্রদলের দাবীর সমর্থনে। গ্রামবাসী সকলকেই দান করতে হবে যথাসাধ্য। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামবাসীগণের মধ্যে অনেকেই

* উপরোক্ত তথ্যগুলি পরিচালক সমিতির সভার কার্য বিবরণী এবং পারিতোষিক সভায় প্রদত্ত সম্পাদকের মুদ্রিত বিবরণ থেকে সংকলিত।

সাধ্যমত অর্থ সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হন। তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ৺প্রমথ নাথ দাঁ এবং তদীয় সহোদর শ্রীহরিধন দাঁ প্রভৃত অর্থ-ব্যয়ে দাঁবংশীয়দিগের গঙ্গাতীরবর্তী জমির উপর গড়ে তোলেন তাঁদের পরলোকগত পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে 'হেমচন্দ্র দাঁ স্মৃতি মন্দির' এবং বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্যে ঐ সুবৃহৎ অট্টালিকা দান করেন। এই হর্মের নির্মাণ কার্যে অবৈতনিক ভাবে তত্ত্বাবধান করেন স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, এম, এ, ই, (বিদ্যালয় ভবন সংলগ্ন শিলালিপি দ্রষ্টব্য)। অমঙ্গলের মধ্যেও যে মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে উক্ত ঘটনাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

(হুগলী জেলার ইতিহাস, রিষড়া, বসুমতী ১৩৪৯)

ইতিমধ্যে দেশবাসীর অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হয়ে উঠে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক তহবিল। ২৫-১ ৩১ তারিখে স্যার হরিশঙ্কর পাল, কে, টি, বর্তমান বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ক'রে রেখে যান তাঁর শুভেচ্ছার বাণী

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩২ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যা-লয়ের কার্য আরম্ভ হয়ে যায় প্রথমে ষষ্টিতলা ষ্ট্রীটে ৺সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের বহির্বাটীতে, তারপর নবীনচন্দ্র পাকড়াশী লেনে ৺সাধনচন্দ্র দত্তের ভাড়া বাড়ীতে। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে জি, টি, রোডের পূর্বপার্শ্বে ৺জীবনকৃষ্ণ দাঁর নবনির্মিত বাড়ীতে (প্রাক্তন পোষ্ট অফিস বিল্ডিং বিনা ভাড়ায়)।

* প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রিষড়া মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে দাঁবংশীয় শ্রীহীরালাল দাঁ মহাশয়, যিনি ১৯২১ সালে প্রথম উক্ত বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করেন, তিনি ৩-১১-৩০ তারিখে পরলোক গমন করার উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকার্য দেখে যেতে পারেন নি।

অবৈতনিক ভাবে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস, সি, হেডমাষ্টারের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর সহযোগী শিক্ষক হিসাবে ছিলেন ৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, ৺শিবচন্দ্র আওন বি, এ, শ্রীবিশ্বনাথ আশ, বি, এল প্রভৃতি। ৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২১ সালে কিছু দিনের জন্যে রিষড়া, এম, ই, স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। এরপর মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন।

১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ৺নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, বি, এল, যে মুদ্রিত অভিভাষণ প্রদান করেন সেটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একখানি প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। উক্ত বিবরণীতে তিনি দেশবাসী এবং উক্ত শিক্ষক মণ্ডলীকে ও ৺জীবনকৃষ্ণ দাঁকে ছয়মাস কাল তাঁর বাড়ীটী বিনা ভাড়ায় বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দেওয়ায় বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; এবং মহানুভব স্বর্গীয় প্রমথনাথ দাঁ ও তদীয় সহোদর শ্রীহরিধন দাঁর মহৎ দানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। ছাত্র সংখ্যা ছিল তখন ২২৫ এবং প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সিটিটুইসনের প্রাক্তন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক ৺বেচারাম সরকার। উক্ত রিপোর্টের মধ্যে আরও বহু ব্যক্তির সহযোগিতা এবং সুপরামর্শের জন্যে সাধুবাদ প্রদত্ত হয়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তৎকালীন পরিচালক সমিতির প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন, জে, কে, ব্যানার্জি, এম, বি, এবং ডাঃ প্রমথ নাথ ব্যানার্জি, এম, এ, ডি, এস·সি, মিণ্টো প্রফেসার এবং বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, এম, এ, ই। পরিচালক কমিটির সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দের প্রতি ও ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়। শিক্ষক সংখ্যা ছিল তখন ১১ এবং বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ শত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপচার্য অনারেবল লেফটেন্যাণ্ট

কর্ণেল স্যর হাসান সুরাবর্দী। এরপর থেকে এই বিদ্যালয় মঞ্চে কত সভাসমিতি, অভিনয়, এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৪০ সালে পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর জে, এল, ব্যানার্জি, এম, এ, বি, এল এবং ১৬/৩/৪১ তারিখের সভায় পৌরোহিত্য করেন সস্ত্রীক ডঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি, এম, এ, পি, এইচ, ডি, (প্রাক্তন রাজ্যপাল)।

গন্ধ বণিক মহাসম্মিলনী।

উক্ত হেমচন্দ্র দাঁ স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৩/১/৩২ তারিখে গন্ধবণিক মহাসম্মিলনীর নবম অধিবেশন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রিষড়ার ৺সারদাপ্রসাদ দে মহাশয়। বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানানো হয় উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে :—

"স্বাগত গন্ধ-বণিক বৃন্দ, শঙ্খ-সপ্তগ্রাম-আবটদেশ।
(আজি) মিলেছি সকলে এই সভাস্থলে ভুলি ভেদাভেদ দ্বন্দ্বদ্বেষ ॥" ইত্যাদি

সিদ্ধেশ্বরী পাঠশালা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রিষড়ায় পূর্বোক্ত বঙ্গবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে একটি নূতন পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে রিষড়ার উত্তর সীমানায় ওয়েলিংটন জুট মিলের পার্শ্বে যে পাঠশালার অস্তিত্ব দীর্ঘকাল বজায় ছিল তার পরিচালনা করতেন মাহেশ বঙ্গ বিদ্যালয়ের (১৮৫১ খৃঃ) দ্বিতীয় শিক্ষক ৺নিবারণ চন্দ্র দত্ত মহাশয় (নিবারণ পণ্ডিত নামে খ্যাত) তাঁর নিজস্ব চণ্ডীমণ্ডপে। তখন অবশ্য সকালে বিকালে পাঠশালার কার্য নির্বাহ হত। রিষড়ার তৎকালীন বহু ছাত্র এই পাঠশালায় অধ্যায়ন করতেন বলে জানা যায়।

পণ্ডিত মহাশয়ের দুই কন্যার বিবাহ হয় রিষড়ার লাহা বংশের সতীশ চন্দ্র ও নির্মল চন্দ্র লাহার সঙ্গে। সতীশ চন্দ্রের পুত্র শ্রীহরিধন লাহার বাল্য জীবন অতিবাহিত হয় মাতুলালয়ে অর্থাৎ দত্ত মহাশয়ের সান্নিধ্যে। তিনি প্রায় নব্বুই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৯০৬ সালে ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটে ৺সত্যজীবন ও ভূতনাথ লাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ৺নন্দগোপাল মুন্সী মহাশয় স্থানীয় বালক বালিকাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে সিদ্ধেশ্বরী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় সহোদর চুনীলাল মুন্সী মহাশয় লাহা ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুমতিক্রমে তাঁদের জমিতে নবনির্মিত লম্বা চালা ঘরে পাঠশালাটীর নূতনরূপ দান করেন। এই শিক্ষায়তনের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পর্যায়ক্রমে নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য, সে সময় ছাত্রদের বেত্রাঘাত করা আইন বিরুদ্ধ না হওয়ায় উক্ত পাঠশালায় সেকালের গুরুমহাশয়দিগের প্রবর্ত্তিত শাস্তি ব্যবস্থার কিছু কিছু নমুনা বজায় ছিল।

১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুন্সী ধর্মদাস হড় লেনে ঐ পাঠশালার কার্য কিছুদিন পরিচালনা করার পর ১৯৩৮ সালে পৌরসভা কর্ত্তৃক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদান প্রকল্প অনুযায়ী উক্ত পাঠশালার কার্যভার গ্রহণ করেন এবং আরও দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

বিভিন্ন স্থান পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান চারবাতির কাছে একতলা বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। ১৯৬১ খৃঃ উপরে দুটি পৃথক ব্লকে দুখানি হিসাবে চারখানি ঘর নির্মাণ ক'রে দেন ডাঃ প্রাণতোষ লাহা ও ডাঃ চণ্ডীচরণ লাহা ; যথাক্রমে তাঁর স্বর্গতা কন্যা অশোকলতা দত্ত এবং দ্বিতীয়টী তাঁর স্বর্গত ভগ্নীপতি ৺গোপাল চন্দ্র দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থে। ২৪/১২/৬১ তারিখে উক্ত গৃহগুলির উদ্বোধন কার্য সমাধা করেন বিধানচন্দ্র কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রী কে, সি, চক্রবর্ত্তী, এম-এ, এল, এল, বি,। বলা বাহুল্য নূতন গৃহগুলি সংযোজিত

হওয়ার ফলে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি হবার সুযোগ লাভ ঘটে। (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

১৯৩৭ সালে পৌরসভার উক্ত প্রকল্প অনুযায়ী বস্তি অঞ্চলে ৺রামচরিতলাল পরিচালিত হিন্দী বিদ্যালয়টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। তারই পরিবর্ত্তিত রূপ হল গান্ধীসড়কে বর্ত্তমান দ্বিতল ভবনে পরিচালিত বিদ্যায়তনটী। (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)

সংস্কৃত শিক্ষায়তন।

প্রাচীন টোল বা চতুষ্পাঠীর কথা ২১১ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীট নিবাসী স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাতন বাটীতে (৺নিবারণ চট্টোপাধ্যায়কে পরে বিক্রীত) একটি নূতন চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয ভাণ্ডারহাটি নিবাসী ৺তারাপদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যাপনায়, এই চতুষ্পাঠীর যে দু'জন স্বনামখ্যাত কৃতি ছাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন চাতরা শীতলাতলা নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ এবং দেশগুরু ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় কালী প্রসাদ ভট্টাচার্য। ১৯০১ খৃঃ রিষড়া রেল ষ্টেসন স্থাপিত হওয়ার ফলে তাঁরা উভয়ে দীর্ঘপথ পদব্রজে যাতায়াতের অসুবিধা ও ক্লেশ থেকে অব্যাহতি পান। (দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বিবৃতিক্রমে)

এরপর ৺চিন্তাহরণ ভট্টাচার্যের জেষ্ঠ সহোদর ৺অম্বিকা চরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ষষ্ঠিতলা ষ্ট্রীটে ৺ তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের বাটীতে (গিরি নিবাস) একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং শ্রীরামপুর পৌরসভা প্রদত্ত মাসিক ৩ টাকা হারে অনুদান প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খৃঃ ৪ঠা জুলাই তারিখের সভায় পৌরসভা কর্ত্তৃক উক্ত অনুদান চালু রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯১৯ খৃঃ রিষড়া অনাথ আশ্রমে পণ্ডিত শশধর বিদ্যারত্ন মহাশয় 'সিদ্ধেশ্বরী চতুষ্পাঠী' নামে একটি টোল স্থাপন করেন। ১৮/১০/১৯

তারিখের সভায় পৌর সদস্য ৺রামদাস গড়গড়ী মহাশয় উপরোক্ত অম্বিকাচরণ স্মৃতিতীর্থ পরিচালিত চতুষ্পাঠীর পরিবর্তে 'সিদ্ধেশ্বরী চতুষ্পাঠীকে' মাসিক অনুদান দেবার প্রস্তাব করেন কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। ১৯২৭ সালেও উক্ত চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব বজায় ছিল বলে জানা যায় কারণ ঐ সালেই রিষড়ার গুপ্ত বংশের শ্রীঅপজা কুমার গুপ্ত এই চতুষ্পাঠীর ছাত্র হিসাবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী (কালীকৃষ্ণ ব্যাকরণ তীর্থের ভগ্নিপতি) বর্তমান লাইব্রেরী কক্ষের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে জি, টি, রোডের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁর আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের একাংশে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং পৌর সভা প্রদত্ত মাসিক ৩ টাকা অনুদান প্রাপ্ত হন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয়কালীকৃষ্ণ মুন্সী, সর্বশ্রী গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য, বিজয় ভূষণ হড়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য মুগ্ধ-বোধ ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কালক্রমে উপরোক্ত চতুষ্পাঠীগুলি অবলুপ্ত হওয়ার পর রিষড়া প্রেম মন্দিরে ১৩৪৭ সালে আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎতারানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান অবৈতনিক 'সংস্কৃত শিক্ষায়তন।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুধর্ম এবং গীতা, ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থাদির সম্যক আস্বাদন করতে হলে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় অপরি-হার্য। যাইহোক, উক্ত সংস্কৃত শিক্ষায়তনটি সরকার কর্তৃক অনু-মোদিত এবং স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সামান্য মাসিক অনু-দানের উপর নীর্ভরশীল। এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে আদ্য, মধ্য উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার গৌরব অর্জন করেন।

হাতে লেখা পত্রিকা।

এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৩১ খৃঃ প্রকাশিত হয়েছিল কয়েকটি হাতে

লেখা পত্রিকা —'ঝরণা' 'সৃষ্টিছাড়া' 'অঞ্জলি' প্রভৃতি। বহু স্থানীয় সংবাদ এই সমস্ত পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যঙ্গ কৌতুকও বাদ যেত না। ১৯৭০ সালে 'খেলাঘর' নামক হাতে লেখা পত্রিকার শুভ উদ্বোধন হয়। মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় প্রগতি-শীল সাময়িকী' 'শিখা'' (১৯৫০) 'ইসারা', (১৯৫৫) নওজোয়ান সংঘের 'চরৈবেতি' (১৯৫৯) জয়শ্রী সমাচার দর্পণ, 'লোকশ্রী' (১৯৬২) (হিন্দি ও বাংলা) এবং ১৯৬৬ সালে 'প্রবাহ নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয়, ধৈর্যের অভাবে উপরোক্ত পত্রিকাগুলো কোনটাই বেশীদিন স্থায়ী হযনি।এছাড়া আরো কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলির নামোল্লেখ সম্ভব হলনা, সে ক্রটি মার্জনীয়।

বরফ ও সোডাওযাটার।

এতদঞ্চলে বরফ ও সোডাওয়াটারের প্রথম আবির্ভাবের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২০/২১ সালে দেওয়ানজী ষ্ট্রীট নিবাসী ৺ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ 'বায়রণ এণ্ড কোং'-এর হুগলী জেলার সোল এজেন্ট হিসাবে দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের মোড়ের উত্তর পার্শ্বে একটি কারবার আরম্ভ করেন। তখন সোডাওযাটারের দাম ছিল মাত্র একআনা আর 'লিমনেড' হল দু'আনা। এক পয়সার পাখী বরফ ও লাড্ডু বরফের আবির্ভাব এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

১৯৩১ খৃঃ উচ্চ বালক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের (এম, ই, স্কুল) পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে যার ফলে শিক্ষক ছাঁটাই, বেতন হ্রাস,

বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষক বদলী প্রভৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে তৃতীয় শিক্ষক ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র পাত্রকে ২/৯/২৮ তারিখে হরিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এর সভাপতিত্বে ছাত্রবৃন্দ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

উপরোক্ত পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় পূর্বের ন্যায় উচ্চ প্রাথমিকে পরিণত হয়। এই সময় দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সম্পাদক ছিলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সিনিয়ার)।

এই সময় থেকে বালিকা বিদ্যালয়টি কিভাবে ধাপে ধাপে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিদ্যালয়ের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি থেকে আংশিক উদ্ধার যোগ্য। (উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা-'কলাপী' – ৩৭৭)

"দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে রিষড়াতে বালিকা বিদ্যালয় বলতে কেবল মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ই ছিল। অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার সুযোগ ছিল। কাজেই খুব কম সংখ্যক ছাত্রীই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পেত। বেশীর ভাগ ছাত্রীই উপায়ন্তর না দেখে লেখা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। ইতিমধ্যে তদানীন্তন কার্যকরী সমিতির সভ্যগণ ১৯৪৮ সালে প্রথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন এবং ১৯৪৯ সালে ষষ্ঠ শ্রেণী প্রবর্ত্তন করেন। অর্থাভাবে কর্তৃপক্ষ সপ্তম শ্রেণী চালু করতে না পারায় বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্তরেই রয়ে গেল।" তখন প্রধানা শিক্ষায়িত্রী ছিলেন মনোরমা আঢ্য এবং সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় পান্নালাল দে। (হেষ্টিংস মিলের তদানীন্তন হেড ক্লার্ক) শেষ দিকটায় এ্যাক্টিং সম্পাদক ছিলেন শ্রীকুমুদকান্ত মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যালয়টি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত না হওয়ায় ষষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণা বালিকারা অন্যত্র (শ্রীরামপুর আকনা বালিকা বিদ্যালয়ে) ভর্ত্তি হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অভিভাবকগণ বিশেষ

অসুবিধার মধ্যে পড়েন এবং তার ফলেই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টায় তাঁরা তখন সক্রিয় হয়ে উঠেন। সে সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন: – "এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান ১৯৫০ সালে রিষড়া 'উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের' কর্তৃপক্ষ প্রাতঃ কালীন ক্লাস খুলে বালিকাদের পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়াবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু তাঁরা শিক্ষা বিভাগের বিনা অনুমোদনেই (উক্ত) বালিকা বিদ্যালয় চালু করেন। ১৯৫৪ সালে ছাত্রীরা যখন নবম শ্রেণীতে পদার্পণ করে তখন তাঁরা শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনের জন্যে সচেষ্ট হন। কিন্তু গ্রামে একটি অনুমোদিত বালিকা বিদ্যালয় চালু থাকায় শিক্ষা বিভাগ সেই বালিকা বিদ্যালয়টিকেই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত করায় অনুমোদন দান করেন এবং ১৯৫৫ সালেই পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং যথাবিহিত শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনও প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এখন যে ভবনে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত তখন কিন্তু সেখানে ছিল না। প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়েই কার্য আরম্ভ হয়। এখন সেখানে বিধান কলেজ স্থাপিত হয়েছে। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন শ্রীমতি নীলিমা দত্ত।" ১৫/৫/৫৫ তারিখে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার বিচারক হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত মাননীয় শ্রীযুক্ত পান্নালাল বোস মহোদয় (তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী) (প্রস্তাবিত) উচ্চ বালিকা, প্রাথমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয় ও গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠে।

২৬/৪/৫৮ তারিখে পোড়া মাঠের পশ্চিমাংশে মিস্ মনোরমা বোস এম, এ, (লণ্ডন) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা শিক্ষা বিভাগের প্রধানা পরিদর্শিকা কর্তৃক রিষড়া উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের শিলান্যাস পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শ্রীএ, এস, কুশারি, আই ,এ, এস, সম্পাদক শ্রীকুমুদ কান্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৫৫

সালে পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনায় সভানেত্রীর অকুণ্ঠ সাহায্য দানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেন।

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় যাঁদের সম্বন্ধে সাধুবাদ জানান তাঁদের মধ্যে 'বার্কমায়ার এডুকেশন ট্রাষ্টের' অন্যতম ট্রাষ্টি স্বর্গীয় শ্রীভূষণ বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ৺সুশীল চন্দ্র আওনের অকুণ্ঠ সাহায্যের কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়া সহযোগিতাকারীদের মধ্যে ধন্যবাদ ভাজন হলেন সর্বশ্রী পান্নালাল মুখার্জী, লক্ষ্মীকান্ত বন্দোপাধ্যায়, পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়, আতপ কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (কলাপী-১৩৭৭)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৪ সালে উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে পরিচালিত বালিকা বিদ্যালযের এড হক কমিটির সম্পাদকের পক্ষে শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় রিষড়া পৌরসভার অনুদান লাভের জন্যে যে আবেদন পত্র প্রদান করেন তাতে উল্লেখ ছিল যে :—

..."a full fledged Girls' school ...has been functioning in the Rishra High school premises under the direction of the Board of Secondary Education, West Bengal "?

সুখের বিষয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা মুলক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা অচিরেই প্রশমিত হয় এবং বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সম্পাদক শ্রীকুমুদ কান্ত মুখাপাধ্যায় প্রাণপাত প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করায় স্থানীয় বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ সুগম হয়।

রিষড়ার উপরোক্ত শিক্ষা মূলক ব্যবস্থার আলোচনান্তে কালানু-ক্রমিক ঘটনাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা ছাড়া উপায়ন্তর নেই।

শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির সংস্কার ও নব কলেবর।

১৯০৫ খৃঃ (বাং ১৩১২) স্বর্গীয় তারকনাথ বন্দোপাধ্যায়

মহাশয়ের উদ্যোগে দশঘরা নিবাসী ঈশ্বর চন্দ্র সাহার অর্থানুকূল্যে গ্রামাধিষ্ঠাত্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার প্রাচীন সমচতুষ্কো। মন্দির টি সুসংস্কৃত ও তিন পাশে বারান্দা সমেত সম্প্রসারিত হয় এবং মন্দির চত্বরে ও গর্ভ গৃহে কয়েকখানি মূল্যবান শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর ফলকও স্থাপিত হয়। ৺কালী পুষ্করিণীর সংলগ্ন একটি ভোগ-গৃহের ভিত্তিস্তর পর্যন্ত নির্মিত হয় কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে সেটি অসমাপ্ত থেকে যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীট নিবাসী তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন সে সময়ে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তাঁদের বংশ পরিচয় ২০৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে। কলকাতায় তখন তাঁদের Shajahanpur Rum নামক মদের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল এবং এই ব্যবসার মাধ্যমে তাঁদের বিলক্ষণ অর্থাগম ঘটে। তাঁদের বাড়ীতে তৎকালে শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে বহু দরিদ্র-নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হত। ষষ্ঠিতলা ও জি, টি, রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি একটি দৈনিক বাজার চালু করেছিলেন কিন্তু পূর্ণ চন্দ্র দাঁ প্রতিষ্ঠিত কলবাজার প্রবল হওয়ায় তিনি উক্ত বাজার বেশী দিন চালু রাখতে পারেন নি। তাঁরই প্রচেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দক্ষিণেশ্বর নিবাসী স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন মুখো-পাধ্যায় 'মেলাবলী' নামক বংশ-তালিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩১৬ সালে কিন্তু তৎপূর্বেই অর্থাৎ ১৩১৪ সালে তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার মৃত্যুকালীন নির্দ্দেশ অনুযায়ী উক্ত বংশ তালিকা প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। ইঁহাদেরও বহু জায়গা জমি ছিল; কালক্রমে তার অধিকাংশই বিক্রয় হয়ে যায়। মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।

ইহাদের বাড়ী ও স্বর্গীয নিবারণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যাযেব বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ গলিপথটি (প্রাচীন কালীতলা লেন) পরিত্যক্ত হয়ে ১৮৯৪ খৃঃ (বাং ১৩০১) কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে (শ্রী প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধায়ের পিতা) ক্রীত জমির উপর দিয়ে বর্ত্তমান সরল রাস্তাটি ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত সংযুক্ত হয। কালীশঙ্কর উক্ত জাযগাজমি প্রাপ্ত হন তদীয় মাতামহ মদনমোহন তরফদারের ওয়ারিশ সূত্রে। (১৮৯৪ খৃঃ শ্রীরামপুর পৌরসভাকে ৩১১৭ নং বিক্রীত দলিল অনুযায়ী)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২৮ শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রে জনৈক দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক শ্রী শ্রী৺কালীমাতার অলঙ্কারাদি অপহবণ কালে সাধক জটাধর পাকড়াশী স্থাপিত ও স্মরণাতীত কাল থেকে পূজিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হয়। বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্রকারগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে উক্ত ভগ্ন মূর্ত্তির পূজা নিস্ফল ; কাজেই উক্ত মূর্ত্তি বিসর্জন দিযে নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাই শাস্ত্রানুমোদিত। কিন্তু উক্ত বিধান অনুযাযী কার্য সমাধা করতে গ্রামবাসী ও সেবায়েতগণের মধ্যে অনেকেই পশ্চাদ্‌পদ হন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত নৃত্য গোপাল গড়গড়ীর নেতৃত্বে সেবায়েতগণের অন্যতম ৺জটাধর পাকড়াশীর বংশধর পরলোকগত পরেশ নাথ ও শ্রীযুক্ত অমরনাথ পাকড়াশী উপযুক্ত শিল্পীর দ্বারা মায়ের অনুরূপ মূর্ত্তি নির্মাণ করান ও গ্রামবাসী কযেকজন ব্রাহ্মণ সন্তানের সাহায্যে গভীর রাত্রে পূর্বোক্ত ভগ্নমূর্ত্তি পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বক্ষে বিসর্জন দেন। ১৩৩৬ সালের ১৪ই কার্ত্তিক বাংসরিক শ্যামাপূজার দিন ৺নিবারণ চন্দ্র পাকড়াশী ও শ্রী অমরনাথ পাকড়াশী মহা সমারোহে ও শাস্ত্রোক্ত বিধানে নব নির্মিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

বিরাট ভোগ।

এই বৎসরই শ্রীযুক্ত নৃত্য গোপাল গড়গড়ী প্রমুখ কয়েকজন

কর্মীর উদ্যোগে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার বিরাট ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। তদবধি প্রতিবৎসর জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থে এবং ব্যবসায়ীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত বিবিধ উপকরণে গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ পরম নিষ্ঠা ও শুচিভাবে এই ভোগরন্ধন ও সমাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরিবেশন করে আসছেন। সে হল এক অপূর্ব দৃশ্য। এ সম্বন্ধে ১৯৬৬ সালের ১৬ই নভেম্বর আনন্দ বাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

"রিষড়ায় এবারও সমারোহে সিদ্ধেশ্বরী মাতার মৃন্ময়ী মূর্তি পূজা হয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে এই পূজা চলে আসছে। পূজায় অন্যান্য বারের মত এবারও বিরাট ভোগের আয়োজন করা হয়। প্রসাদের জন্য খাদ্য দফতর চালের বরাদ্দ করেন নি। কিন্তু রিষড়ার নাগরিকেরাই এগিয়ে এসে নিজেদের বরাদ্দ থেকে ভোগের চাল দিয়েছেন।"

পর্যায়ক্রমে বহু সমিতির পরিচালনায় চলে আসছে উক্ত বিরাট ভোগ অনুষ্ঠান। ৺নৃত্য গোপাল গড়গড়ীর উদ্যোগে পূর্বোক্ত ভিত্তির উপর ভোগ গৃহের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় কিন্তু তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ট্রাস্টমন্দিরের সভ্যগণ 'বিরাট ভোগ তহবিল' থেকে অসম্পূর্ণ কায সমাধা করেন এবং অদ্যাবধি সেই গৃহেই প্রধান ভোগ রন্ধনাদি কার্য সম্পন্ন হয়ে আসছে। এ ছাড়াও প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে গ্রামের মধ্যে মহামারী নিবারণ কল্পে মায়ের বিশেষ পূজা ও স্বস্ত্যয়ণ কার্য অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৩৭৩ সালে ৺নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মাঘী সংক্রান্তিতে একটি অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রিষড়ার স্বর্গীয়া কামিনী দাসীর দু'টী বাড়ী বিক্রয় লব্ধ অর্থে (স্বর্গীয় নৃত্য গোপাল গড়গড়ীর মারফৎ) দেবীর চতুষ্কোণ গর্ভগৃহটি পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ এবং উত্তর দিকে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়গণ প্রদত্ত জমির উপর দিয়ে প্রদক্ষিণ পথ নির্মিত হয়।

রিষড়া নিবাসী ক্ষেত্রমোহন ঘোষের অর্থানুকূল্যে তাঁর স্বর্গতা পত্নী দুর্গাবালার স্মৃতিরক্ষার্থে নাট মন্দির নির্মিত হয়। মহামহোপাধ্যায় ডঃ যোগেন্দ্রনাথ বাগচীর সভাপতিত্বে ১৩৬৫ সালের ১লা কার্ত্তিক এই নাট মন্দিরের উদ্বোধন কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

১৩৭১ সালে জন সাধারণের প্রদত্ত অর্থে বর্তমান নবচূড়া-বিশিষ্ট এবং মর্মর ফলকে আচ্ছাদিত দক্ষিণে প্রসারিত চত্বর সহ মায়ের মন্দির নূতন ভাবে গঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট দাতাদের অন্যতম হলেন মেসার্স বাঙ্গুর ব্রাদার্স (হেষ্টিংস মিলের বর্তমান স্বত্বাধিকারী)। ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার (১৩৭১) পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে উক্ত সম্বর্দ্ধিত মন্দিরের উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন হয়। বর্তমান সুসংস্কৃত নবরূপায়িত দেবালয়ের স্থাপত্য শৈলী, মনোরম পরিবেশ ভক্তবৃন্দের কাছে এক পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র।*

পঞ্চনন্দের মন্দির।

১৯০৭ খৃঃ মাহেশের বিখ্যাত সিগার ব্যবসায়ী স্বর্গীয় নৃত্য গোপাল দাস জি, টি, রোড ও দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরটি নির্মান করে দেন। (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য) যতদূর জানা যায়, ১৮৯৭/৯৮ খৃঃ স্বর্গীয় আত্মারাম হড় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ছোট্ট ডোবা থেকে বিগ্রহের শিলামূর্ত্তি উদ্ধার করে ঐ স্থানে স্থাপন করেন। তখন জি, টি, রোডের পার্শ্ববর্ত্তী ঐ

*সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়:— হুগলী জেলার ইতিহাস:— উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী, ১৩৪৯) এবং শ্রীসুধীর কুমার মিত্র। তৎপ্রণীত হুগলী জেলার দেব দেউল (১৩৭৮), বিরাট ভোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৪০, ১৩৭৪ এবং দৈনিক বসুমতী ২৯/৭/৭২। রিষড়ার দেবালয়গুলির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখকের পরবর্ত্তী রচনা 'রিষড়ার দেব-দেবী' নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

জায়গাটি ছিল সামান্য বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই বিগ্রহের পূজার্চ্চনার সঙ্গে নিকটবর্ত্তী মল্লিক বংশের কিছুটা যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। ১৯৩৬ সালে সেটেলমেন্ট রেকর্ডে দখলীকার হিসাবে কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম লিপিবদ্ধ আছে। (দাগ নং ৫৬৩৬)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ফেলু মোদকের দোকানের সম্মুখে ওলাই চণ্ডীমাতার শিলা মূর্ত্তিও উক্ত আত্মা রাম হড় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত হয়।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চানন্দের মন্দির নির্মাণ করে জমি দান করেন। তিনি পুলিশ বিভাগে সামান্যভাবে কার্য্যারম্ভ করার পর নিজের কর্মদক্ষতার গুণে দারোগার পদে উন্নীত হন। সে যুগে দারোগাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৯/১১/২৯ তারিখে ৮৯ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর বাড়ীতে কয়েক বৎসর দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হযেছিল বলে জানা যায়। বর্ত্তমানে উক্ত মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা প্রচলিত হযেছে। সময়ে সময়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে মানসিক পূজানুষ্ঠানও হয়ে থাকে। কথায় বলে, শিব ঠাকুর নাম ভাঁড়িয়ে পাঁঠাও খেয়ে থাকেন।

রিষড়া অনাথ আশ্রম।

১৯০৮ খৃঃ (১৩১৫ বঙ্গাব্দে) স্বর্গীয় ননীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনার অভিনবত্ব, দুঃস্থ পরিবারবর্গের অভাব মোচনে তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রম আজও তাঁর জীবন-দর্শনের স্বাক্ষর বহন করছে। আর্ত্তের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। চির-কৌমার্য ব্রতধারী শ্রীমৎ ননীলালের অন্যান্য সহকর্মীরা সকলে এই ব্রত পালন করতে না পারলেও ৺কুঞ্জবিহারী

লাহার পুত্র রামনিধি লাহা মহাশয় শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন ক'রে ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং শেষ জীবনে দ্বারকাধামের তোতাদ্রী মঠের অধ্যক্ষতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই স্থানেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীমৎ ননীলাল প্রত্যেক বাড়ীর গৃহিনীদের অনুরোধ করেন যেন তাঁরা প্রতিদিন অন্ন পাক করার আগে তাঁদের দীন দুঃখী কাঙ্গাল সন্তানদের জন্যে এক মুষ্টি চাল একটা পাত্রে ফেলে রাখেন। সপ্তাহান্তে ঐ চাউল সংগৃহীত হত আশ্রমের কর্মীদের মাধ্যমে এবং সেগুলি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় বিতরিত হত। ১৯৫৮ খৃঃ এই অনাথ আশ্রমের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি বাৎসরিক অনুষ্ঠানগুলিতে বহু মনীষীর শুভাগমন হয়ে চলেছে। (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

১৩/২/১৭ তারিখের সভায় পৌরসদস্যগণ তদানীন্তন সম্পাদক ৺পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের আবেদন ক্রমে এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটিকে মাসিক ৫্ হারে অনুদান মঞ্জুর করেন। কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হারে সে অনুদান আজও বজায় আছে। শ্রীমৎ ননীলালের তিরোধানের পর তাঁর সহকর্মীদের অন্যতম ৺জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে এর উপকারিত্ব ও কার্যতালিকা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই আমলে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৩৭) এই আশ্রম প্রাঙ্গনে রিষড়ার প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি সেই উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়ে চলেছে। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ-প্রদীপ প্রজ্বলিত রেখেছেন এবং নানাভাবে এর উন্নতি বিধানে সচেষ্ট আছেন। পূর্বে এই আশ্রমে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁর নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হত। (বার্ষিক কার্য বিবরণী— ১৩৪৩)

বহু দাতার দানে এই আশ্রমে বস্ত্রাদি ও ঔষধ পথ্যাদি দানের ব্যয় নির্বাহ হয়ে চলেছে একথা বলাই বাহুল্য।

রিপন ক্লাব।

প্রাচীন রিপন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। পরবর্ত্তী-কালে কতকগুলি নূতন ক্লাবের সংমিশ্রণে নামকরণ হয় 'রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাব।'

ফুটবল খেলাই ছিল এই ক্লাবের প্রাথমিক যুগের প্রধানতম লক্ষ্য এবং ফুটবল খেলায় ক্লাবের সভ্যেরা বহু প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন। সভ্য তালিকায় যাঁরা ছিলেন আজ তাঁদের প্রায় সকলেই লোকান্তরিত। হেষ্টিংস মিলের কয়েকজন ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়ও এই ক্লাবের সভ্য তালিকাভূক্ত ছিলেন। তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত 'মোহন বাগান' দলের ক্রীড়ানৈপুণ্যই ছিল এঁদের আদর্শ স্থানীয়। এই সমস্ত সভ্যদের একটি সম্মিলিত আলোকচিত্র বর্ত্তমানে পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীবিভূতি ভূষণ দত্তের নিকট সংরক্ষিত আছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভোলানাথ বাবু), বসন্ত কুমার দত্ত (বিনোদ দত্ত), মোহন স্বর্ণকার, সমৎকুমার দত্ত, শিবচন্দ্র আশ, পরেশ নাথ আশ, হরেন্দ্র কুমার দাঁ (ওরফে রতা দাঁ) প্রভৃতি।

সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মাহেশ 'জগন্নাথ স্পোর্টিং' ক্লাবেরও অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন। নিজস্ব খেলার মাঠ না থাকায় বাগের খালের নিকট খোলা জমি অথবা বর্ত্তমান এ্যালকেলী মিলের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ফাঁকা জায়গাগুলি খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হত। উক্ত আলোক চিত্রে যে দু'জন ইউরোপীয়ান সভ্যের প্রতিকৃতি আছে তাঁরা হলেন মিঃ ল্যাং ল্যাং এবং মিঃ বানহাম।

(শ্রীবিশ্বনাথ আশের সৌজন্যে)

১৯১০ সালের কয়েকটি ঘটনা।

উক্ত সালে যুগপৎ সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক এবং ১০ই মে হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় জনগণের চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

এই বৎসরই শ্রীরামপুর কলেজ পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত এবং সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হওয়ায় রিষড়ার ছাত্র সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

এই সালেই ভদ্রেশ্বর থেকে লিলুয়া পর্যন্ত তৃতীয় রেল লাইন খোলা হয় এবং তদুপলক্ষে ক্রীত জমির অতিরিক্ত অংশ (রাইল্যাণ্ড রোডের পার্শ্ববর্ত্তী) ২৬/৪/১৮ তারিখে রেলওয়ের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার রিষড়া কোন্নগর পৌর সভাকে হস্তান্তর করেন

১৯১০ সালেই এল, এম, এস, পাশ করেন ডাঃ প্রাণতোষ লাহা। তিনিই বোধহয় গ্রামের মধ্যে প্রথম এল, এম, এস, তাঁর পূর্বে যে কয়জন ডাক্তার ছিলেন তাঁরা এল, এম, এফ্ বা ঐ শ্রেণী ভূক্ত ছিলেন। প্রথম এম, বি, পাশ করেন ডাঃ কৃষ্ণধন আশ।

১৯০০ খৃঃ ডাঃ লাহা এবং তাঁর সহপাঠী ৺হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হরিচরণ বাবু অবশ্য এই পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন এবং এফ, এ পরীক্ষাতেও (ফাষ্ট আর্ট) তিনি বৃত্তিসহ সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় কিশোরী মোহন ঘোষাল ছিলেন ডাঃ লাহার সহপাঠী। (কোন্নগর বিদ্যালয় শতবার্ষিকী পুস্তিকা)

দাঁ বংশীয় প্রসিদ্ধ দোলযাত্রা।

১৯১০ সালেই (বাং ১৩১৬) মহাসমারোহে আরম্ভ হয় দাঁ

বংশীয়গণের দোলযাত্রা, এই দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হত তৃতীয়া তিথিতে। এ ধরণের ফল্গুৎসব এবং আতসবাজীর সমারোহ সে যুগে গ্রামের মধ্যে একটা প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত।

এই দোলযাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা প্রভৃতি। বহু স্বজাতীয় এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। হেষ্টিংস মিলের সাহেব মেমেরাও আসতেন এই সব গীতাভিনয় দর্শন করতে। উক্ত মিলের সৌজন্যে ৺পুর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের বাড়ীতে (তদানীন্তন হেড ক্লার্ক) তখন প্রচলিত ছিল বৈদ্যুতিক আলো, পাখা ও কলের জল। তাঁর সুসজ্জিত সুরম্য বৈঠকখানার প্রশস্ত হল ঘরে সমবেত হতেন অতিথি অভ্যাগতরা। অভিনয় আসরে চলত বড় বড় তাল পাতার পাখার বাতাস আর ঘন ঘন গোলাপ জলের সিঞ্চন! এই উৎসব উপলক্ষে পুর্ণচন্দ্র দাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺গিরীশ চন্দ্র দাঁর নামেই আমন্ত্রণ পত্রাদি বিতরিত হত। তিনি ছিলেন সরকারী সেচ বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। ছাত্রজীবনে তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে পুরস্কার লাভ করেন। (কোন্নগর প্রকাশিকা)

প্রাচীন দোলমঞ্চটি আজও সেই উৎসব-মুখর দিনগুলির স্মৃতি বহন করছে।

নূতন বাজার।

১৯০২ সালে ৺পুর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন উদ্দেশ্যে যে জমি ক্রয় করেন (পৃঃ ৪২৫) সে জমির প্রয়োজন না থাকায় ২৬/১১/১৯১১ তারিখের সভায় স্কুল কর্তৃপক্ষ উক্ত জমির উপর তাঁদের সর্বপ্রকার দাবী দাওয়া ত্যাগ করেন এবং সম্পাদক পুর্ণবাবুকে তাঁর নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুমতি প্রদত্ত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ৺গিরীশ চন্দ্র দাঁ এবং সভ্যদের মধ্যে

উপস্থিত ছিলেন—পূর্ণচন্দ্র দাঁ, গোপাল চন্দ্র মল্লিক, ডাঃ প্রাণতোষ লাহা ও সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তদনুযায়ী পূর্ণবাবু পঞ্চানন্দ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ঐ জমির উপর একটি বাজার স্থাপন করেন, যার ফলে পল্লী বাসীদের বিশেষ সুবিধা দেখা দেয়। বস্তির মধ্যে কলবাজারে যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক হত না।

জি, টি, রোড ডাইভার্সানের প্রয়োজনে এই বাজারের অধিকাংশ জমি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত হওয়ায় তদ্‌বংশীয়গণ ১৯৩৮ সালে ক্রাভেন রোড ও নূতন জি, টি, রোডের সংযোগ স্থলে একটি বৈকালিক বাজার স্থাপন করেন। তদানীন্তন মহকুমা শাসক শ্রীযুক্ত অবনী-ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, আই, সি, এস মহোদয় এই সন্ধ্যা বাজারের উদ্বোধন করেন।

ইতিপূর্বে ১৯২৭ সালে হেষ্টিংস মিল কর্তৃপক্ষ ক্রাভেন রোডের উত্তর পার্শ্বে একটি আধুনিক ধরণের পাকা-ষ্টলযুক্ত বাজার স্থাপন করেন কিন্তু নানা কারণে সেটি স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে নি। এখন সেই বাজারটি পরিবর্ত্তিত আকারে বিপনী শ্রেণী এবং মিলের কর্মচারীদের আবাস-ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বসমরানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত দুর্ভোগ দেখা দেয়। বিশেষ ক'রে কেরোসিন তেলের অভাব হেতু দুর্দ্দশার চরম পরিণতি ঘটে। যুদ্ধ চলাকালীন কেরোসিন তেলের দর নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি পায়:—

হাতীমার্কা-- প্রতি বোতল— ২ আনা ৯ পাই।
উদীয়মান সূর্য— ঐ — ২ আনা ৬ পাই।
হাঁসমার্কা — ঐ — ১ আনা ৯ পাই।

চাউলের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় (১০_ মণ) হেষ্টিংস মিল কর্তৃপক্ষ তাঁদের শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুবিধার জন্যে রেঙ্গুন চাল আমদানি ক'রে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করেন।

এর উপর মহকুমা শাসক কর্তৃক সৈন্য বিভাগে লোক সংগ্রহ করার প্রচেষ্টায় অনেকেই ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েন। এই সুযোগে অবশ্য রিষড়ার কয়েকজন যুবক সৈন্য বিভাগে চাকুরী সংগ্রহ করেন বলে জানা যায়। ভট্টাচার্য বংশের ৺জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রামদাস হড়, পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ষষ্ঠীতলা) এবং শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। "During the 14th-I8 war Champdany and Wellington Mills manufactured large quantities of sand bags······The Mills, however engaged extensively on war work and produced for the British and Indian Governments large quantities of standard cloth, also special fabrics."

[James Finlay & Co. Ltd. 1750-1950]

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর ১১ই নভেম্বর তারিখে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় গভর্নমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শান্তি-স্মারক পদক দেবার ব্যবস্থা করেন। ১২/৭/১৯ তারিখের সভায় পৌর সদস্যগণ জেলা শাসকের সংশ্লিষ্ট পত্রটি আলোচনান্তে রিষড়া মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে রাজা-রাণী মার্কা একটি ক'রে ব্রোঞ্জ পদক ও মিষ্টান্ন দানের ব্যবস্থা করেন। তদবধি প্রতি বৎসর ১১ই নভেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হত।

রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভা প্রসঙ্গে

পূর্বোক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টো-

বর স্বতন্ত্র রিষড়া-কোন্নগর পৌর সভা কার্যারম্ভ করেন এবং রিষড়া বঙ্গ বিত্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনটিই তাঁদের কার্যালয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের পরিচালনায় ১১/৯/১৫ তারিখে পৌর সদস্য নির্বাচন কার্য সমাধা হয় এবং শ্রীরামপুর পৌর সভার অনুকরণে নবগঠিত পৌর সভা ৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়। তার মধ্যে ১ ও ২ নং ওয়ার্ড ছিল রিষড়ায় এবং ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়েছিল সমগ্র কোন্নগর এলাকা। মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের তালিকাটি ছিল নিম্নরূপ :—

১ নং ওয়ার্ড (বস্তি অঞ্চল) ঃ-বাবু পূর্ণ চন্দ্র দাঁ ও বাবু রাধা প্রসাদ সা।

২ নং ওয়ার্ড (পল্লী অঞ্চল) :-ডাঃ প্রাণতোষ লাহা, এল, এম, এস, ও বাবু বামন দাস বন্দোপাধ্যায়, বি, এল।

৩ নং ওয়ার্ড (কোন্নগর বাগখালের দক্ষিণ) :-বাবু নৃসিংহ দাস বসু ও বাবু শতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪ নং ওয়ার্ড (ডি, ওয়ালডি পর্যন্ত) :-ডাঃ চণ্ডী চরণ ঘোষাল এল, এম, এস, ও বাবু রাধিকানাথ ঘোস, এম, এ, ।

৪ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে রিষড়ার প্রতিনিধি ছিলেন— মিঃ পি, টি, রোজ ও বাবু নলীন বিহারী চট্টোপাধ্যায়।

কোন্নগরের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন—মিঃ ই, হেওয়ার্ড ও মৌলভী আবদুল মোহাইমিন।

৪ঠা অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত পৌরসদস্যগণের অতিরিক্ত সভায় নিম্নলিখিত সভ্যদ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হনঃ—

১। মিঃ পি, টি, রোজ (হেষ্টিংস মিলের ম্যানেজার) সভাপতি।

২। বাবু নৃসিংহদাস বসু, বি, এল, (কোন্নগর)—সহ-সভাপতি, (১৯১৫ সালের বার্ষিক কার্য বিবরণী)।

নবগঠিত পৌর প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত বাজেট অনুযায়ী কার্যারম্ভ করেন ঃ—রিষড়ার ১ নং ও ২ নং ওয়ার্ডের আনুমানিক আয় :—

ওয়ার্ড	ক্ষেত্রফল	লোক সংখ্যা ১৯১১ সাল	গৃহ সংখ্যা	ফেরি	খোঁয়াড়	বাড়ীর ট্যাক্স	পায়খানার ট্যাক্স
১নং ওয়াড	·২৭	১১,১১৭	২৮৪	—	২০০৲	৮৩২৪৲	৩৩১৮৲
২নং ওয়াড	·৫৩		৭৮৪	৫০৮	—	১৭৮৩৲	১৭৭৬৲

বিবিধ সমেত মোট আনুমানিক আয়—১৬,১৫৮৲ টাকা।

প্রকৃত আয় হয়েছিল প্রায়—১০,০০০৲ টাকা

'কোন্নগর প্রকাশিকা' পত্রিকায় স্বর্গীয় নৃসিংহ দাস বসু মহাশয় তৎকালীন পৌর কর্মচারী বিন্যাস সম্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :—

"প্রথমে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় হেডক্লার্ক ও একাউন্টেন্ট এবং শ্রীযুক্ত দাশরথি দাস কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। উভয়ের সহকারী রূপে শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ কাজ করিতে থাকেন। বেতন যথাক্রমে ৪০৲ ৩০৲ ও ২০৲ টাকা। সভাপতি নিজ হইতে Hd. Clerk & Accountant. কে আরো ২৫৲ টাকা দিতে সম্মত হন। উক্ত সময় পৌর সভার ওভারসিয়র ছিলেন শ্রীকালীপদ নাথ এবং আমীন ছিলেন শ্রীপ্রাণতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ মান্না। ট্যাক্স আদায়কারী ছিলেম শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীসারদা প্রসাদ চৌধুরী।" (জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৬)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু পৌরসভায় ১৫৲ টাকার কম বেতন ভোগী কর্মচারীদের মাসিক ॥. আটআনা দুর্মূল্যভাতা মঞ্জুর করা হয়।

১৯১৮ সালে দ্বিতীয় নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন মিঃ ই, হেওয়ার্ড (কোন্নগর ডি, ওয়ালডি মিলের স্বত্ত্বাধিকারী) কিন্তু তিনি ৩ মাস ছুটি নেওয়ায় অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয় (২৬/৮/১৮)। তিনিই ছিলেন পৌরসভার প্রথম বাঙালী সভাপতি। সহ সভাপতি ছিলেম—শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এই সময় ১৯১৬ সালে নূতন ক'রে করদাতা সমিতি গঠিত হয় এবং তার সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীনরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল। তখন পৌরসভার মাসিক সভার মুদ্রিত কার্য বিবরণী-গুলি উক্ত করদাতা সমিতিকে প্রদত্ত হত।

১৯১৬ সালে দাঁ ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শ্মশান ঘাটটি দাঁ বংশীয় কয়েকজনের প্রযত্নে ও অর্থব্যয়ে পাকা ভাবে নির্মিত হওয়ায় পৌর সদস্যগণ ২৪/৬/১৬ তারিখের সভায় উক্ত ভদ্র মহোদয়গণকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ঐ স্থানে একটি কেরোসিন তেলের আলোর ব্যবস্থা করেন।

১৯১৯ সালে এক যোগে কলেরা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দেয় যার ফলে বস্তি অঞ্চলে কিছু প্রাণহানি ঘটে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান যোধন সিং রোডে বাৎসরিক মৃন্ময়ী কালী মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। (শ্রীমহাবীর মিশ্র ঠাকুরের বিবৃতি অনুযায়ী)।

নবনিযুক্ত পৌরসদস্যগণ রাস্তায় কেরোসিন তেলের আলোক সংখ্যা বাড়ানোর দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেন। কারণ অন্ধকারময় নির্জনতার সুযোগেই যে বারবার এ গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতি হবার সুযোগ ঘটছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটে ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ডাকাতির কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে—পৃঃ ৪১৩। দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় ৺দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে।

এ গ্রামে পুলিশ ফাঁড়ি না থাকাই যে উক্ত ডাকাতিগুলোর অন্যতম কারণ এই সমস্ত যুক্তির অবতারণা ক'রে বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর এ বিষয়ে কোনও আগ্রহ দেখান নি।

শেষ পর্যন্ত বামনদাস বাবুর সঙ্গে যোগদান করেন পৌরসদস্য এবং রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার ৺নলিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় (৺নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা)।

রিষড়ায় পুলিশ ফাঁড়ি।

ইতিমধ্যে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯২০) আবার এক সাংঘাতিক ডাকাতি হয় ৺দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাতন বাড়ীতে (তৎকালে ৺নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বিক্রীত)। ডাকাত দলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রতিবেশী ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ৺পুলিন বিহারী নন্দী আহত হন। পুলিন নন্দী বল্লমের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হওয়ার ফলে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে চিকিৎসার্থে ভর্তি হন। (দৈনিক বসুমতী)। পুলিন নন্দী ছিলেন সে সময়ে দেওয়ানজী ষ্ট্রীটে তাঁর সহোদর ৺প্রকাশ নন্দী সহ একটি ছোট খাট মুদিখানা দোকানের পরিচালক হিসাবে বিশেষ পরিচিত এবং বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী, কিন্তু উক্ত আঘাতের পর তাঁর পূর্ব স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। উক্ত ডাকাতির পর স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়। বন্দুক তখন অবশ্য রিষড়ার অন্যান্য কয়েকটি বাড়ীতে অবস্থিত ছিল।

উপরোক্ত ঘটনার পর সরকারী কর্তৃপক্ষ আর নীরব থাকতে পারেন নি। জনসাধারণের নিরাপত্তার খাতিরে ১৯২১ খৃঃ জি, টি, রোডের পূর্ব পার্শ্বে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপিত হয় ৺সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের ভাড়া বাড়ীতে।

আদর্শ পুলিশ শাসন কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি হুগলী জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্টের অফিসের দেওয়ালে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ আছে:—

"সভূষণা বরাঙ্গনা
পথে যদি করে বিচরণ,
নিরুদ্বেগে একাকিনী,
তবে মানি প্রকৃষ্ট শাসন॥" (শান্তিপর্ব)

কিছুদিন পরে এই পুলিশ ফাঁড়ি স্থানান্তরিত হয় পার্শ্ববর্তী নবনির্মিত সাধুখাঁদিগের ভবনে। সে স্মৃতি আজও তাঁদের ইলেক্‌ট্রিক বিলের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে :— Sri Gopal Ch. Sadhu-khan, G. T. Road East. (old Police station)। ১৯৩১/৩২ খৃঃ পুনরায় উক্ত পুলিশ ফাঁড়ি বর্তমান শ্রীমানি ভবনে উঠে আসে এবং স্থান সংকুলানের প্রয়োজনে উপরে দ্বিতল কক্ষাদি নির্মিত হয়।

২২/৮/২১ তারিখে পৌরসভার তৃতীয় নির্বাচনে দেওয়ানজী বংশধর স্বর্গীয় তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর পৌর সভার আমল থেকে দীর্ঘকাল পৌর সভার কার্যে তাঁর অবদানের কথা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ২৯/৪/৪৪ তারিখের সভায় পৌরসদস্যবৃন্দ দেওয়াজী ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশ (চার বাতি পর্যন্ত) তাঁর নামে অভিহিত করেন। বস্তি ও পল্লী অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বত্র উন্নতি মূলক কাজে ছিল তাঁর সমান দৃষ্টিপাত।

ইতিপূর্বে তাঁদের প্রদত্ত জমি দিয়ে প্রশস্তকৃত মুখার্জী বাগান লেনটি তাঁর পিতা (দেওয়ান রামনিধির পৌত্র) ৺স্বরূপদাস মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত করা হয় ১৮/৪/২৫ তারিখের পৌর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। স্বরূপদাস মুখোপাধ্যায়ের অপর পুত্র স্বর্গীয় গোষ্ঠ বিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন রিষড়া থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর সভ্য এবং 'টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়ার' প্রথম শ্রেণীর ষ্টেনোগ্রাফার।

উক্ত নির্বাচনে পৌর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মিঃ টি, ডব্লুই, পামার কিন্তু তাঁর পূর্ণ তিন বৎসর কার্যকালের মধ্যে শেষ বৎসরে তাঁর স্থলে অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে কার্য করেন কোন্নগর নিবাসী শ্রী হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

পৌর সভার উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী।

১২/২/২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শ্রীহরি চরণ চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি এবং স্বর্গীয় তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু হরি চরণ বাবু পদত্যাগ করায় শ্রীবামন দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ২৩-১২-২৩ তারিখের সভায় অবশিষ্ট কার্যকালের জন্যে সভাপতি নির্বাচিত হন। সুদীর্ঘকাল পৌরসভার কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও পৌর সভাপতি পদে এই তাঁর প্রথম নির্বাচন। তাঁর আমলে নিম্নলিখিত উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী সম্পন্ন হয়:—

নলকূপের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্যে ১৯২৪ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখের সভায় ২,৬৬০০০ টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই টাকার ১/৩ অংশ সরকারী সাহায্য (ঋণ) হিসাবে প্রদানের জন্যে আবেদন পত্র দাখিল করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঋণ দানে সম্মত না হওয়ায় ১৯২৭ সালে নলকূপের মাধ্যমে রিষড়া-কোন্নগর পৌর এলাকার স্থানে স্থানে জল সরবরাহের জন্যে মোট ২০,০০০ টাকার একটি প্রকল্প গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী কার্যারম্ভ হয়। রিষড়ায় প্রথম টিউবওয়েল স্থাপিত হয় পূর্বোক্ত দেওয়ানজী ষ্ট্রীট ও জি, টি, রোডের সংযোগ স্থলে অবস্থিত বাজারের সন্নিকটে।

উক্ত সালেই বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে রাস্তাগুলি আলোকিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কলকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসনকে তদনুযায়ী একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে অনুরোধ করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৭/১১/২৫ তারিখের সভায় ৺বামনদাস বন্দোপাধ্যায় ও ৺রাধারমণ লাল যথাক্রমে পৌর সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন কিন্তু অনিবার্য কারণে রাধারমণ লাল পদত্যাগ করায় ডাঃ প্রাণতোষ লাহা ১২/৩/২৮ তারিখের বিশেষ সভায় অবশিষ্ট কালের জন্যে সহসভাপতি নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে ১৯২৭ সাল থেকে পৌর-নির্বাচনে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদত্ত হয়। ২৯২৯ সালের নির্বাচনে বামনদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভোটযুদ্ধে পরাস্ত হলেও পৌরসভার কার্যে তাঁর দক্ষতা ও বহুবিধ গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার-মনোনীত সদস্যরূপে পরিগৃহীত হন কিন্তু বার্দ্ধক্য হেতু এবং অন্যান্য কারণে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

এই বৎসর থেকেই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল (ওরফে গোবর্দ্ধন বাবু) নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে পৌরসভার কার্যে যোগদান করেন এবং বহু উন্নয়ন মূলক কার্যের স্থষ্টি কর্ত্তা হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি ইতিপূর্বে রিষড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৩/২/২৭ তারিখ থেকে প্রেসিডেন্ট পামার সাহেব ছয়মাসকাল ছুটি নেওয়ায় তিনি সর্বসম্মতি-ক্রমে উক্ত পদে অভিষিক্ত হন।

২৭ ৩/২৯ তারিখের সভায় নব নির্বাচিত পৌর সদস্যগণ কর্তৃক কোন্নগরের ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষাল, এল, এম, এস, সভাপতি এবং রিষড়ার শ্রীঅতুল চন্দ্র হড় সহসভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩১ সালে ১০ই জুন তারিখে বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তিনিই ছিলেন নবগঠিত রিষড়া কোন্নগর পৌরসভার স্থষ্টি কর্ত্তা। তাঁর মৃত্যুতে পৌর সদস্যগণ যে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাতে উল্লেখ করা হয় যে :—

"Late Bamandas Banerjee, B. L. a whilome Chairman of this municipality and the oldest Commissioner of the Board, who spent nearly 40 years of his life in doing various public services to the rate-payers of Rishra & Konnagar and those of old Serampore Municipality of which he was also a Commissioner and Vice-chairman for some period."

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পৌরসদস্যগণ ৯/৯/২৭ তারিখের সভায় তাঁর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী নূতন রাস্তাটি (দেওয়ানজী ষ্ট্রীট থেকে ক্রাভেন রোড পর্যন্ত প্রসারিত) তাঁর নামে অভিহিত করেন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা।

১৯১৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় দেওয়ানজী ষ্ট্রীটে ৺পান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "মুক্তি-মন্দির।" উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চ্চার কেন্দ্র হিসাবে এই সংস্থাটি ছিল বিশেষ ভাবেই পরিচিত। সরস্বতী পূজা ও দোলযাত্রা উপলক্ষে শোভাযাত্রা সহকারে বিষয়োপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন করা 'মুক্তি-মন্দিরের' সভ্যদের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁরা পরবর্ত্তীকালে একটি কালী-কীর্ত্তনের দল গঠন করেন এবং বহু স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে সুনাম অর্জ্জন করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চ্চাকারী হিসাবে ৺অসিতা কান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৺তারাপদ মুখোপাধ্যায় (তারাপদ মাষ্টার) শ্রীশিবদাস মান্না ও শ্রীদাসরথি দত্ত প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পান্নালাল লাহার নামও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

বারুই পাড়াতেও উপরোক্ত পূজা উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশনকারী একটি সমিতি গঠিত হয়, সে সময় পাখোয়াজ বাজনায় দক্ষতা অর্জন করেন ৺নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত। বহু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আসরে তিনি তাঁর বাদ্য প্রতিভা প্রদর্শন ক'রে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে স্বর্গীয় গুইরাম দাশের নামও উল্লেখযোগ্য।

মুক্তি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ৺পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইষ্টার্ন ব্যাঙ্কের চিফ্ একাউন্টেণ্ট। 'পানিদা' হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বজন পরিচিত। সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবেও তাঁর নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

মুক্তি মন্দিরের নিত্য সঙ্গতকারী হিসাবে ৺বসন্ত কুমার গড়গড়ীর

নামও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তিনি ছিলেন কলকাতা লাল বাজার থানার একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। অবসর প্রাপ্ত জীবনে তিনি কিছুদিন মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সঙ্গীত চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ে গঠিত হয়েছিল কয়েকটি কনসার্ট পার্টি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নবীন পাকড়াশী লেনে ৺রমেশ চন্দ্র পাকড়াশী, ৺প্রমথনাথ দাঁ, ৺শশীভূষণ দাঁ, পান্নালাল দে, রতনমনি দাঁ, সর্বশ্রী যতীন্দ্র নাথ দাঁ ও শিবদাস মান্না প্রভৃতির সংগঠন। প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক স্বর্গীয় শশীভূষণ দাঁ ছিলেন এই সংস্থার পরিচালক। বলা বাহুল্য, বহু মূল্যবান বাদ্যযন্ত্রাদি সংগৃহীত হয়েছিল এই সমিতির প্রচেষ্টায়। স্বর্গীয় এককড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'বীণাপাণি কন্সার্ট' পার্টি সে যুগে বহু থিয়েটার, যাত্রা, অপেরা প্রভৃতি নাটানুষ্ঠানে সহযোগিতা করে সুনাম অর্জ্জন করে।

নট ও নাট্যকার।

'রিষড়া বান্ধব নাট্য সমাজ' নামক প্রসিদ্ধ সখের অপেরা পার্টির জন্ম হয়েছিল প্রায় ৬০/৭০ বছর আগে। রিষড়া ও রিষড়ার বাহিরে বহু স্থানে এই নাট্য সংস্থা বিবিধ ধর্মমূলক গীতাভিনয় ক'রে সুনাম অর্জন করে। আন্দুলের দেবেন বাবু আসতেন এঁদের মহড়ার শিক্ষক রূপে। সখীদের নাচগান আর জুড়ীদের বিষয়োপযোগী উচ্চাঙ্গ তালমান সহকারে সঙ্গীত পরিবেশন ছিল তখনকার দিনের অপেরা পার্টির বৈশিষ্ট্য। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নিবারণ চন্দ্র দাস, সর্বশ্রী সারদা প্রসাদ দে, হীরালাল দাঁ, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। অভিনেতাদের মধ্যে রূপে গুণে ও স্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উত্তরপাড়ার জ্ঞান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তখন রিষড়ার অধিবাসী) ও হীরা লাল দাঁ। স্ত্রী ভূমিকায় তখন পুরুষরাই অভিনয় করতেন। নাট্যকার হিসাবে

স্বর্গীয় বামা চরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা নাটক গুলিই 'বান্ধব নাট্য সমাজ' কর্তৃক অভিনীত হত। তাঁর রচিত বহু নাটকের মধ্যে (পাণ্ডুলিপি) উল্লেখযোগ্য হল—'হরিশ্চন্দ্র', 'রাবণবধ'; 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'কুরুক্ষেত্র সমবাবসান', 'পার্থ প্রতিজ্ঞা', 'মীরাবাই' প্রভৃতি। এই দলের নিজস্ব টেবিল হারমোনিয়ম বাদ্যে দক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী।

বামাচরণ বাবু প্রথমে গারুলিয়া স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ১৯২৩ সালে রিষড়া এম, ই, স্কুলে হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন এবং সহকারী সম্পাদক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবেও কার্য করেন। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ও সুপণ্ডিত। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ২৬/৯/৫৯ তারিখের সভায় পৌর সদস্যবৃন্দ তিনকড়ি মুখার্জী ষ্ট্রীট থেকে কুণ্ডু কলোনীর দিকে প্রসারিত রাস্তাটি বামাচরণ মুখার্জী লেন নামে অভিহিত করেন।

১৩২৩ সালে (ইং ১৯৩০) ১লা কার্ত্তিক শারদীয়া পূজা উপলক্ষে স্বর্গীয় হেম চন্দ্র দাঁ মহাশয়ের ভবনে 'ভক্তলীলা' গীতাভিনয় বোধহয় উক্ত নাট্য সমাজের শেষ অভিনয়। ১৩৪৭ সালে (ইং ১৯৪০) পূর্বোক্ত মুক্তি মন্দিরের সম্পাদক স্বর্গীয় পান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং রিষড়া বান্ধব নাট্য সমাজের প্রাক্তন সভ্য স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ নিবারণ চন্দ্র দাসের সঙ্গীত পরিচালনায় বামাচরণ বাবুর রচিত 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা' গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হয় স্বর্গীয় রামদাস গড়গড়ী মহাশয়ের ভবনে ও সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার প্রাঙ্গনে। অভিনয় পরিচালনায় ছিলেন শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

এরপর বহু নাট্য সংস্থা রিষড়ায় বিভিন্ন নাটকের অবতারণা করেন। থিয়েটারে সুঅভিনয় করে তৎকালে যাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৺তিনকড়ি শ্রীমানি, হারু গুপ্ত এবং হাস্য-কৌতুক অভিনেতা হিসাবে অসিতাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। যাত্রাভিনয়ে

বহু রজনী সুঅভিনয়ে নাম. করেন স্বর্গীয় রতন মনি দাঁ এবং স্ত্রী ভূমিকায় স্বর্গীয় অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে যাঁরা অভিনয়ে সুনাম অর্জ্জন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ৺জীবন মুখোপাধ্যায় (রিষড়ার অস্থায়ী অধিবাসী) সুধীর কুমার দত্ত ও সর্বশ্রী হেমন্ত কুমার মল্লিক, কাশীনাথ হালদার, কেদার নাথ হালদার, দেবনারায়ণ গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ আশ প্রভৃতি।
(রিষড়া পৌরসভা সুবর্ণ জয়ন্তী পুস্তিকা—শ্রীশান্তি রঞ্জন দাস)

কলকাতা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের ছাত্র হিসাবে শ্রীকাশীনাথ হালদার. বহু রজনী বিভিন্ন নাটকে সুঅভিনয় করার জন্যে বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

'হলিডে ক্লাব' কর্তৃক অভিনীত ডা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পরিণীতার' নাট্যরূপ প্রদান করেন শ্রীগুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। তাঁর রচিত আরও কয়েকখানি নাটক উক্ত ক্লাব কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'বাঁচার নেশা', চান্সেলার' ও 'দুই স্বামী', শেষোক্তটি, রিষড়া, শ্রীরামপুর ও কলকাতা 'বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে' সুঅভিনীত হওয়ার ফলে সুখ্যাতি অর্জন করে ।

জল বিতরণী সমিতি ও শক্তি সমিতি।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২০) স্বর্গীয় সাধন চন্দ্র পাকড়াশীর পরিকল্পনানুযায়ী কয়েকজন যুবকের প্রচেষ্টায় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তারকেশ্বরগামী সন্ন্যাস ব্রতধারী নরনারীকে সুশীতল ও সুমিষ্ট পাণীয় জল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রখর রৌদ্রতপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত ব্রত উদ্‌যাপনকারীরা ট্রেনের মধ্যে থেকে এই সুমিষ্ট বরফজলের সরবৎ পানে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতেন এবং বিতরণকারী যুবক ও কিশোরদিগকে প্রাণখোলা আশীর্বাদ করতে করতে চলে যেতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে (বাং ১৩২৯) সাগর চন্দ্র পাকড়াশী, ধর্মদাস কাঞ্জিলাল প্রভৃতির উদ্যোগে 'শক্তি সমিতি' গঠিত হয়। শক্তি চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচর্চ্চা এবং সদাচার অনুষ্ঠানও ইহাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯২৫ সালে 'শক্তি' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং একটি ছোটখাট পুস্তকাগারও স্থাপিত হয়।

শোনা যায়, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সাধকপ্রবর শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর নবীন পাকড়াশী লেন নিবাসী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আগমন উপলক্ষে এই শক্তি সমিতিতে পদার্পণ করেন এবং এই সমিতির নিয়মাবলী পাঠে এবং কার্য তালিকা দর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

॥ নৈশ বিদ্যালয় ॥

১৩৩৩ সালে এই শক্তি সমিতির উদ্যোগে একটি নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। নিঃস্ব ছাত্রদের সন্ধ্যার পর বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষাদানই ছিল এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য। কিছুকাল কালুরায় লেন নিবাসী শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই বিদ্যালয়টি স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র খাঁর বহির্বাটীতে অবস্থিত ছিল। পরে উক্ত বিদ্যালয়টি অনাথ আশ্রম গৃহে স্থানান্তরিত হয় এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বর্ত্তমান সুশীল চন্দ্র আশুন রোড নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও শিক্ষকতা কার্যে যোগদান করেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ শিক্ষাদান নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়েছিল। অনাথ আশ্রমের সম্পাদক হিসাবে শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনায় বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে বার্ষিক পারিতোষিক

বিতরণের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল এবং তদুপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯৩৮ খৃঃ পৌরসভা কর্তৃক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে এই নৈশ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।

বিষড়া ব্যায়াম সমিতি।

১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) শ্রীললিত মোহন হড়ের প্রচেষ্টায় ও পরিচালনায় উক্ত ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডন, বৈঠক, মুগুর, প্যারালাল ও হরাইজেন্টাল বার এবং তার সঙ্গে অসি খেলা (পাতলা বাঁখারি নির্মিত), লাঠি খেলা, পাতলা কাঠের তৈরী ছোরা খেলা ও যুযুৎসু শিক্ষাই ছিল এই ব্যায়ামাগারের কর্মসূচীর অন্যতম। এছাড়া এই ব্যায়াম সমিতি স্পোর্টস্ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন এবং একটি ছোট পুস্তকাগারও স্থাপন করেন, যার জন্যে পৌরসভা কর্তৃক যৎসামান্য মাসিক অনুদানও প্রদত্ত হয়। শ্রীললিত মোহন হড় 'ধনুর্বাণ শিক্ষা' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হন।

ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাংলার বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ব্যায়াম বিদ, ক্রীড়া বিশারদ প্রভৃতির আগমন ঘটে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, রায় বাহাদুর মহেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীকানাই লাল গোস্বামী, শ্রীবি, ডি, চ্যাটার্জী, ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণু চরণ ঘোষ, বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, কলকাতার মেয়র দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী বি, এ,, প্রভৃতি।

এই ব্যায়াম সমিতির আহ্বানে ১২/৭/৪২ তারিখে প্রখ্যাত সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীযুক্তা ইলা ঘোষ স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ দাঁ মহাশয়ের উদ্যানস্থিত পুষ্করিণীতে প্রদর্শনী সন্তরণ কৌশল প্রদর্শন করেন। তিনি যে রিষড়ার প্রাচীন ঘোষ বংশের সন্তান এ সংবাদ তিনিই ব্যক্ত করে যান।

এই বৎসরই ১/৩/৪২ তারিখে ব্যায়াম সমিতির সভ্য রতন কৃষ্ণ হড় ম্যারাথন রেসে প্রথম স্থান এবং শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ভারতবর্ষের সমস্ত প্যারালালবার প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করায় ব্যায়াম সমিতি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অভিনন্দিত হন। এই প্রসঙ্গে নীল রতন বন্দোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ওলম্পিক গেম্‌স (দিল্লী) তিনিও ৫ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জ্জন করেন। বলা বাহুল্য ১৯৩২ সাল থেকে রতন কৃষ্ণ হড় দূর পাল্লার দৌড়কে তাঁর জীবনের প্রধান ক্রীড়া হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত 'ম্যারাথন রেসে' বাংলা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান এবং সর্ব্বভারতীয় অলিম্পিক ম্যারাথন রেস-এ ৩য় স্থান অধিকার করে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেন এবং ১৯৪২ সালে বাংলার অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে দূর পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতার সমগ্র বাংলার পক্ষে এক গৌরবময় রেকর্ড স্থাপন করেন। দুঃখের বিষয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করায় একটি উজ্জ্বল দীপ শিখা তার সম্পূর্ণ জ্যোতি বিকাশের পূর্বেই অকালে নিভে যায়। (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)।

তাঁর সহকারী হিসাবে শ্রীঅনিল কুমার হড়ও বহুদিন অনুশীলন চালিয়ে বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতায় নিজের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বজায় রাখেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমধুসূদন দাঁর নামও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত বহু দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার বিজয়ী হন এবং বিভিন্ন স্পোর্টসে চাম্পিয়ানশিপ

লাভ করেন বাংলা তথা ভারতের বিখ্যাত দৌড় বীর অমিয় মুখোপাধ্যায়কেও তিনি একবার পরাজিত করেন।

রতন কৃষ্ণ হড়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯৫৭ সালে রিষড়া নওজোয়ান সঙ্ঘ উত্তর পাড়া থেকে রিষড়া ব্যায়াম সমিতি পর্যন্ত ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতার প্রচলন করেন এবং তার মাধ্যমে স্থানীয় তরুণ ও কিশোরদের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করার প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমানে ব্যায়াম সমিতির পরিচালনায় উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ব্যায়াম সমিতির পরিচালনায় ১৯৩৭ সালে স্বর্গীয় নীল কমল পাকড়াশী স্মৃতি ৫ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীবিষ্ণু চরণ ঘোষ মহাশয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রতন কৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীললিত মোহন হড় হলেন উপরোক্ত দূর পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতার পথ প্রদর্শক। ১৯২৭ সালে তিনি ও প্রশান্ত কুমার দাঁ বিখ্যাত ক্রিড়াবিদ বি, ডি, চ্যাটার্জী প্রবর্ত্তিত ১০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীগোবর্দ্ধন হালদারের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তিনিও ১৯৬৫ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় জীমনাষ্টিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ২২/১০/৬৫ তারিখের 'যুগান্তরে' এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ—

"জিমনাষ্টিকে বাংলা দল,—আগামী ৪ঠা নভেম্বর থেকে বোম্বাইয়ে যে দশম বার্ষিক জাতীয় জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতা হবে তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্যে পশ্চিম বাংলার পক্ষ থেকে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :— গোবর্দ্ধন হালদার (রিষড়া ব্যায়াম সমিতি, হুগলী)।"

বলা বাহুল্য তাঁর এই কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে সমিতির পক্ষ

থেকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় ১৯/১২/৬৫ তারিখে সুখদাময়ী নারী শিল্প মন্দির প্রাঙ্গনে।

॥ রিষড়া হেলথ্ এ্যাসোসিয়েসন ॥

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁদেরই বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে ১৯৩৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় রিষড়া হেলথ্ এ্যাসোসিয়েসন নামক ব্যায়ামগারের। সাধারণ স্বাস্থ্যচর্চ্চা ছাড়াও তাঁরা যে প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সেটি হল গ্রামের নর-নারীদের মধ্যে শিশুপালন বিদ্যা, মাতৃত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠ পোষকতায় 'Health and Child Welfare Show' নামে শিশু প্রতিযোগিতা। ১৯৪০ সালে বাংলার কৃতি সন্তান ও ব্যায়ামবিদ্ মেজর পি, কে, গুপ্ত (আই, এম, এস) উক্ত প্রদর্শনীতে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪১ খৃঃ রামকৃষ্ণ মেডিকেল মিশনের ভগিনী সরস্বতী 'মাতৃত্ব' সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা ও ডাঃ এম, মৈত্র ছায়াচিত্র সাহায্যে সারগর্ভ শিক্ষা প্রদান করেন।

বিশেষ গৌরবের বিষয় যে এই প্রতিষ্ঠান কিছুদিনের জন্যে বাংলার খ্যাতনামা লৌহমানব শ্রীযুক্ত নিলমণি দাসকে তাঁদের অবৈতনিক শিক্ষকরূপে পাবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি গভর্ণমেন্ট রেজিষ্ট্রীভূক্ত হওয়ায় বাৎসরিক ৪০্ টাকা বৃত্তি লাভ করেন এবং তাঁদের পরিচালিত পাঠাগার বিভাগে পৌরসভা কর্তৃক মাসিক ৩্ টাকা হারে অনুদান প্রদত্ত হয়।

১৫/৬/৪১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন আজীবন শক্তি-মন্ত্রের পূজারী ভারত বিখ্যাত 'কুস্তিগীর' 'গোবর' বাবু।

ঠিক এক বৎসর পরে ১৯৩৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মিলন-মন্দির' জিমন্যাষ্টিক ক্লাব। সার্কাস ধরণের নানারকম খেলাধূলা আরম্ভ করেছিল এই ক্লাবের সভ্যেরা। কার্য নির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পি, এইচ, ডি, এফ, সি, এস (বার্লিন) আর সম্পাদক ছিলেন শ্রীজিতেন্দ্র নাথ পাল। সমিতির চিকিৎসক ও সহসভাপতি ছিলেন ডাঃ অনাদি নাথ লাহা। পরিচালক হিসাবে শ্রীশৈলেন লাহার নামও উল্লেখযোগ্য। প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীরাধিকানাথ মল্লিক।

এর পরের বৎসর ১৯৩৯ খৃঃ জন্ম হয় মোড়পুকুর ব্যায়াম সমিতির। স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি বীরাগ্রগণ্য ভক্ত চূড়ামণি মহাবীরজির পূজার প্রচলন করেন বর্ষে বর্ষে। উত্তরোত্তর নানারূপ ব্যায়াম প্রদর্শনীতে এই সমিতিও বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

মিলনচক্র জন্ম লাভ করে ১৯৫৭ সালে। সমিতির স্থায়ী কোন আস্তানা না থাকায় বহু স্থান পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫/৬৬ সালে শ্রীরাণী ঘাট লেনে গঙ্গাতীরে শ্রীরাধিকা-নাথ মল্লিক মহাশয় তাঁর নিজস্ব ঘর ও প্রশস্ত মাঠ ব্যবহারের জন্যে অনুমতি দেওয়ার সমিতি বিশেষ ভাবেই উপকৃত হয় এবং মল্লিক মহাশয়ের মহানুভবতার জন্যে কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন। সভাপতি ছিলেন ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র ঘটক ও সত্যেন মুখার্জী। খেলাধূলা ও শরীর চর্চা ছাড়াও ভলিবল, টেবিল-টেনিস, ও জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ সংযোজিত হয় এবং বিভিন্ন ব্যায়াম প্রদর্শনীতে সভ্যবৃন্দ বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। গোড়ার দিকে সম্পাদক ছিলেন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পর বলিষ্ঠ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত মিত্র। দীর্ঘ ১৫ বছর পরে ১৯৭২ সালে মিলনচক্র

বাঙ্গুর পার্কের মধ্যে 'লেনিন ময়দানের' পাশে একখণ্ড জমি সংগ্রহ ক'রে তাঁদের নিজস্ব ভবনের গোড়াপত্তন করেন। ২৩/১/৭২ তারিখে শিলান্যাস পর্ব সম্পন্ন করেন জেলা শাসক শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী মহাশয়, বহু বিশিষ্ট অতিথি বর্গের উপস্থিতিতে। মাত্র এক বৎসর পরে ২১/১/৭৩ ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কান্তি ঘোষ মহাশয় নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। এর মূলে ছিল কর্মীবৃন্দের প্রশংসনীয় উদ্যম ও কর্মকুশলতা (যুগান্তর ২৯/১/৭৩)। জমিখরিদ এবং গৃহ-নির্মাণ কল্পে শ্রীএন, জি বাঙ্গুর ও পৌরসভা প্রদত্ত ৫০০০্ টাকা হারে অর্থ সাহায্যের কথা উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য চর্চা প্রসঙ্গে রিষড়ার আরও অনেকেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :— সর্বশ্রী মধুসূদন দে, শ্রীভূষণ পণ্ডিত, সুতেজ সাত্বিক, হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জয় করেছেন এবং সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জ জয় করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ মিলন চক্রের ১৯৭২ সালের স্মরণিকায় সুরেশ সাত্বিকের রচনা পাঠে এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় লাভ করবেন।

রিষড়া পোড়া মাঠের সৃষ্টি।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারী মধ্যাহ্নে রিষড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্মুখে জি, টি, রোড ও কালীকুমার দে লেনের সন্ধিস্থলে অবস্থিত মাদ্রাজী বস্তিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে উক্ত বস্তিটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। লেলিহান অগ্নিশিখা জি, টি, রোডের পূর্বদিকে অবস্থিত গৃহাদিকেও আক্রমণ করতে ছাড়েনি। হেষ্টিংস মিলের কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ফলে বহুক্ষণ পরে অগ্নিনির্বাপিত হয় সত্য কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ ছিল

অপূরনীয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে হেষ্টিংস মিলের ম্যানেজার মিঃ ব্ল্যাকের সঙ্গে রিষড়ার বেশিষ্ট সমাজসেবী ৺নিতাই চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে চাঞ্চল্যকর মোকর্দমায় সৃষ্টি হয় তার ফলাফল এতদঞ্চলে সুবিদিত। বলা বাহুল্য নিতাই চন্দ্র অন্যায়ের প্রতিবাদে সর্বদা মুখর হয়ে উঠতেন; কি সামাজিক কি রেলবিভাগের ত্রুটি তিনি কিছুই নীরবে সহ্য করতে পারতেন না। ইংরাজী ভাষাতেও ছিল তাঁর বিশেষ অধিকার।

উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট বস্তি হেষ্টিংস মিল কর্তৃক স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে দগ্ধ ও পরিত্যক্ত ভূমিখণ্ডটি কালক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ৪/৯/২১ তারিখে রিষড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহক সমিতি এই বস্তির পার্শ্ববর্তী জমিটি খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব কাযকারী হয়নি। প্রথম দিকে পোড়া কয়লার কাঁকর থাকায় ঘাস গজাতে বহু সময় লেগেছিল কিন্তু খেলোয়াড়দের ধৈর্য ধরার অবসর ছিল না। কাঁকরে পা কেটেছে, হাঁটু ছড়েছে কিন্তু ফুটবল খেলা বন্ধ ছিল না। পরবর্তীকালে কত নামজাদা খেলোয়াড় এই পোড়ামাঠে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। সে সব খেলার আকর্ষণ ছিল সার্বজনীন। খেলাধূলা ছাড়াও উক্ত মাঠটি যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের আরামপ্রদ সান্ধ্য ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। শুধু কি তাই? এই মাঠেই স্থাপিত হয়েছিল গোরা সৈনিকদের অস্থায়ী তাঁবু, সার্কাসদলের সিংহ, ব্যাঘ্রের গর্জনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল আশ পাশের গোশালার গৃহপালিত জীবজন্তু। জি, টি, রোডের ধারে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হবার উপযোগী এমন সুন্দর জায়গা আর দ্বিতীয় ছিল না। এই খেলার মাঠের একটি সুন্দর ঐতিহাসিক আলোকচিত্র আছে সর্বজন পরিচিত প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার শ্রীহরিধন দত্তের বাড়ীতে। (ষ্টুডিও আইকন)। ১৯৫৮ সালে এই পোড়া মাঠে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়

ভবন নির্মিত হওয়ার ফলে সাধারণ ফুটবল ক্লাবগুলির যে অসুবিধার, সৃষ্টি হয় তা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

রিষড়া রোয়িং ক্লাব।

সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর কাল হেষ্টিংস মিলের কর্মজীবন (প্রথম ড্রাফ্‌টসম্যান, পরে হেডক্লার্ক) অতিবাহিত হবার পর ২০/৯/২১ তারিখে কর্মযোগী পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের জীবনাবসানের অব্যবহিত পরে প্রধানতঃ দাঁ বংশীয় যুবকগণের প্রচেষ্টায় 'রিষড়া রোয়িং ক্লাবের' প্রতিষ্ঠা হয়। যে 'বাচ পানসি' বা 'ছিপের' সাহায্যে একদিন জলদস্যুরা নদীবক্ষে তড়িৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে জলযানে ভ্রমণ-কারীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিমেষে অন্তর্হিত হত, সেই 'বাচপানসি' এই সময় দেখা দেয় নির্দোষ ব্যায়াম বা শরীর চর্চ্চার মাধ্যম হিসাবে। ছয় দাঁড়ের এই সরু লম্বাকৃতি জলযানে স্থানীয় কত যুবক ও তরুণের দল পালাক্রমে ঘড়ি ধরে গঙ্গা পারাপার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শিক্ষক ও পরিচালক হিসাবে যাঁর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ৺যতীন্দ্রনাথ চন্দ্র। তিনি থাকতেন 'হালে' আর 'গলুই' বা একের দাঁড়ে থাকতেন সাধারণতঃ ৺সত্যচরণ পাল। প্রকৃত স্পোর্টসম্যান বলতে যা বোঝায় চন্দ্র মশাই ছিলেন এক কথায় তাই। কি অশ্বারোহণে, কি খেলাধূলায়, কি বাচ-পানসি প্রতিযোগিতায় সর্বত্রই ছিল তাঁর সমান পারদর্শিতা। কোনও স্কুল বা বিদ্যায়তনের শিক্ষক না হয়েও তিনি আজীবন 'যতীন মাষ্টার' নামে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত দূর পাল্লার বাইচ্‌ প্রতিযোগিতায় উক্ত ক্লাবের শীর্ষস্থান অধিকারের মূলে ছিল তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। বহু প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিলেন ক্লাবের সভ্যেরা। রিষড়ার ললাটে আর কোনও দিন সে গৌরবটীকা অঙ্কিত হবে কিনা সন্দেহ। উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে আজ অনেকেই লোকান্তরিত। সেইসব সভ্যদের

মধ্যে ছিলেন ৺ভবেশ চন্দ্র পাল, নিধুভূষণ নাগ, রেবতী মোহন দাঁ, প্রসন্ন কুমার দাঁ, দুলাল লাল চন্দ্র এবং সর্বশ্রী রাসবিহারী দাঁ ও রবীন্দ্রনাথ দাঁ প্রভৃতি। (মিলনচক্র স্মরণিকা—১৯৬৬)

॥সন্তরণ প্রতিযোগিতা॥

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রিষড়া রোয়িং ক্লাবের পরিচালনায় ৺পূর্ণচন্দ্র দাঁ স্মৃতি রক্ষা কল্পে খড়দহ থেকে রিষড়া দাঁ ঘাট পর্যন্ত ভাগীরথী পার হওয়া মূলক একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতা প্রচলিত হয়েছিল। যতদূর জানা যায়, প্রায় ছয় বৎসরকাল এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রিষড়া হেষ্টিংস মিলের তদানীন্তন হেডক্লার্ক শ্রীপান্নালাল দে ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক। ১৯২৯ খৃঃ ৺হেমচন্দ্র দাঁর বহির্বাটীতে যে পুরস্কার বিতরণী সভাধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক শ্রীকে, জি, মরসেদ। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে রিষড়ার নাম তখন কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে সুপরিচিত হবার সুযোগ ঘটে। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী হিসাবে রিষড়ার স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বাগের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"গঙ্গা বক্ষে দীর্ঘপথ সন্তরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশান্তি পাল (বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৭২) লিখেছেন—"এই প্রতিযোগিতা তিন বৎসর চালু ছিল এবং ১৯২৩ খৃঃ, প্রফুল্ল কুমার, ১৯২৪ খৃঃ দোয়ারকা দাস মূলজী ও ১৯২৫ খৃঃ বীরেন্দ্র নাথ দে যথাক্রমে বিজয়ী হন।"

সন্তরণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রিষড়ার শ্রীললিত মোহন হড়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯২৬ খৃঃ খড়দহ হইতে আহারীটোলা পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। এই প্রতিযোগিতায় তিনি পুরস্কার বিজয়ী হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় লাঠি লেখাতেও তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রখ্যাত সাঁতারু শ্রীমোহিত

দের নামই ত্তিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে পৃঃ ৪০০। স্বনামখ্যাত সাঁতারু হিসাবে শ্রীনিমাইদাসের নামও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ থেকে বহু সন্তরণ প্রতিযোগিতায়অংশ গ্রহণ করে এযাবৎ রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ভারতের প্রতি-নিধি হিসাবে তিনি সিলন, টোকিও প্রভৃতি বিদেশী দলের বিপক্ষেও অংশ গ্রহণ করেন। (মিলন চক্র স্মরণিকা-১৯৭২)

জলপথে মুর্শিদাবাদ।

১৯/১০/২৬ তারিখে উক্ত রোয়িং ক্লাবের সভ্য সর্বশ্রী অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত মোহন হড়, উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ৺সুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী, গৌর মোহন দত্ত, প্রসন্ন কুমার দাঁ এবং রামদেও মাঝি নিজেরা দাঁড় টেনে বাচ্‌পানসির সাহায্যে সুদীর্ঘ ২৫০ মাইল জলপথে মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং প্রায় এক মাস পরে ৭/১১/২৬ তারিখে পুনরায় দাঁড় টেমে রিষড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই অভিনব ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁরা যে উদ্যম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং দলগত একতা প্রদর্শন করেন তা সত্যই প্রসংশনীয়।

পদব্রজে তীর্থযাত্রা

মানুষের ভ্রমণের নেশা বিচিত্র। একবার যিনি এপথে নেমেছেন পথ যেন বারে বারেই তাঁকে টেনে আনেন পথের মাঝে। তাই বিংশ শতাব্দীতে রেলে ভ্রমণের সুবিধা থাকলেও নিম্নোক্ত অভিযাত্রী দল বারবার পায়ে হেঁটে বহু ক্লেশ স্বীকার করে ঘুরে এসেছেন বহু তীর্থে। এঁদের পরিচালক হলেন প্রৌঢ় শ্রীঅভয় পদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী সে কালের ইতিবৃত্তকে স্মরণ করিয়ে দেয় (পৃঃ ১১১)। ভ্রমণ সূচীর তালিকা হল নিম্নরূপ :—

(১) ১৯৬৫ সালে ১১ দিনে ২৫০ মাইল হেঁটে দেওঘর (বৈদ্যনাথ ধাম)।

(২) ১৯৬৬ সালে ১৭ দিনে ৩৫০ মাইল অতিক্রম করে পুরীধাম।

(৩) ১৯৬৮ খৃঃ ৩ দিনে ৬৮ মাইল পদব্রজে নবদ্বীপ ধাম।

(৪) ১৯৬৯ খৃঃ ২১ দিনে ৪২৫ মাইল অতিক্রম করে কাশীধামে পৌঁছেছিলেন।

তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী নীরোদ বরণ চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল কুমার দাস (বাবু দা) এবং সৌরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথমবারে যেমন প্রফুল্ল কুমার ছিলেন না তেমনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ অভিযানে অনিবার্য কারণে শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ও যোগদান করতে পারেননি। বারাণসী ধাম থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গৃহীত আলোকচিত্র গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য। পরিচালক অভয় পদ চট্টোপাধ্যায় (নবু দা) ২৫/৩০ মাইল পথ একাই হেঁটে গিয়েছেন নিকটবর্ত্তী প্রায় প্রত্যেকটি তীর্থ স্থানে।

বয়েজ স্কাউট।

১৯২৪/২৫ খৃঃ রিষড়া বয়েজ স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। পরিচালনায় ছিলেম ৺রেবতী মোহন দাঁ, প্রসন্ন কুমার দাঁ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদল, নানা প্রকার ড্রিল, সিগন্যালিং, সংবাদ দিলে করা, ফার্ষ্টএড প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। উল্লেখযোগ্য শিবির স্থাপিত হয়েছিল আসানসোলের নিকটবর্ত্তী একটি বিদ্যালয়ে। এই প্রসঙ্গে স্কাউট দলের অনেকেই কোল-মাইন দেখার সুযোগ লাভ করে। ২২/১/২৮ তারিখে স্বর্গীয় হরিকুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এর সভাপতিত্বে বয়েজ স্কাউট ট্রুপের র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ।

১৯২৪ সালে তারকেশ্বর মোহান্তের অনাচারের প্রতিরোধকল্পে স্বামী সত্যানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন তাতে অংশ গ্রহণ করায় শ্রীললিত মোহন গড় কারারুদ্ধ হন। অন্যান্য অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায় ও সত্যচরণ বন্দোপাধ্যায়।

৺একককড়ি বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সত্যাগ্রাহীদের জন্যে চাউল ও বস্ত্রাদি সংগ্রহকারীদের কণ্ঠে গীত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটির কথা অনেকেরই স্মরণে আছে:— "ভিক্ষা দাওগো, ভিক্ষা দাওগো, এসেছি ভিক্ষা করিয়া সার, তারকেশ্বর ভেসেছে পাপেতে, করিছে সবে হাহাকার॥" ইত্যাদি।

থিয়োসোফিকাল সোসাইটী।

রিষড়ায় একদিকে যখন কলকারখানা স্থাপন ও সাংস্কৃতির উন্নয়ন ব্যবস্থার সমাবেশ ঘটছিল, সেই সময় অন্যদিকে কয়েকজন তরুণ ও যুবক কলকাতা থিয়োসোফিকাল সোসাইটীর অনুকরণে এখানে একটি শাখা সমিতি গঠন করেন আনুমানিক ১৯০৮/৯ সালে। এই সমিতির সভ্যদের মধ্যে ছিলেন লোকান্তরিত ক্ষেত্রমোহন সেন, হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিনোদ পণ্ডিত, শিবচন্দ্র আশ, গোষ্ঠ বিহারী মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে দু'একজন যোগ সাধনায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন বলে জানা যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় স্বর্গীয় হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন তার প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মুখকান্তিতে এবং সারা অঙ্গে।

কৈলাস চন্দ্র লাহা ঘাটের উত্তর দিকের ঘরটিতে এই সমিতির

নৈমিত্তিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। ১৯২৩ সালের ২৪ শে জুন রিষড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে এই সমিতির একটি ধর্মসভাধিবেশন হয়।

১৯১৪ খৃ: এ্যাডেয়ারে (মাদ্রাজ) অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কনফারেন্সে ৺শিবচন্দ্র আশ প্রতিনিধিত্ব করেন।

"The Theosophical Society of Rishra was then the nucleus of a religious cultural brotherhood. It was based on the ideals of Dr. Annie Besant and looked for guidance to that School of religions thought of Adyer, Madras."

(Advocate. B. N. Ash, Municipal Golden Jubilee Publication).

৺শিবচন্দ্র আশ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ শর্টহ্যাণ্ড লেকচারার। তাঁর ইউরোপীয় বেশভূষার পারিপাট্য ছিল সে যুগে একটা দর্শনীয় বস্তু। কলকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে 'সেভেন ওকস্' শর্টহ্যাণ্ড কলেজের তিনি ছিলেন লেকচারার এবং প্রধান শিক্ষক। তাঁর জীবিত ছাত্রদের মধ্যে আজ অনেকেই অশীতিপর বৃদ্ধ।

এই সময় গুপ্ত বংশের পূর্বোক্ত আশুতোষ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র ৺কালীপদ গুপ্ত (শ্রীঅনিল কুমার গুপ্তের পিতা) Calcutta City Telegraph and Commercial College স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। রিষড়ার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ৺দুর্গা প্রসন্ন ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য। রিষড়ার আরও দু'একজন এই কলেজের ছাত্র ও কর্মচারী শিক্ষক হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

তৃতীয় জুটমিল।

১৯২০ সালে 'বেঞ্জামিন জুটমিলস্ কোং' রিষড়ায় নূতন জুটমিল

স্থাপন উদ্দেশ্যে বাগ খালের উত্তর প্রান্ত থেকে বাগদি পাড়া লেনের সীমানা বরাবর বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ক্রয় করেন। এর ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পান চাষের বরজগুলি। উঁচু নীচু জমি সমতল করে এবং পুকুর ডোবা ভর্তি করে কারখানা নির্মান করতে বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। এতদুপলক্ষে বহু অবাঙালী শ্রমিক টাট্টু ঘোড়ার সাহায্যে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। ১৯২৪ সালে উক্ত শিল্প সংস্থার এজেন্ট হিসাবে ম্যাকলিওড কোম্পানীর অধীনে প্রেসিডেন্সি জুট মিল কার্য আরম্ভ করে। রিষড়ার স্থানীয় অধিবাসীদের কতকাংশের চাকুরীর সংস্থান হলেও বহিরাগত বহু সংখ্যক শ্রমিকদের চাপে নিত্য নূতন সমস্যা দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চটকলটি চালু থাকার পর ক্রমাগত ব্যবসায়িক লোকসানের ফলে উক্ত সালের জুলাই মাস থেকে কার্য বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী কর্মচ্যুত হন, যার ফলে নিকটবর্ত্তী কয়েকটি চালু দোকান ও অন্যান্য বিপণী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই মিলের জমির উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশে পরপর আরো দুইটি প্রসিদ্ধ শিল্প সংস্থা গড়ে উঠেছে। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় কংগ্রেসের শাখা স্থাপন

১৯২৮ সালে রিষড়ার কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হয়। প্রথম সভাপতি ছিলেন ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পি, এইচ, ডি। সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন শ্রী ললিত মোহন হড়। বলা বাহুল্য ইতি পূর্বে শ্রীরামপুর কংগ্রেসের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিলেন স্থানীয় সভ্যরা। শোনা যায় উক্ত সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র শ্রীরামপুরে ভাষণ দানের পর রিষড়ার প্রতিনিধি বর্গের আহ্বানে রিষড়া কংগ্রেস কার্য্যালয় পরিদর্শন করেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে শ্রীললিত মোহন হড় বিভিন্ন সূত্রে বারে বারে কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে ১৯৭২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'তাম্রপত্র' লাভ করেন।

(আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

বাস সার্ভিস।

১৯২৮ সালে শ্রীরামপুর-বালিখাল বাস এ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা হয়। রেলপথে ও জলপথে যাতায়াতের সুবিধা থাকা সত্বেও অল্প ভাড়ায় পরিপূরক পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে এই বাস সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব পৌরসভা কর্তৃক ১১-২-২৭ তারিখের সভায় সমর্থিত হয়। এই সময় অবশ্য জি, টি, রোড, পিচ ঢাকা ছিল না। পর বৎসর যান-বাহন চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তায় পিচ দেওয়া হয়। শ্রীরামপুর থেকে বালিখাল পর্যন্ত (৩নং রুট) মাহেশের স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরিচালিত 'অনাথবন্ধু' নামক বাসটি প্রথম চলাচল আরম্ভ করে। তারপর আরও কয়েকখানা নূতন নূতন বাস এই রুটে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়, তার মধ্যে রিষড়ার ৺সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'সাবিত্রী' নামক বাস ছিল অন্যতম। সেই সময় রিষড়া থেকে শ্রীরামপুর ষ্টেসন পর্যন্ত ভাড়া ছিল ছয় পয়সা, পরে দু'আনা ধার্য হয়। রিষড়ায় উক্ত এ্যাসোসিয়েসনের অফিস ও বাঁশতলা বাস ষ্ট্যাণ্ড স্থাপিত হয় ৺জহর লাল সাধুখাঁর ভাড়াবাড়ীতে।

১৯৬৩ সালে ৩নং রুট 'ডানলপ ব্রীজ' (বি, টি, রোড) পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় যাত্রী সাধারণের বিশেষ সুবিধা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ডাঃ গোপাল দাস নাগ এই সম্প্রসারিত বাস সার্ভিসের সুদূর প্রসারী জন কল্যাণমূলক অবদানের কথা উল্লেখ করেন। [শ্রীরামপুর সমাচার, ২৭/৯/৬৩]

১৯৬৮ সালে এই বাস রুট পুনরায় শ্যামবাজার খালধার পর্যন্ত

সম্প্রসারিত হওয়ায় কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

॥ বিংশ শতাব্দীর শতায়ুঃ ॥

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আনুঃ ১৮৯৬ খৃঃ পূর্বোক্ত রায় সাহেব ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় [পৃঃ ৩৩৬] ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর ভ্রাতা ও রিষড়া নিবাসী দুই ভাগিনেয় স্বর্গীয় হরিদাস ও কৃষ্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তেজ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র) প্রাপ্ত হন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এ যুগের দীর্ঘায়ু ও কর্মঠ ব্যাক্তি। দীর্ঘকাল সরকারী পেনসেন ভোগ করার পর ১৬/৯/৫৮ তারিখে প্রায় ৯৯ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত পদব্রজে তিনি শ্রীরামপুর মহকুমা অফিস থেকে তাঁর পেনসেনের টাকা নিয়ে আসতেন। বাসে যাতায়াত করা তিনি বড় একটা পছন্দ করতেন না।

শতবর্ষ অতিক্রম করলেও রিষড়ার একজন মহিলা আজও দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হলেও উত্থান শক্তি হীন হন নি। তিনি হলেন কালী-তলার নিকটবর্তী শ্রীপ্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতি নিভাননী দেবী।

॥ রিষড়া খড়দহ ফেরি সার্ভিস ।

১৮৮৫ খৃঃ 'বেঙ্গল ফেরি এ্যাক্ট' চালু হবার পর থেকে উক্ত প্রাচীন ফেরি ঘাট সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯২৮ খৃঃ সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উক্ত ফেরি সার্ভিসের পরিচালন ভার পৌর সভার উপর ন্যস্ত হয়। এই পারঘাটের ইজারা প্রদত্ত আয়ের

৩/৪ অংশ রিষড়া-কোন্নগর পৌর সভা ও ১/৪ অংশ খড়দহ পৌর-সভাকে প্রদানের ব্যবস্থা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে খড়দহের প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন রাস মেলা উপলক্ষে বহু যাত্রী এই ঘাটে পারাপার করে থাকেন। ফেরি সার্ভিস থেকে কিছু আয়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্বিঘ্নে যাত্রী পারাপার করার দায়িত্বও অপ্রত্যক্ষ ভাবে পৌর সভায় উপর অর্পিত হয়। ঝড় তুফানে ও প্রবল বানের মুখে পড়ে কখনও কখনও যাত্রীবাহী নৌকা ডুবির সংবাদ একেবারে নগণ্য নয়। ১৩৭৩ সালের ১৬ই চৈত্র তারিখের যুগান্তরে এই ধরণের একটি বিপত্তির সংবাদ প্রকাশিত হয়। সুখের বিষয়, ১৩ জন ডুবন্ত যাত্রীদের সকলকেই উদ্ধার করা হয়, কারও জীবনহানি ঘটে নি। পুলিশ নৌকার মাঝি দু জনকে গ্রেপ্তার করে।

॥ অলৌকিক কাহিনী ॥

সাগর সঙ্গমে পুণ্য তীর্থ স্নানের পর আশ্রমে ফেরার পথে সাধু মহাত্মাদের মধ্যে অনেকে রিষড়ায় বিশ্রামার্থে থেকে যেতেন দু'চারদিন। ইং ১৯২১/২২ সালে এই সাধুদের মধ্যে ছিলেন এক ভীমকায় কঠোরী সন্ন্যাসী, বেদান্ত সিদ্ধির এক মূর্ত্ত বিগ্রহ। তিনি আসন বিছিয়ে ছিলেন বর্ত্তমান বিদ্যাপীঠের সংলগ্ন স্বর্গীয় মটুক ধারী লালের বাগান জমিতে। সৌভাগ্যক্রমে লালজী দর্শন পেয়ে যান সেই দিব্যকান্তি, শিবকল্প মহাপুরুষের। দর্শন মাত্রেই তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন সেই মহাত্মার প্রতি, কত সাধ্য সাধনা করলেন নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার কিন্তু ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে যেতে তিনি সম্মত হন নি। ভক্তরা এই সাধুকে বলতেন 'নাঙ্গা বাবা' আর শিষ্যবর্গ বলতেন শ্রীমৎ যোগেশ্বর দিগম্বর পরমহংসজী।

তিনি লালজী এবং তাঁর পুত্র রাধারমণজীর সেবা পরিচর্যার গুণে রিষড়ায় কিছুদিন থেকে যান (প্রায় ১৯২৬ খৃঃ)। এইখানে থাকা-

কালীন এক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে নাঙ্গা বাবার যোগ বিভূতির ঐশ্বর্য একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

একদিন ভোরে ভক্ত লালজী বাবাকে দর্শনের জন্যে চলেছেন বাগিচা অভিমুখে। জঙ্গল ঘেরা চলার পথে হঠাৎ পা পড়ে যায় এক গোখ্‌রা সাপের লেজের উপরে। ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প প্রাণঘাতী ছোবল দেয় লালজীর পায়ে। তিনি কিন্তু এই সংকট মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। টলতে টলতে দু'বাহু তুলে 'বাবা-বাবা' বলতে বলতে পৌঁছে যান নাঙ্গা বাবার চরণতলে। সারা দেহ তখন বিষ-ক্রিয়ায় নীলবর্ণ, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। বাবার আসন আর ভূলুণ্ঠিত লালজীর দেহ ঘিরে তখন প্রচণ্ড ভীড় জমে গিয়েছে। বাবার মুখে তখন কোন শব্দ নেই, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ভক্তের দিকে।

কয়েক মিনিট এইভাবে কেটে যাবার পর নাঙ্গাবাবা তাঁর কমণ্ডলু থেকে পবিত্রবারি লালজীর চোখে মুখে ছিটিয়ে দেন। দেখতে দেখতে মৃতকল্প মানুষটির দেহে দেখা দেয় জীবনের লক্ষণ। দেহের বর্ণ ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠে। জ্ঞান চৈতন্য ফিরে পেয়ে লালজী বাবার চরণ ধরে অস্ফুট ধ্বনিতে স্তুতি করতে থাকেন। দুচোখ ভোরে ঝরতে থাকে অবিরল অশ্রুধারা। এই অত্যাশ্চর্য্য আনন্দময় দৃশ্যে পুলকিত চিত্ত সমবেত জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে নাঙ্গাবাবার জয়ধ্বনি।

রিষড়ায় থাকা কালে অন্যান্য অঞ্চলের কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান ভক্ত নাঙ্গাবাবার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উত্তরপাড়ার প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। 'যোগদা আশ্রমের' একজন আমেরিকান সাধুও এসেছিলেন নাঙ্গাবাবার আস্তানায়।

(ভারতের সাধক, ৭ম খণ্ড— শঙ্কর নাথ রায়)।

হঠাৎ একদিন প্রত্যুষে উঠে ভক্তেরা দেখেন যে বাবা তাঁর

আস্তানা ফেলে রেখে কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। এরপর দীর্ঘদিন কেটে যায়, শেষ পর্যন্ত তিনি স্থায়ী আসন পাতেন পুরীর সমুদ্র সৈকতে গির্ণারীবাস্তায়। রিষড়া পৌরসভার প্রাক্তন উপপ্রধান রাধারমণ লালজী পুনরায় মিলিত হন ১৯৫০ সালে. সেই আশ্রমে এবং তাঁর উপদেশ ও গ্রন্থাদি পাঠে যে অনুভূতি লাভ করেন তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন ১৯৫৬ সালে তাঁর রচিত 'বেদান্তবোধ' নামক পুস্তকে।

আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

১৯২১ সাল থেকে গান্ধীজীকে কেন্দ্র ক'রে বহু আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার ঢেউ এসে লেগেছে রিষড়ার বুকে কখনও মৃদুভাবে কখনও বা প্রচণ্ড বেগে। গান্ধীজির কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েছে আপামর জন সাধারণ। ১৯২৪ খৃঃ তাঁর কারামুক্তির ফলে দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে পৌর সদস্যবৃন্দও সেই শুভ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারেন নি। তাঁর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন। জাতীর-জনক হিসাবে তিনি ছিলেন তখন সর্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত।

১৯৩০ খৃঃ ৫ই মে গান্ধীজী পুনরায় কারারুদ্ধ হন। তার প্রতিবাদে ৬ই মে মঙ্গলবার সারা ভারতবর্ষে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্বে Press Act জারি ক'রে প্রত্যেক সংবাদ পত্রের সম্পাদককে দু'হাজার টাকা জামিন স্বরূপ জমা দিতে বলা হয়। তার প্রতিবাদে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলকাতায় তখন বুলেটিন মারফৎ দৈনিক বিশিষ্ট সংবাদগুলো মাত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ৬ই মে রিষড়ার কয়েকজন যুবক উক্ত বুলেটিনে প্রকাশিত বারটি সংবাদ হাতে লিখে জি, টি, রোডের

উপর প্রচার করায় তিন জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন সর্বশ্রী কেদার নাথ হালদার, কানাই লাল পাল এবং জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেন (মোড়পুকুর)। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন অল্প-কালের জন্যে কারারুদ্ধ হন।

মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করার জন্যে পরে গ্রেপ্তার হন ৺আশুতোষ ভট্টাচার্য, কাশীনাথ হড় (ভগুল) এবং সর্বশ্রী লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত মোহন হড়, নীরেশ চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং মতিলাল দে। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রী লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং নীরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছাড়া পেলেও অন্যান্যরা বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন কালের জন্যে কারারুদ্ধ হন। তখন মহকুমা শাসক ছিলেন শ্রীযুক্ত এম. কে, কিরপালনি। (শ্রীললিত মোহন হড়ের সৌজন্যে)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৮ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম, এস, সি পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার জন্যে ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন উৎসবে স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। গ্রামের এই মুখোজ্জ্বলকারী যুবকের ভবিষৎ কর্মজীবন যাতে বিঘ্নিত না হয় সে জন্যে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুকম্পা লাভ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি বি. সি. এস পরীক্ষা দেন কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় ফলে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট থাকায় তিনি মনোনীত হতে পারেন নি। ১৯৪৭ সালে তিনি স্বল্পকালের জন্যে রিষড়া পৌরসভার সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় শিক্ষায়তনগুলির সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে বিধান কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি এড, হক, কমিটির সম্পাদক-কাম-অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে রিষড়া বান্ধব সমিতি সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক থাকা কালীন তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন।

নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান।

১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রিষড়া ওড়িয়া সমাজ। শিল্পাঞ্চল প্রধান পৌর এলাকার মধ্যে চাকুরী সূত্রে সমাগত উড়িষ্যাবাসীদের একত্র মিলন এবং সাহিত্য চর্চ্চা ও নাট্যানুশীলনের সুযোগ ক'রে দেওয়ার জন্যে এই ধরণের সমিতি স্থাপন নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় শুভ প্রচেষ্টা। নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখে আত্মীয় স্বজন বর্জিত অবস্থায় দূর প্রবাসে চারিত্রিক সংযম রক্ষা ক'রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ ক'রে দোলযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন 'সং' ও শোভাযাত্রা বাহির ক'রে তাঁরা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই ওড়িয়া সমাজ একমাত্র স্বদেশবাসীর অর্থ সাহায্যে ১৯৫০ সাল থেকে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজানুষ্ঠান প্রচলিত রেখেছেন। এই সমাজের প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালে উৎকল কেশরী সেবাদল নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ১৯৫৩ সালে ইহারা দু'দিন ব্যাপী (১৮ই ও ১৯ শে এপ্রিল) পশ্চিমবঙ্গ উৎকল সম্মেলনের গুরু দাযিত্বভার গ্রহণ করেন। ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতব এম, পি, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলার শ্রম মন্ত্রী মাননীয় কালীপদ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত বাঙ্গুর এবং বসন্তমঞ্জরী রাণীমহোদয়া। ১৯৫৮ সালের ৫ই ও ৬ই জুলাই উক্ত সেবাদলের প্রযোজনায় রিষড়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উৎকল সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅশোক সেনের শুভাগমনে অনুষ্ঠানটি গৌরবান্বিত হয়। এই সেবাদলের পরিচালনায় শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে 'রামচন্দ্রের অকালবোধন' মূর্ত্তি পূজিত হয়ে আসছেন।

১৯৬২ সালে অষ্টগ্রহ মিলনের অশুভ ফল নিবারণ কল্পে এবং

দেশের শান্তি কামনায় রিষড়ার উৎকলবাসীদের ব্যবস্থাপনায় এক সপ্তাহ-ব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্তন ও গ্রহযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হয় ১৭/২/৬২ তারিখে।

অপরদিকে মুস্লিম অধিবাসীদের ধর্মীয় ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ পূর্বোক্ত বড় মসজিদ ছাড়াও অপর কয়েকটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ১৯১৭ সালে জহুর আলি কর্তৃক 'বিহুলি মসজিদ', পরবৎসর সেখ মহম্মদ ইব্রাহিম কর্তৃক এলাহাবাদি মসজিদ, নূর মহম্মদ মিয়ার উদ্যোগে ১৯২৭/২৮ খৃঃ মৌয়ালা মসজিদ এবং ১৯২২/২৩ খৃঃ ইব্রাহিম সর্দারের উদ্যোগে নির্মিত হয় বাগখাল লাইন মসজিদ। বর্তমানে মসজিদের সংখ্যা মোট সাতটি। এ ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে সমবেত প্রার্থনানুষ্ঠানের জন্যে গান্ধী সড়কে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইদগার'। এরই অনতিদূরে রয়েছে সুবিস্তৃত কবর-স্থান। শোনা যায় ১৯০৫ খৃঃ জেলা শাসক এই কবর স্থানের জমি বন্দোবস্ত ক'রে দেন। পরবর্তীকালে প্রাক্তন পৌরসদস্য ইউসুফ মিয়ার উদ্যোগে সংগৃহীত অর্থে কবর স্থানটি নাতি-উচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি বিভিন্ন আকৃতির সমাধি বেদী। ১৯৩৪ খৃঃ থেকে প্রাচীন বড় মসজিদের বর্তমান অলংকরণ ও গম্বুজাদি নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই মসজিদ থেকেই প্রত্যহ মাইকের সাহায্যে ইমামের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নমাজের পবিত্র প্রার্থনা স্তোত্র-গুলি। মহরম উপলক্ষে বিভিন্ন আকৃতির তাজিয়া সহ শোভাযাত্রার দৃশ্য ছিল এতাবদ্‌কাল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠান। জি, টি, রোডের উপর যানবাহন চলাচল স্থগিত রেখে সরকার কর্তৃক উক্ত অনুষ্ঠান পর্বে বরাবরই সহযোগিতা করা হত। দুঃখের বিষয় ১৯৬৯ খৃঃ এতদুপলক্ষে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে উভয় সম্প্রদায়ের শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত হবার উপক্রম হওয়ার উক্ত অনুষ্ঠানটি বর্জিত হয়। স্থাপত্য শিল্পে

মুস্লিম সংস্কৃতির অবদান এতদঞ্চলে সুপরিচিত। বর্ত্তমানে মুস্লিম স্থাপত্য রীতি এবং পাশ্চাত্য শিল্প সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন মোহারম, ইদ্-উল-ফেতর, ইদ্—মুবারক, বকর-ইদ্ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালনীয়. তেমনই রিষড়ার অবাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও কতকগুলি পূজা-পার্বণ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে. তাদের মধ্যে গণেশ পূজা, ছট পরব ও জিতিয়া পরব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছট্ সংস্কৃত ষট্ ও ষষ্ঠী শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ। চতুর্থী থেকেই পুর-মহিলাগণ নিয়মপালন ও ব্রত ধারণ ক'রে থাকেন এবং বিশেষ পূজানুষ্ঠান আয়োজিত হয় ষষ্ঠীর অপরাহ্ণ কালে। ভাগীরথী তীরে ব্রতধারিনীরা সমবেত হন বহু ফলমূলের ডালা এবং অন্যান্য পূজোপকরণ সাজিয়ে। পূজার অঙ্গ হিসাবে চলতে থাকে বাজা বাজনা। জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় প্রজ্জলিত দীপাবলী। প্রদীপ শিখার প্রতিবিম্ব নৃত্য করতে করতে স্রোতের টানে ভেসে যায় চঞ্চল নদীবক্ষে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। (বঙ্গীয় তিলি সমাজ মুখপত্র—পৌষ, ১৩৭৪)

মন্দিরে মন্দিরে।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৩১) বর্ত্তমান শ্রীমৎ ননীলাল চট্টো-পাধ্যায় লেনের সংযোগ স্থলে ৺অতুল চন্দ্র হড়ের উদ্যোগে (প্রাক্তন পৌর উপপ্রধান) ও অর্থ সাহায্যে কালুরায় ও দক্ষিণ রায়ের ছোট পূজা গৃহটি নির্মিত হয়। (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)। শোনা যায়, পূর্বে ঐ স্থানে ছোট ডোবার পার্শ্ববর্ত্তী ডুমুর গাছ তলায় উক্ত বিগ্রহগুলির পূজা হত তারপর ৺শৈল বিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। তারও পূর্বে এই শিলামূর্ত্তিগুলি নাকি ছিল মোড়পুকুরের বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের অধিকারে। এখন ঐগুলির পূজার্চ্চনা ক'রে থাকেন ৺শৈলবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীপাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়।

এই কালুরায় বা দক্ষিণ রায় বোধ হয় রামাই পণ্ডিত প্রবর্তিত ধর্মঠাকুর ব্যতীত অন্য কোনও দেবতা নন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকে ভোলানাথ ঘোষ মহাশয় ধর্মঠাকুরের যে সমস্ত নাম উল্লেখ করেছেন 'কালুরায়' তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে অতুল হড় মহাশয়ের পিতৃদেব ধর্মদাস হড় মহাশয় ছিলেন যেমন বলশালী তেমনই নির্ভিক। এতদঞ্চলে তিনি একজন অভিজ্ঞ যাজনিক ক্রিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর ভোজন পটুত্ব সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই কয়েকটি কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে।

১৫/৩/৩০ তারিখের সভায় পৌর সদস্যগণ তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কালিকুমার দে লেনের পশ্চিমাংশ (শীতলামাতার বাটী থেকে কালীতলা লেন পর্যন্ত) ধর্মদাস হড় লেন নামে নামাঙ্কিত করেন।

একথা বলা প্রয়োজন যে এই হড় বংশের পূজিত শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল রিষড়ার মধ্যে প্রথম ও সুপ্রাচীন। শোনা যায় তাঁদের যজমান শ্রীরামপুরের দে বংশের সহযোগিতায় এই পূজা তখন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত। ৺অপ্রকাশ চন্দ্র হড়ের আমল থেকে উক্ত পূজা পুনঃ প্রবর্তিত হয়েছে।

পূর্বোক্ত ৺কুমুদ নাথ হড় মহশয়ের পৌত্র শ্রীবেণীমাধব হড় বর্তমানে একজন বিচক্ষণ চক্ষু চিকিৎসক।

পরবর্তী কালে মোড়পুকুর অঞ্চলে যে তিনটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় মন্দির সংযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে তারা কুটীরে পার্থ-সারথি মন্দিরের কথা ৩৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। অপর দুটির মধ্যে কেশব চন্দ্র সেন রোডে রথাকৃতি সুউচ্চ নবচূড়া বিশিষ্ট গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে নির্মিত মন্দিরটি প্রভু পাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭ শে জানুয়ারী ১৯৬০ খৃ:। নিত্য নৈমিত্তিক পূজাপাঠ ছাড়াও বহু উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই মন্দিরে বহু বৈষ্ণব ভক্ত সমাগম হ'য়ে থাকে। (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয়টি হল ৺শ্রীশ চন্দ্র সাহা কর্তৃক নির্মিত (শ্রীশ্রী গোপাল জিউর মন্দির)। ১৭ই মাঘ ১৩৭৫ (ইং ১৯৬৯) তারিখে উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য সুসম্পন্ন হয়। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ বিগ্রহ এবং শ্রীশ্রীরাধা শ্যামসুন্দর যুগল বিগ্রহ অবস্থিত। (নির্মীয়মান কালে গৃহীত আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)। মন্দির সংলগ্ন সুবৃহৎ নাট মন্দিরে বহু সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ৫/৪/৭০ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি তর্পণ সভা তার মধ্যে অন্যতম।

১৩৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৯৬০) চারবাতির নিকটে শ্রীমাণিক চন্দ্র রায় কর্তৃক ৺শীতলা মাতার বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। শোনা যায়, তাহার বিধবা ভগিনী (৺তারিণী রায়ের কন্যা) ভরমুখে নিকটবর্তী বিল্ববৃক্ষ মূলে অবস্থিত ঘটমধ্যে শীতলা মাতার অবস্থিতির কথা প্রকাশ করে। তদনুযায়ী ঐ পূজা গৃহটি নির্মিত হয়।

হড় বংশীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৺শীতলা মাতার অধিষ্ঠান সুপ্রাচীন এবং এতদঞ্চলে সুবিদিত। হাম-বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে তিনি সর্বজন পূজিতা। পার্শ্ববর্তী রাস্তাটি শীতলাতলা লেন নামে অভিহিত। রিষড়ার উত্তর প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মধ্যে শ্রীক্ষেত্র মোহন ঘোষ কর্তৃক তাঁর স্বর্গতা পত্নী দুর্গাবালার স্মৃতি রক্ষা কল্পে নির্মিত শ্রীশ্রীকালীমন্দিরের উদ্বোধন হয় ১৩৬৪ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ।

নেতাজী সুভাষ রোডে অবস্থিত 'লক্ষ্মী-নারায়ণ-শিব-কালী' মন্দিরটিও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ১৯৭০ খৃঃ শ্রীহরিহর সিং প্রদত্ত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর পরিচালনায় বিগ্রহগুলির নিত্য পূজা ছাড়াও শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মোট কথা, রিষড়া শিল্প উপনগরী হিসাবে খ্যাত হলেও এখানে মন্দিরের সংখ্যা নগণ্য নয়, এবং প্রত্যেকটি মন্দিরের স্থাপত্য রীতি দর্শনীয় বস্তু।

প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত মন্দিরগুলির কথাও উল্লেখযোগ্য :-

বর্ত্তমান ৫নং যোধন সিং রোডে পূর্বোক্ত জগদম্বা পীঠ স্থানে (পৃঃ ৩৭৮) ইং ১৯১৬ সালে স্বর্গীয় রামকরণ সিং কর্ত্তৃক একটি মৃন্ময়ী কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৮খৃঃ ৺যোধন সিং কর্ত্তৃক ঐ স্থানে একটি পাকা মন্দির গৃহ নির্মিত হয়, এবং ৺খেতু সার ধর্মপত্নী ঐ স্থানে একটি প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭সালে শ্রীহরি কিষণ সিংয়ের উদ্যোগে উক্ত পূজা স্থানের সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে সর্বশ্রী হরিনন্দন সিং, যমুনারাম শর্মা, রণধীর সিং প্রভৃতি এগারজন সভ্য সম্বলিত একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠিত হয় এবং জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে ও ওয়েলিংটন জুটমিলের অর্থানুকূল্যে উক্ত মন্দির সুসংস্কৃত করা হয় ও পণ্ডিত সত্য দেও মিশ্র স্থায়ী পূজারী নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফুলচাঁদ সার অর্থানুকূল্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ঋত্বিকবৃন্দের সাহায্যে উক্ত মন্দিরে নব নির্মিত ৺কালী মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়।

২০।২।৫৯ তারিখে বাঙ্গুরপুর বন্দনা আশ্রমে ৺রজনীকান্তের কন্যা বন্দনাদেবী বর্ত্তমান শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তদীয়া গুরুদেব শ্রীমৎ শিবানন্দ সরস্বতী মন্দিরের সেবাইতরূপে এই পুন্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বাঙ্গুরপুর কলনীতে এই মন্দিরটিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

রেলওয়ে ৩নং গেটের সম্মুখে সূক্ষ্মাকৃতি উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে। মন্দির মধ্যে ভক্ত চূড়ামণি বীরাগ্রগন্য মহাবীরজীর পূর্নাবয়ব মূর্ত্তিটি একটি লক্ষণীয় শিল্পকৃতি। ১১/৩/৭১ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় এই মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

১৯৬৩ খৃঃ (১৩৭০/২১ শে ভাদ্র) মোড়পুকুর বকুল তলার নিকটবর্ত্তি ৺নন্দলাল ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রাকৃতি শিব মন্দিরটিও

উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। স্থানীয় অধিবাসী বৃন্দের আবেদনক্রমে মন্দির পার্শ্ববর্ত্তি রাস্তাটি পৌরসভা কর্তৃক 'শিবালয় পথ' নামে অভিহিত হয়।

চিত্র শিল্পে আধ্যাত্মিকতা

আনুমানিক ১৯২৬/২৭ খৃঃ ভট্টাচার্য বংশের ৺রামনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় কয়েক খানা আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করেন। তার মধ্যে 'ব্রহ্মময়ী' ও মানবধর্ম নামক চিত্র দু খানি বিশেষ ভাবে আদৃত হয়। ব্রহ্মময়ী নামক চিত্র খানির ভাব ব্যাখ্যা মূলক একখানি পুস্তিকাও প্রণীত হয়ে ছিল :— (ঐ দেখ সেই মাগীর খেলা। মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা)। বালিপাথরের জমান ছোট ছোট ইষ্টকাকৃতি শান পাথর এবং ভেজিটেবল স্লিপার (দড়ির চটি জুতা) প্রস্তুত করে তিনি কুটির শিল্পে একটা অভিনবত্ব আনয়ন করেন। স্থানিয় কল কারখানায় উক্ত শানপাথর গুলোর চাহিদাও ছিল।

আগন্তুক ডাক্তার

পূর্বোক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস রচিত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' নামক পুস্তকে (পৃ ৩৫৯) ৺হরিদাস গড় গড়ী মহাশয়ের নামোল্লেখ না থাকিলেও তিনি (৪৯৭—৫০৬) উক্ত পুস্তকে যার নাম উল্লেখ করেছেন তিনি যদিও রিষড়ার সন্তান নন কিন্তু তাঁর অবসর প্রাপ্ত জীবন রিষড়াতেই অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি হলেম ডাঃ নফর চন্দ্র দাস তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

গোয়ালিয়াবের পশ্চিমে এবং চম্বল নদীর দক্ষিণে স্থিত কোটা রাজ্যে কয়েক জন পুরাতন বাঙ্গালী আছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র দাস পূর্বে কোটায় ছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর হইল তিনি চিতোরে গিয়া বাস স্থাপন করেন। উদয়পুরে বাঙ্গালীর প্রবাস বাসের ইতিহাস বিস্তৃত না হইলেও তাহা অল্প গৌরবজনক নহে। ১৯০১ অব্দে চিতোর গড়ে একজন বাঙ্গালী ডক্তার কোটা হইতে বদলী হইয়া

আসেন, তাঁহার নাম বাবু নফর চন্দ্র দাস, তাঁহার নিবাস কলিকাতা ভবাণীপুর।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে তিনি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রিষড়ায় এসে স্থায়ী ভাবে বাস স্থাপন করেন এবং কিছুকাল চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত থাকার পর ১৯৫০ খৃ: ১৩ই জানুয়ারী মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর জেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দাস, বি, এস সি, বাংলার বাইরে একজন বিচক্ষণ সিনেমা ইঞ্জিনিয়ার রূপে বিখ্যাত। কলকাতা বেতার কেন্দ্র স্থাপনের অব্যবহিত পরে [তখন রিষড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হয়নি] তাঁর স্বহস্ত নির্মিত হেড ফোনে বেতার প্রচারিত গান ও সংবাদ শুনে অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেন।

বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন।

১৯৩১সালে ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেসন রিষড়া পৌর এলাকার অধিবাসীদের আবেদন ক্রমে গৃহে গৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে হরি পেদ্দার লেন ও জিটি রোডের সংযোগ স্থলে ৺অপ্রকাশ চন্দ্র হড়ের নিকট থেকে একখণ্ড জমি ক্রয় করে প্রথম পাওয়ার হাউস স্থাপন করেন [গৃহ শীর্ষে প্রতিষ্ঠা কাল দ্রষ্টব্য]। বলা বাহুল্য. বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা অনাস্বাদিত পূর্ব পুলকের সৃষ্টি হয় সবচেয়ে সুবিধা হয় ছাত্রবৃন্দের পাঠাভ্যাসর। ইতিমধ্যে পৌরসভাধীশ নরেন্দ্র কুমারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে রিষড়া কোন্নগর পৌর এলাকায় অবস্থিত রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোক বর্ত্তিকা স্থাপনের প্রকল্প পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে এবং ৩১।১।৩৭ তারিখে বর্দ্ধমান বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ও, এম, মার্টিন সাহেব পোড়ামাঠে অনুষ্ঠিত সভাধিবেশনে একটি বোতাম টিপে আলোকগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি মানপত্র। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ এই দীর্ঘ প্রতিক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে করদাতাগণ পেয়ে গেলেন একটা

-্গোপযোগী রমণীয়তার আস্বাদ। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে গৃহে গৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচলন, তার সঙ্গে দেখা দেয় রেডিও সেট্। বিদায় নেয় টানা-পাখা, প্রদীপ, হ্যারিকেন, শেষ হয়ে যায় পাংখা পুলারের চাকুরী- জীবন।

৪।৬।৩২ তারিখে নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি—এল প্রথম পৌর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং উপ-পৌরপ্রধান হন ৺অতুল চন্দ্র হড়। নরেন্দ্র কুমারের পৌরসভার কর্ণধার হিসাবে নির্বাচন যে সুদূর প্রসারী উন্নতি মুলক কর্মধারা রূপায়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল উপরোক্ত ঘটনাটি তারই প্রথম ও প্রধান স্মারক চিহ্ন স্বরূপ।

১৯২৯ সাল থেকে নরেন্দ্র কুমার পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ফলে পুর্বোক্ত করদাতা সমিতি (পৃঃ ৪৫৬) নূতন করে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তদনুযায়ী ১৯৩৪ খৃঃ (১৭ই ফাল্গুন ১৩৪০) একটি নূতন করদাতা সমিতি গঠিত হয় এবং ১৯৩৫ সালের ২৮ আগষ্ট রেজেষ্ট্রি কৃত হয়। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস,সি সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ আশ, বি, এল সহসম্পাদক নির্বাচিত হন।

প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প

১৯৩৪খৃ ১৫ই জানুয়ারী পশ্চিমাঞ্চলে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প দেখা দেয় তার ফলে রিষড়ায় গৃহাদির বিশেষ কোনও ক্ষতি না হলেও পুরাতন বাড়ীর দেওয়ালে স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দেয়। প্রায় ৫ মিনিট কাল এই ভূকম্পন অনুভূত হয়। উক্ত ভূমিকম্পে রিষড়ার যে জনপ্রিয় অমূল্য জীবনটি নষ্ট হয় পাটনাতে তিনি হলেন ৺ভবেশ চন্দ্র পাল। (পীণ্টু নামে সমধিক পরিচিত) ১৭।২।১৯৩৪ তারিখের সভায় পৌরসদস্যাবৃন্দ ভূমিকম্প প্রপীড়িত বিহার বাসীদের ত্রাণ করে ১০০ টাকা ভাইসরয় ফাণ্ডে প্রদান করেন।

অবিরাম সাইকেল চালনা।

১৯৩৩ ও ১৯৩৪খৃঃ কয়েক জন যুবক রিষড়ার কয়েকটি রাস্তা দিবারাত্র অবিরাম সাইকেলারোহণে পরিক্রমা করে যে সহনশীলতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয় তা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। প্রথম বৎসর শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (হেলু) ৫৪ ঘণ্টা এবং পরবৎসর শ্রী বীরেন্দ্র নাথ দাঁ ৬৪ ঘণ্টা একাদিক্রমে সাইকেল চালনা করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন এবং বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। বহু স্বেচ্ছাসেবক এই কার্যে সহায়তা দান করেন। ১০।১২।৩৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিক্রমায় অংশ গ্রহণকারিদের মধ্যে শ্রীতারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির একটি আলোকচিত্র গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য।

দূরপাল্লার সাইকেল ভ্রমণ।

১৯৩৪ সালে চারজন যুবক সাইকেলে ঘুরে আসেন বেনারস বা কাশীধাম দর্শন করে। এইদলে ছিলেন রিষড়ার সর্বশ্রী বিজয় ভূষণ হড়, বিজয় কিশোর গড়গড়ী এবং হরিভূষণ দাঁ, (মানিক) সঙ্গে ছিলেন মাহেশের শ্রীকানাই গঙ্গোপাধ্যায়।

দূর পাল্লায় সাইকেল ভ্রমণ সূচী ছিল নিম্নরূপ।
বলা বাহুল্য সাইকেল ভ্রমণের নেশা যাঁদের পেয়ে বসেছিল তাঁরা প্রায় প্রতিবৎসর বেরিয়ে পড়তেন বড় দিনের ছুটিতে-পথের ক্লেশ, আহারের স্বল্পতা এবং বাসস্থানের অনিশ্চয়তাকে মাথায় নিয়ে।

তারিখ	গন্তব্যস্থান	অংশগ্রহণকারী
ডিসেম্বর-১৯৩০	ডায়মণ্ড হারবার	সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর কুমার মণ্ডল, প্রশান্ত কুমার দাঁ, হেমন্ত কুমার গড়গড়ী ও মতিলাল দে।
১৯-১২-১৯৩১	বৈদ্যনাথ ধাম	সর্বশ্রী শান্তি রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী, বিজয় ভূষণ হড, কাশীনাথ হড(ভণ্ডুল) হরিভূষণ দাঁ, গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্য, নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল দে ও বিজয় কৃষ্ণ গড়গড়ী।

ডিসেম্বর-১৯৩৬ পুরীধাম সর্বশ্রী বিজয় ভূষণ হড়,
(মতান্তরে-১৯৪০) বিজয় কিশোর গড়গড়ী
প্রশান্ত কুমার দাঁ ও সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায় (বটু)

২২-১২-১৯৩৯ বোলপুর, দুমকা, দেওঘর সর্বশ্রী বিজয় ভূষণ
মান্দার হিল, ভাগলপুর। হড়, বিজয় কিশোর
গড়গড়ী ও নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩-১২-১৯৪১ পুরুলিয়া, রাঁচী, সর্বশ্রী নন্দলাল
ধানবাদ ও হাজারীবাগ। বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন
লাল দে ও অশ্বিনী কুমার দাঁ।

২৫-১২-১৯৪৪ মুর্শিদাবাদ (ভায়া সর্বশ্রী শান্তিরাম
পাণ্ডুয়া) কালনা, বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়
নবদ্বীপ, পলাশী। ভূষন হড়, কৃষ্ণ
গোপাল পাকড়াশী ও শম্ভু দাস মান্না।

ডিসেম্বর ১৯৪৬ বিষ্ণুপুর (ভায়া সর্বশ্রী শান্তিরাম
গড়মান্দারণ) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়
ভূষণ হড় ও কৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী। (শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

পরবর্তী ভ্রমণ সূচী যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খেলা ধুলার বিভিন্ন সংস্থা।

রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাবের জন্মলাভের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। (পৃঃ ৪৪৯) দীর্ঘকাল ধরে খেলার মাঠের অভাবের মধ্যেও এই সংস্থাটি ফুটবল খেলায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন: "Many outstanding Serampore Sub-divisional foot-ball players of to-day had their initiation in this club.——For some years past this club has branched out to other fields of sporting activity. Cricket and hockeyare equally

enthusiastically pursued by the members."

(S.S.Sports Association Souvenir-1963)

পোড়ামাঠের সৃষ্টি হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এই মাঠে ফুটবল খেলার সুযোগ দেখা দেয় এবং ১৯৩৩ খৃঃ প্রধানতঃ রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ফুটবল খেলার উন্নতিকল্পে I.X L চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। উক্ত নামকরণের মূলে ছিলেন তদানীন্তন ক্রীড়া শিক্ষক শ্রী নলিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী। পর পর কয়েক বৎসর খেলার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় ১৯৩৭ সালের চূড়ান্ত খেলাটি পোড়ামাঠ চট দিয়ে ঘিরে প্রদর্শনী খেলারূপে অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনা চক্রে এই পর্যন্ত উক্ত সংস্থার সম্পাদকের ভার লেখকের উপর ন্যস্ত ছিল। পরবর্ত্তী কালে ৺নসীরাম ব্যানার্জ্জি স্মৃতি রাণার্স কাপ সংযুক্ত হয় এবং স্বনামধন্য খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত হীরালাল দে সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন পূর্বোক্ত রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাব (Fixture - 1939)।

ব্যাড মিণ্টন খেলার উন্নতি।

ফুটবল খেলার সময়োপযোগী ঋতু কাল উত্তীর্ণ হলে শীতকালে ব্যাডমিণ্টন খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এর জন্যে সুপ্রশস্ত খেলার মাঠের প্রয়োজন না থাকায় যত্র তত্র এই খেলার অনুশীলন চলতে থাকে।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ তারিখে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ দাঁর বাস-ভবন সংলগ্ন (বিশেষভাবে নির্মিত) ক্রীড়াভূমিতে রিষড়া ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় হুগলী জেলা ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্টের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ১৫টি নামকরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ৫২ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন শ্রী প্রমথ নাথ দাঁ এবং সহসভাপতি ছিলেন শ্রী নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল ও শ্রী রবীন্দ্র নাথ দাঁ। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সর্বশ্রী বসন্ত কুমার দাঁ ও হরিধন দাঁ। সহকারী সম্পাদক

ছিলেন শ্রীঅনিল কুমার দাঁ।

দি রিষড়া ক্লাব

উক্ত ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৯ খৃঃ। রেজিষ্টার্ড ক্লাব হিসাবে প্রারম্ভিক যুগে বহুবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ক্লাবটি এতদঞ্চলে বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করে। খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ, নাট্যানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অধিবেশন প্রভৃতি নানা বিভাগে কার্যধারা বিস্তৃতি লাভ করে। সাহিত্য চর্চ্চার দিকেও দৃষ্টি প্রদত্ত হয়। বহু মূল্যবান পুস্তক সম্ভারে সমৃদ্ধ একটি পাঠাগারও স্থাপিত হয় সভ্যগণের সুবিধার্থে।

১৯৪১ খৃঃ (বাং ১৩২৮) 'রিষড়ার উন্নতিমূলে কাহারা তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ক'রে গ্রামের ঐতিহ্যময় প্রাচীন ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী সংগ্রহে উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী (লেখক) এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকায় করায় বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হন এবং উক্ত ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত হাতে লেখা "মিলনী" নামক পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩/৪৪ খৃঃ আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক যুগের ঘটনাবলীর উপর রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এবিষয়ে উৎসাহী সভ্য ৺হৃষিকেশ দের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। তাঁর অকাল মৃত্যুতে এবং সম্পাদক শ্রীবসন্ত কুমার দাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির পূর্বশ্রী কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে।

ফুটবল খেলায় রিষড়া ক্লাবের খেলোয়াড়গণ বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন

"The Rishra Club holds the unique record of winning the senior foot-ball league competition of the

Sub-divisional Sports Association for four years in succession from 1950-1953 and again in 1959. During the same period the club won many trophies in foot ball including the Bengal Challenge Cup (Benaras), Satinath Memorial Shield (Murshidabad).

ফুটবল খেলা ছাড়াও ব্যাডমিন্টন, হকিলীগ প্রভৃতি প্রতিযোগিতাতেও এই ক্লাব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। নাট্য বিভাগের সভ্যগণও কয়েকখানি নাটক—গৈরিক পতাকা, কেদার রায়, সরমা প্রভৃতি মঞ্চস্থ ক'রে সুঅভিনয় দ্বারা দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন।

এই ক্লাবের পরিচালনায় ১৯৪২ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত 'সোনার বাংলা' চ্যালেঞ্জ শীল্ড এবং সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ রাণার্স আপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় পোড়ামাঠে। এই মাঠটী তখন এম, ই, স্কুলের নিকট থেকে তাঁরা কয়েক বৎসরের জন্যে লীজ নিয়েছিলেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় বহু বিশিষ্ট ফুটবল দল (দূরের ও কাছের) অংশ গ্রহণ করেন।

একক ও জুটি উভয় প্রকার ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় ৩ বৎসর ধরে। একক বিভাগে ৺কৃষ্ণলাল দাঁ (বিজিত) শীল্ড ও বিভাবতী দাঁ চ্যালেঞ্জ কাপ (বিজিত) এবং জুটি বিভাগে হেমচন্দ্র দাঁ শীল্ড ও আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যালেঞ্জ কাপ (বিজিত) পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীসত্যেন মুখার্জীর নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য। "Sri S. Mukherjee popularly known as Fancy, is the life-blood of the club. He represented India against the Russian football team in 1955.

President – Sri Tarakdas Banerjee

Secretary—Sri Narayan Ch. Paul

(S. S. Sports Association Souvenir - 1963)

উক্ত ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহু খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ এবং শিল্পীবৃন্দের আগমন ঘটে। ২১/৪/৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্লাবের দ্বাদশ বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জনপ্রিয় অভিনেতা এবং মোহন বাগান ক্লাবের হকি সম্পাদক শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীজহরলালের ভগ্নীপতি ছিলেন রিষড়া দেওয়ানজী ষ্ট্রীট নিবাসী ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা স্বর্গতঃ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের আদি নিবাস ছিল গোবরডাঙ্গা। রিষড়ার ৺ধর্মদাস হড়ের (ছোট) কন্যার সঙ্গে বিবাহের পর সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রিষড়ায় বসবাস স্থাপন করেন।

অরোরা ক্লাব

উক্ত ক্রীড়াসংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪০ সালে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল প্রভৃতি বিভিন্ন খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর চর্চ্চাই ছিল এঁদের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৪৮ সালে শ্রীরামপুর মহকুমা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের জন্ম লগ্ন থেকে ক্লাবটি এ্যাসোসিয়েসনের অনুমোদন লাভ করে। তৎকালে সভাপতি ছিলেন শ্রীহীরালাল দে এবং সম্পাদক ও সহসম্পাদক ছিলেম যথাক্রমে শ্রীমন্মথ নাথ আশ এবং শ্রীমাণিক লাল দাস। ১৯৪৩ সালে সম্পাদক শ্রীমন্মথ নাথ আশের প্রচেষ্টায় শুরু হয় "Our Village Challange Cup" নামে জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা।

বলাবাহুল্য রিষড়ায় কোনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ খেলার মাঠ না থাকায় ফুটবল খেলোয়াড়রা অনুশীলনের ক্ষেত্রে বরাবরই বিশেষ অসু-

বিধার সম্মুখীন হন। খেলার মাঠ বলতে তখন একমাত্র সম্বল পোড়া মাঠ, যার আয়তন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ময়দানের অর্দ্ধেকও ছিল কিনা সন্দেহ, তা ছাড়া একটা মাঠে সবদলের সবদিন খেলা সম্ভবপর নয় তাই অরোরাক্লাব বেছে নিয়েছিল প্রথমে রিষড়া হাইস্কুলের মাঠ (অধুনা মুখার্জি প্লেস) তারপর এ, সি, সি, আই কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে তাঁদের খেলার মাঠ ব্যবহার করতে থাকে। বিভিন্ন কারণে উক্ত মাঠ দুটি হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘটকের প্রচেষ্টায় জয়শ্রী টেক্সটাইলের খেলার মাঠটি ব্যবহারের অনুমতি পায়। সভ্যেরা খুরদা (পুরী), রাঁচি, বেলডাঙ্গা, জলপাই-গুড়ি, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি স্থানের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ গ্রহণ করে।

ক্রিকেট ও হকি খেলাতেও উক্ত ক্লাবের সভ্যরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে শ্রীমধুসূদন দাঁ জেলার ভিতর ও বাহিরের কয়েকটা দৌড় প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ ক'রে ক্লাবের সম্মান বৃদ্ধি করে।

বর্ত্তমানে সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীসুধীর কর্মকার লিখেছেন:— অরোরা ক্লাবে প্রথম যে বছর খেলি (১৯৬৩) সেই বছরই আমি আন্তঃ জেলা ফুটবল দলে খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করি। তারপর হুগলী জেলা দলের হয়ে আই, এফ্, এ শীল্ড খেলার সুযোগ পাই। তারপর থেকেই আমি কলিকাতা মাঠে 'প্রথম ডিভিসন' ফুটবল খেলার সুযোগ পাই। আমি আমার অরোরা ক্লাবকে কোনদিনই ভুলতে পারবোনা।' (স্মরণিকা ১৯৭২)

সাধারণ সম্পাদক —শ্রীশ্যামসুন্দর দাঁ,

সভাপতি— শ্রীঅজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"বর্ত্তমানে সুধীর ইষ্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ও লেফ্‌ট ব্যাক। বিদেশের মাটিতে তাকে ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবেও দেখা যাচ্ছে। বিদেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা তাকে একজন

উঁচুদরের রক্ষণ-ভাগের খেলোয়াড় বলে মন্তব্য করেছেন।”

(কিশোর বাংলা — ১৩৭৯)

উক্ত ১৯৭২ সালের অরোরার স্মরণিকায় শ্রীসত্যেন মুখার্জি (ফ্যান্সি) ‘রিষড়ার খেলাধূলার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন — বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব, (B. F. C.) G. F. C. I. প্রভৃতি দলের কথা। এই প্রসঙ্গে বহু খেলোয়াড়ের কথাও উল্লেখ করেছেন তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন ক্লাবের সভ্য। তাঁদের মধ্যে যাঁদের আমরা ভুলতে বসেছি তাঁরা হলেন :— ৺দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (মাষ্টার মহাশয়) যোগেশ মুখো, রতন হড়, অশ্বিনী দাঁ, পঞ্চানন আশ, এবং সর্বশ্রী শিশির মুখোঃ, মাণ্ডনি দা প্রভৃতি। যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছেন তাঁরা হলেন :— কাশীনাথ দে, বসন্ত পরামানিক (খিদিরপুর ক্লাব), ভবানী চৌধুরী (হাওড়া ইউনিয়ন ক্যাপ্টেন) প্রভৃতি আরও একটা কথা বলেছেন ‘রেফারী হিসাবে শ্রীহেমন্ত কুমার গড়গড়ী প্রভূত সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। অফসাইড ধরতে তাঁর মত আর কেউ ছিলেন না।

টাউন ক্লাব

শ্রীমহাদেব সাধুখাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালে জন্মলাভ করে রিষড়া টাউন ক্লাব। ফুটবল ছাড়াও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল এই ক্লাবের কার্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। শ্রীরামপুর মহকুমা স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েসনের অনুমোদিত ক্লাবগুলির তালিকায় এঁদের নামও উল্লেখযোগ্য।’ Rishra Town Club, very recently affiliated, plays Foot ball and Cricket. This Club has got cultural activities worth mentioning.’

President, Sri Suslil Putatunda.

Secretary : Sri Bharatananda Sreemani (1963)

১৯৫৮ সালে নিউ স্পোর্টিং ক্লাব জন্ম নেয়। এই ক্লাব সম্বন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্মরনিকায় উল্লিখিত আছে যে :–'Founded in the Year 1958, New Sporting Club joined Sub-divisional Sports Association in that year. They played in 'B' Division Football league in 1963'

President : Md. Siddique.

Secretary : Sri Babulal Sharma.

রিষড়া টাউন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমহাদেব সাধুখাঁর কৃতিত্ব ফুটবল খেলায় নয়। শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাবের সভা হিসাবে তিনি পরপর ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে হুগলীতে অনুষ্ঠিত গুলি ছোঁড়া প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। ১৯৬০ সালের জাতীয় সপ্তম গুলি ছোঁড়া প্রতিযোগিতায় রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্ত হন এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে সর্ব্ব-ভারতীয় শুটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভের অধিকারী হন। রেফারী হিসাবেও তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন।

এই প্রসঙ্গে রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্য শ্রীরমেশ চন্দ্র দাশ গুপ্তের অসাধারণ কৃতিত্বও উল্লেখ যোগ্য। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় ২৪/২/৭০ তারিখে শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাবের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা উদ্ধার যোগ্য :–

'Such as Mr. Ramesh Dasguta, a member of the Indian Shooting team that took part in the friendly Indo-Japan Rifle meet at Delhi in 1953 and at Tokyo in 1956. He reached the pinnacle of his glory (গৌরবের চরমসীমা) when he was chosen as a mumber of the Indian Team in the XVI World Olympics at Melbourne, Australia in 1956. The National record set by him in the

eighth Nationals in the free rifle standing position is yet to be surpassed.'

৭/১১/৫৬ তারিখে শ্রীদাশগুপ্তকে মেলবোর্ণ ওলিম্পিক স্যুটিং প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের প্রাক্কালে শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে (বাঙ্গুর পার্ক) ডাঃ গোপাল দাস নাগের সভাপতিত্বে এক ঘরোয়া সভা আয়োজিত হয়। ডাঃ নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ শ্রীদাশগুপ্তকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি জ্ঞাপন করেন।

ফুটবলখেলায় যাঁরা অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছেন তাঁদের তালিকা স্বতন্ত্র। এবিষয়ে মিলন চক্রের ১৯৬৬ সালের স্মারক পুস্তিকায় যাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হলেন— 'সর্বশ্রী হীরালাল দে, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (হেলুদা), দ্বিজেন্দ্রনাথ আশ, শৈলবিহারী দত্ত (গোবর দা), শম্ভুদাস ব্যানার্জি, রজনীকান্ত ভুঁইয়া, পঞ্চানন মণ্ডল, বসন্ত প্রামাণিক, পশুপতি দত্ত এবং ভূদেব মুখো:। শ্রীচিণ্ময় আশের নামও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বিশিষ্ট ক্রীড়া শিক্ষক হিসাবে তাঁর অবদানও বড় কম নয়।

সত্যেন মুখার্জী (ফ্যান্সির) সম্বন্ধে বাকিটুকু বলা দরকার "He is the most widely known Goalkeeper from Rishra He played with distinction for East Bengal and Mohon Bagan Club. In 1954 he represented W, Bengal in the National Championships. Next year he represented India in Afganisthan. He played against Russian XI, Austria XI, Iranian XI and the Chinese XI. He toured Burma and Pakistan with the East Bengal Club. He is now foot-ball Coach of repute.'

(Big-guns – Milan Chakra—1966)

ইতিপূর্বে এতদঞ্চলে গোলরক্ষক হিসাবে শ্রীসত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (হাবুদা) ছিলেন একক ও অনন্য।

খেলার মাঠের সৃষ্টি

১৯৫৪ সালে বসন্ত কুমার দাঁর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে একটি খেলার মাঠ স্থাপনের প্রচেষ্টা উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এই প্রসঙ্গে রিষড়া পৌর সভার পূর্ববর্ত্তী বোর্ডগুলির অসাফল্য মণ্ডিত প্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়ে ১৯৬৭ সালে নবগঠিত বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৌরসভাপতি শ্রীযদুগোপাল সেনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় বহু ঈপ্সিত ও আকাঙ্খিত 'লেনিন ময়দান' স্থাপিতহওয়ায় ক্রীড়ামোদীদের একটি দীর্ঘদীনের অভাব দুরীভূত হয়। পৌর তহবিল থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় এই ক্রীড়াঙ্গনের জমি কেনা হয়। আনন্দ বাজার পত্রিকা ঃ—২০/৩/৭০। ২/৫/৭০ তারিখে উক্ত ময়দানের শুভ উদ্বোধন করেন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগেব প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয়। এই ক্রীড়াঙ্গনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে সরকারী সাহায্য হিসাবে মোট একলক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করার মুলে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা সোভিয়েত বার্ত্তা বিভাগের উপাধ্যক্ষ শ্রীএম, এ, চুডিনোভ এবং সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীএ, এস, পারাস্তায়েভ। (সোভিয়েত দেশ—১১/৬/১৯৭০)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৮/১২/৬৯ Rishra Sports Promotion Cammittee একটি দীর্ঘ আবেদন পত্র মারফৎ রিষড়ায় অত্যাবশক খেলার মাঠ স্থাপন উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় তাঁদের সে প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় নি।

১৯৩৫ সালে ৬ই মে রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভা কর্ত্তৃক সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় এবং তদুপলক্ষে ১০০০৲ টাকা ব্যয়ে রিষড়া ও কোন্নগরে দুটি ২" ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট 'জুবিলী টিউবওয়েল' স্থাপিত হয়। রিষড়ার নলকূপটি স্থাপিত হয়েছিল পূর্ণবাবুর মাঠের পার্শ্বে।

দেশ হিতৈষী সাহিত্যিকের জীবনাবসান।

সন ১৩৪২ সালের মাসিক বসুমতীতে (ইং ১৯৩৫) নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

"সত্যচরণ শাস্ত্রী সন ১৩৪২ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার রিষড়াস্থিত ভবনে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজী, জালিয়াৎ ক্লাইভ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কয়েকখানি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস দক্ষিণেশ্বর।"

"বাংলা ও সংস্কৃত ব্যতীত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় ইনি অভিজ্ঞ। বাঙ্গালা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা করতে ইনি সমান পারদর্শী।" (সুবল চন্দ্রের অভিধান)

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে তাঁর শ্বশুর ৺ভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের আহ্বানে তিনি রিষড়ায় এসে ৺যোগীন্দ্র নাথ দাসের জমি ক্রয় ক'রে বসবাস করেন। 'ছত্রপতি শিবাজীর' দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩১ সালের মহালয়ার দিন রিষড়া থেকে প্রকাশিত হয়। (শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

২৯/১২/৪৫ তারিখের সভায় পৌর সদস্যগণ এই প্রবীন দেশ হিতৈষী সাহিত্যিকের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর বাড়ীর পার্শ্বস্থিত 'অকল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের' নাম পরিবর্ত্তন ক'রে 'সত্যচরণ শাস্ত্রী ষ্ট্রীট' নাম করণ করেন।

তাঁর সম্বন্ধে বহু লেখকই অনেক কিছু লিখেছেন। প্রমোদ

কুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত—'প্রাণ কুমারের স্মৃতিচারণ' নামক পুস্তকে (পৃঃ ২৮৮) তাঁর বিভিন্ন তীর্থভ্রমণের কথা অবগত হওয়া যায়ঃ—

'তখনকার দিনে সত্যচরণ শাস্ত্রী মশাইয়ের একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। ছত্রপতি শিবাজী, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, জালিয়াত ক্লাইভ ইত্যাদি তখনকার দিনে তাঁকে দেশহিতৈষী সাহিত্যিক বলে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। এই মহাত্মার সঙ্গে ১৯১৮ সালে আমার কৈলাসতীর্থে যাবার যোগাযোগ এবং তখনই তাঁর সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় ঘটে।' (শ্রীমণীন্দ্র আশের সৌজন্যে)

সরকারী জরিপ।

১৯৩০-৩৬ সালের সরকারী জরিপের চূড়ান্ত নক্সা এবং প্রমাণ পত্রাদি (পরচা) প্রকাশিত হওয়ায় জমির প্রকৃত মালিক ও তার আয়তন নির্দ্ধারণে বিশেষ সুবিধা হয় এবং ভূমি ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ইতিপুর্বে ইং ১৮৪৫ খৃঃ হুগলী জেলায় যে জরিপ কার্য হয় তার প্রমাণ পত্রাদি বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হয়নি।

(হুগলী জেলার ইতিহাস— পৃঃ ৬০৩)

নূতন নূতন কলকারখানা।

প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রিষড়ায় ভারতের প্রথম জুট মিল স্থাপনের পর থেকে আরও দুটি পাটকল স্থাপনের কথা ইতিপুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জুটমিলের পরিবর্ত্তে এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা তার মধ্যে 'এ্যালকেলি কেমিকেল করপোরেসনই' হল সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধার যোগ্য। প্রসঙ্গতঃ উলেখযোগ্য যে বাগের খালের উত্তরে প্রেসিডেন্সি জুটমিল সংলগ্ন যে বিস্তৃত ভূ-ভাগ তাঁরা

ক্রয় করেন তার ফলে বহু জায়গাজমি ও বরোজ বিক্রি হয়ে যায়।

'ভারতে আই, সি, আই উৎপাদক সমূহের অন্যতম এ, সি, সি, আই সংগঠিত হয় ১৯৩৭ সালে। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে (১৯৪০ সালের ৪ঠা এপ্রিল) কষ্টিক ও ক্লোরিণ তৈরীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায় প্রথম ইলেক্ট্রোলিটিক প্ল্যান্ট চালু হয় এবং স্থানীয় উৎপাদনের জন্য আই, সি, আই এর এই ছিল প্রথম প্রয়াস। ... রিষড়া ছিল তখন বাংলা দেশের আর দশটি গ্রামের মতই পুকুর আর ধান খেতে ভরা একটি বড় গ্রাম। ভারতের শতাব্দী-প্রাচীন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও নদী সমূহ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। সে জন্য রিষড়ার উন্নয়ন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।'

'বয়লার প্ল্যান্টের পেছনটা ছিল ডোবা পুকুর ও জঙ্গলে ভর্তি। ছোট একটা বাড়ীতে অফিস ছিল, কয়েকজন সাহেব, সাহাবাবু এবং কে, কে, রে বাবু অফিসে কাজ করতেন।

মিঃ কে, এস, জ্যাকসন ছিলেন ওয়ার্কস ম্যানেজার, মিঃ ই, মার্টলে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং মিঃ জে. এন, সাহা অফিসের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন।'

'সন্ধ্যে হলেই শেয়াল ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার ঘুরে বেড়াত এখানে।' সে যুগে রিষড়ায় পেণ্ট কারখানার সন্নিকটে একটি ভূতের বাস্তব কাহিনী লিখে রেখে গেছেন মিঃ গ্রীন, এ্যাকী পেণ্টসের প্রাক্তন ওয়ার্কস ম্যানেজার।

যাইহোক, ১৯৪০ সালে এ্যাকীর কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিষড়া ও কোন্নগরের কিছু কিছু অধিবাসীর কর্মসংস্থান হয়েছিল সত্যি কিন্তু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতেও বাদ যায় নি। বিভিন্ন মহল থেকে স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযোগ প্রদত্ত হয় কিন্তু তার ফলে ৫ কোটি টাকার প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ বা বাধাপ্রাপ্ত হয নি।

'১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী করা হচ্ছিল। সেই সময় এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে

দু'তিন জন কর্মী প্রাণ হারায়।' বলা বাহুল্য, এই বিস্ফোরণের ফলে বিষড়াবাসীদের মনে স্বভাবতই ভবিষ্যতে অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল, অদ্যাবধি উক্ত ধরণের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পুনরাবির্ভাব না ঘটলেও মধ্যে মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের ফলে পান চাষ এবং ফলপুষ্পের বৃক্ষগুলি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ১৯৪৯ সালের পান চাষের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় শ্রীনিতাই চরণ দত্ত সর্তসাপেক্ষে এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। কল্কি ও ক্লোরিন তৈরী ক'রেই কোম্পানী ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের তৈরী বিশ্ব বিখ্যাত রঙ সমূহ ১৯৫১ সালে রিষড়ায় তৈরী হতে থাকে।

১৯৫৯ সালে ভারতের প্রথম পলিথিন প্ল্যান্ট নির্মাণ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের অর্থমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমোরারজি দেশাই ২ রা মে ১৯৫৯ এই পলিথিন কারখানার উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে তৎকালীন পৌর প্রধান শ্রীসুশীল চন্দ্র আওনও উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে উক্ত প্ল্যান্ট স্থাপিত হওয়ার ফলে শিল্পউপনগরী রিষড়া ভারতের মধ্যে তিন তিনটি অভিনব শিল্প সংস্থার জন্মভূমি হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জ্জন করে। প্রথম—১৮৫৫ খৃঃ প্রথম জুটমিল, দ্বিতীয় ১৯৪৮খৃঃ প্রথম ফ্ল্যাক্সমিল এবং তৃতীয় ১৯৫৯ খৃঃ পলিথিন প্ল্যান্ট।

এরপরই স্থাপিত হয় রবার কেমিক্যাল তৈরীর প্ল্যান্ট, এর ফলে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচান ছাড়াও পলিথিন ও রবার থেকে বিভিন্ন জিনিষপত্র তৈরীর জন্যে ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিন দিন বেড়ে গিয়েছে। গত ত্রিশ বছরে এ, সি, সি আই যে প্রভূত উন্নতিলাভ করেছে তার ইতিহাস তাঁরা তুলে ধরেছেন তাঁদের প্রকাশিত ROUNDEL এবং অন্যান্য পুস্তিকার মাধ্যমে। (Roundel—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাল এবং শ্রীশান্তি রঞ্জন দাসের সৌজন্যে।)

গত ৪/৪/৭০ তারিখে কার্যারম্ভের ত্রিংশবর্ষ পুর্ত্তি উৎসব পালিত হয়। চেয়ারম্যান মিঃ এ, ডব্লুই হ্যামার প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। একটা কথা বলা দরকার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আর,এ এফর পক্ষ থেকে এই কারখানায় ক্যাম্প খোলা হয় এবং অন্যান্য স্থানীয় কারখানায় মিত্রশক্তির ক্যাম্প স্থাপিত হওয়ার ফলে সমগ্র রিষড়া এলাকাটি একটি সামরিক ঘাঁটির ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

রিষড়া সংস্কৃতি পরিষদ

ইং ২/২/৪০ তারিখে ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পি, এইচ, ডি, এফ, সি, এস (বার্লিন) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে রিষড়া বারুই পাড়া হরিসভা প্রাঙ্গনে উক্ত পরিষদের শুভ উদ্বোধন হয়। আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীললিত মোহন হড়। উক্ত সভায় পরিষদের কার্যপরিচালক সমিতি গঠিত হয়। এই পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় (১৮/৩/৪৩) রিষড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন ও সাধনার ধারা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ১৯৪৯ খৃঃ পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিষদের নবম বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে এই পরিষদের উদ্যোগে শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ভবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৬/১২/৪৩ তারিখে হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে গিরীশ শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। (চুন্টা প্রকাশ ১৩৪৭)

এই প্রসঙ্গে ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি যদিও ত্রিপুরা জেলার চুন্টা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি জার্মানী থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই কলকাতা নারিকেল ডাঙ্গা

ও পরে কোন্নগরে রাসয়ানিক কারখানা ও গবেষণাগার (টেক্নো কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী) নির্ম্মাণ করেন। পরে অবশ্যত এই প্রতিষ্ঠান উঠে যায়। তখন থেকেই রিষড়ার সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ।

১৯১৪ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তিনি ছিলেম একাধারে বিপ্লবী ও বিজ্ঞানী। প্রকাশ্য কোন আন্দোলনে যোগদান না করলেও গুপ্ত বিপ্লব সাধনার সঙ্গে ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে জেনেছি যে ভারতীয় কৃষ্টি ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে তাঁর আস্থা বড় কম ছিল না। তাই তিনি জার্ম্মানী থেকে চুণ্টায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তৎকালীন সামাজিক প্রথা রক্ষা করেন।

রিষড়ার বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নতিমূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, প্রীতিপ্রদ, এবং অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ মূলক। রিষড়ার তৎকালীন অধিবাসী হিসাবে তিনি ১৯২৩-২৫ খৃঃ রিষড়া—কোন্নগর পৌর সভার সরকার—মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খৃঃ 'রণ সজ্জায় জার্ম্মেনী' নামক পুস্তক রচনা ক'রে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। সাহিত্য সাধনার অঙ্গ হিসাবে তিনি কয়েকটি বিশিষ্ট পত্র পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং 'চুণ্টা প্রকাশ' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

(সাংবাদিকের স্মৃতিকথা—বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এবং দৈনিক বসুমতী—৯/৩/৬৩) শ্রীমণীন্দ্র আশের সংগ্রহ সংকলন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি রিষড়া থেকে আরও দু'খানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। বই দু'খানি হল—'ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের কাহিনী' (১৯৫৮) এবং 'বহির্ভারতে ভারতের মুক্তি প্রয়াস' (১৯৬২)। এই গ্রন্থ সংকলন কার্যে রিষড়ার দুজন সাহায্যকারী তরুণ সর্ব্বশ্রী সমরেন্দ্র নাথ পাল ও অধীরেন্দ্র নাথ পালের নাম

উল্লেখযোগ্য। ৭ই মার্চ্চ ১৯৬৩ বৃহস্পতিবার রাত্রে রিষড়া ভবনে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রায় ৪৪ বৎসর কাল তিনি ছিলেন রিষড়ার অধিবাসী।

তিনি কয়েক বৎসর রিষড়া বান্ধব সমিতি সাধারণ পাঠাগারের সভাপতি হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং 'রিষড়া ফ্রেণ্ডস সোসাইটি পাবলিক লাইব্রেরী' এই ইংরেজী নামের পরিবর্ত্তে উক্ত নামকরণ তাঁরই প্রদত্ত। রিষড়া কংগ্রেসেরও তিনি দীর্ঘকাল সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্যে তাঁর অনুরাগীবৃন্দ ২৩/৩/৬৩ তারিখে রিষড়া প্রেম মন্দিরে একটি সভাধিবেশনে মিলিত হয়ে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

রিষড়া পৌরসভা কর্ত্তৃক ৩০/১১/৬৩ তারিখের সভায় বাঙ্গুর কলোনির ৬ষ্ঠ লেনটি 'ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য রোড' নামে অভিহিত হয়।

সাধু সমাগম।

"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধুলক্ষণম্ ॥"

১৯৩৩ (বাং ১৩৪০) সালে দেখা গিয়েছিল রিষড়ার ব্রহ্মতলার নিকটে ভাগীরথী তীরে এক সৌম কান্তি জ্যোতির্ময় পুরুষকে। শ্রীরামপুরের চিকিৎসক ডাঃ নন্দলাল পালের আনুকূল্যে সংগৃহীত হয়েছিল এক খণ্ড জমি প্রায় গঙ্গার গর্ভে। গঙ্গার পলি মাটি তুলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল একটি টিনের চালা। স্থাপিত হল ছোট্ট একটি আশ্রম। নাম হল 'প্রেম-মন্দির' (Temple of love).

কিন্তু কে এই যোগী পুরুষ? সকলের মনেই প্রশ্ন জাগে কে দেবে তাঁর পরিচয়। আগুন কখনও ছাই চাপা থাকে না। কয়েক-দিনের মধ্যেই নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেওঘর 'রাম নিবাস' আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বর-কৃপাধন্য পরম পুরুষ বালানন্দ-

জীর মন্ত্রশিষ্য। গুরুপ্রদত্ত নাম হল 'তারানন্দ ব্রহ্মচারী'। গুরু সেবায় এবং যোগ সাধনায় অতিবাহিত হয়েছে চতুর্দশ বৎসর। এরই মধ্যে পর্যটন করেছেন ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থগুলি-সুদূর হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত।

আশ্রমের পাশেই শ্রীমাণি ঘাট, শত শত স্নানার্থী নিত্য স্নান পর্ব সমাধা করেন এই ঘাটে। স্নানান্তে কেউ বা আশ্রমে সাধু মহারাজের দর্শনার্থে ঢুকে পড়েন তাঁকে প্রণাম করতে, কেউ বা বাইরে থেকে আশ্রমে দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যায়। আশ্রমের মধ্যে থাকেন ব্রহ্মচারীজির গর্ভধারিণী অশীতিপর বৃদ্ধা। একনিষ্ঠ মাতৃসেবার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা পাঠ। শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠের সঙ্গে যুক্ত হয় রাসোৎসব। ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে থাকেন দূরের ও কাছের মানুষ।

ইতিমধ্যে স্থানীয় কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিবারণে বহু পরীক্ষিত দৈব ঔষধ প্রদানের বিজ্ঞাপন। অনেকেই আসতে থাকেন শ্রীমাণি ঘাট লেনস্থ প্রেম-মন্দিরে দৈব ঔষধ নিতে। এমনই ভাবে চলতে থাকে মাতৃ সেবার সঙ্গে আধ্যাত্ম সাধনায় কৃচ্ছ সাধন, এবং জনমানসে আধ্যাত্মিক চেতনা ও ধর্মভাব উদ্বোধন প্রচেষ্টা। সংযুক্ত হয় বাৎসরিক শ্রী শ্রী৺অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে বটুক ও কুমারী পূজন ও প্রসাদ বিতরণ।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সুরু করে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে কত পূজাপার্বণ কত ধর্ম সভা। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ব্রহ্মচারীজির সাধনলব্ধ সাত্ত্বিকভাবের আকর্ষণে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে বহু সজ্জন ব্যক্তিই আকৃষ্ট হয়েছেন এই আশ্রমের প্রতি। পূর্বোক্ত রিষড়া সংস্কৃতি পরিষদের সভ্যরাও এসেছেন, যোগদান করেছেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। বলা বাহুল্য এই আশ্রমের প্রতিটি উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে ভক্ত

বৃন্দের এবং রিষড়ার গ্রামবাসীগণের আন্তরিক সহযোগিতা। প্রারম্ভিক যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ডঃ নন্দলাল পাল, ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য পি, এইচ, ডি, সর্ব্বশ্রী লক্ষ্মীকান্ত বন্দোপাধ্যায়, এম, এস, সি, নৃত্যগোপাল গড়গড়ী, সতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ভগীরথ খাঁ, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, সুশীল চন্দ্র আওন, রমেশ চন্দ্র পাল, হৃষিকেশ দে প্রভৃতি। এছাড়াও ছিলেন তাঁর কয়েকজন মন্ত্র শিষ্য।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীজি তাঁর আশ্রমস্থিত ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও রিষড়ার বাহিরে অনুষ্ঠিত বহু ধর্মসভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতি, কিম্বা প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে বৈদিক মঙ্গলাচারণ ও সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলীর শ্রদ্ধার আকর্ষণ করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁদের মনে শুদ্ধাভক্তি এবং ধর্মানুশীলনে আসক্তি।

এই আশ্রমেই প্রদর্শিত হয়েছে যোগাসন ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে নীরোগ, সুস্থ সবল শরীর গঠনের কৌশল। অনুষ্ঠিত হয়েছে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। ১৩৪৮ সালের শ্রীমৎ পূর্ণানন্দজীর স্মরণোৎসবে এসেছেন রাণী জ্যোতির্ময়ী দেবী (পাকুড়) প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়। এর পর থেকে প্রতিবৎসর বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এসেছেন বহু সাধক, খ্যাতনামা ব্যক্তি বিশিষ্ট সাংবাদিক, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, গোপীনাথ শাস্ত্রী, তারকেশ্বর, বারানসী ও নবদ্বীপ ধামের মোহান্ত মহারাজগণ, বসুমতী সম্পাদক—স্বর্গীয় হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, সর্ব্বশ্রী উপেন্দ্র নাথ, বন্দোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, ডঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, হরিনন্দন ঝা, ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

১৩৫৯ সালে প্রকাশিত আশ্রম পরিচিতি এবং অবৈতনিক সংস্কৃত শিক্ষায়তন সংবাদ সম্বলিত পুস্তিকায় বাবাহিকভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তা ও ঋত্বিকবৃন্দের নামোল্লেখ আছে এবং ১৩৭০ সালে অনুষ্ঠিত সূর্য যজ্ঞ প্রসঙ্গে পকাশিত 'স্মরণিকায়' আশ্রম ও আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ তাবানন্দ ব্রহ্মচারীজি সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির পুর্ণমুদ্রণ এখানে অনাবশ্যক। ইতিপূর্বে ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩ বসুমতীতে শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল।

যজ্ঞানুষ্ঠান :— এই আশ্রমের উদ্যোগে বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল : মহারুদ্র যজ্ঞ (১৯৫২), শতচণ্ডী যজ্ঞ (১৯৫৫) সলক্ষ্মীমহাবিষ্ণু যজ্ঞ (১৯৫৯) এবং সূর্য যজ্ঞ (১৯৭৪), এছাড়া ১৯৬৮ সালে চতুর্দশ দিবসব্যাপী কল্কি অবতার উৎসব, গীতা জয়ন্তী (১৯৪৫-৪৬), দ্বাদশ-দিবস ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী (১৯৫০) প্রভৃতি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য হল যে, উপরোক্ত হবনাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে সমাগত হয়েছেন ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হতে ঋত্বিক মণ্ডলী। সুবৃহৎ ও সুউচ্চ চতুর্দ্বার বিশিষ্ট যজ্ঞ মণ্ডপে অপূর্ব সুর ও ছন্দ সমন্বয়ে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রগুলি এবং প্রদক্ষিণ স্তোত্রাবলী মাইকের সাহায্যে প্রচারিত হওয়ায় ধন্য হয়েছে শ্রোতৃ মণ্ডলী, আকাশ বাতাস সুগন্ধি যজ্ঞধূমে হয়েছে পবিত্র। পবিত্র হয়েছে যজ্ঞভূমি ও পুণ্যার্থী মানুষের মন। যজ্ঞের সার্থকতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন স্বনামধন্য পুজ্যপাদ সুধীবৃন্দ।

অর্দ্ধনারীশ্বর বিগ্রহ :— মাতৃ বিয়োগের পর মাতৃসেবা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশে শ্রীমৎ তারানন্দজী ১৩৫৩ সালে আশ্রম সংলগ্ন ক্ষুদ্র মন্দির প্রকোষ্ঠে শ্বেত প্রস্তর রচিত মাতৃ মূর্ত্তী প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর অন্তর দেবতার নির্দেশে সঙ্কল্প করেন শ্রীভগবানের এক মন্দির প্রতিষ্ঠার। মন্দির নির্মিত হলে মনে প্রশ্ন জাগে, কোন মূর্ত্তি স্থাপন

করবেন ঐ মন্দির মধ্যে। চলতে লাগল রিষড়ার অধিষ্ঠাত্রী বহু প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার একাগ্রভাবে পূজার্চনা, অবশেষে স্বপ্নাদেশ পেলেন —"তোর এই শরীরের জনক জননীকে প্রতিষ্ঠা কর।' তখন তিনি নিঃশংসয়চিত্তে সন ১৩৭০ সালে মুখ্যচান্দ্র পৌষ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি; হর-পার্বতীর শ্বেত প্রস্তর নির্মিত অপূর্ব যুগলমূর্ত্তি। বাংলা দেশে যে মূর্ত্তির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। জগতের আদি জনক ও আদি জননীর সম্মিলিত মূর্ত্তি। মহাকবি কালিদাস বিরচিত রঘুবংশ কাব্যের প্রথম শ্লোকটির মধ্যেই রয়েছে এই অর্দ্ধনারীশ্বর তত্ত্বের স্পষ্ট পরিচয় :—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যের মধ্যেও ধনপতি সদাগরের এই যুগল মূর্ত্তি দর্শনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় :—

"ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
পার্ব্বতী হইল তাঁর অর্দ্ধ কলেবর॥

* * * *

অর্দ্ধ অঙ্গে শিব শিবা বহেন ধেয়ানে।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমানে॥
দুইজনে এক তনু মহেশ-পার্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ হৈল মূঢ়মতি॥

মানব দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে জনৈক যোগীপুরুষ লিখেছেন :— সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা এবং তদাশ্রিত তেজবাহী সূক্ষ্মনাড়ী সমূহের ক্রিয়াধিক্য বর্ত্তমান। দক্ষিণ চক্ষু সূর্য স্বরূপ। দক্ষিণ নাসিকা অগ্নিময় তাপযুক্ত উষ্ণশ্বাস বহন করে। হৃদপিণ্ডের দক্ষিণাংশে রক্তের দূষিতভাব বিলয়ের বা শোধনের বিশিষ্ট ক্রিয়া (রুদ্রভাব) বিদ্যমান। পক্ষান্তরে শরীরের বিষময় ও তেজময় অবস্থাকে সাম্যাবস্থায়

আনয়ন করার জন্যে দেহের বামাংশে সুধাকরের সুশীতল প্রভাব যুক্ত চন্দ্ররূপা ইড়া নাড়ী এবং তদাশ্রিত সুধা ও জলস্রাবী অসংখ্য সূক্ষ্মনাড়ী সর্বদা সুধা বিতরণে কর্মশীল। বাম নয়ন চন্দ্র সদৃশ, বাম নাসিকা দ্বারা ইড়া নাড়ীর সুশীতল বায়ু প্রবাহিত। ... এই সমস্ত কারণে মানব দেহের বামাঙ্গ বামা বা নারীরূপা এবং দক্ষিণাঙ্গ পুরুষরূপা। এইরূপে দক্ষিণ ও বাম এই উভয় অঙ্গের মিলনে দুর্লভ মানব দেহটি অর্দ্ধনারীশ্বর বা শিবশক্তিময় মূর্তিস্বরূপ।' (সংক্ষেপিত)। ভগবান শঙ্করাচর্য বলেছেন: 'শিব যদি শক্তির সহিত মিলিত থাকেন তাহা হইলে তিনি জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে প্রভু হইয়া থাকেন নতুবা তিনি স্পন্দন রহিত শবাকার ধারণ করেন।'

(প্রেম প্রবাহ বিশেষ সংখ্যা পৌষ ১৩৮১)

শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ: উক্ত মন্দির মধ্যেই ১৩৭৮ সালে প্রেম-ঘন-মূর্তি শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ যেন ভক্তের কাছে ভগবানের অযাচিত আগমন। এই বিগ্রহটি বহুদিন ধরে পূজা পেয়ে এসেছেন বর্দ্ধমান রাজবাটিতে। তারপর আসেন কলকাতার ভক্ত রামচন্দ্র সিংহীর ভবনে। সেখানে দীর্ঘ ১১ বৎসর সেবা পাবার পর স্বেচ্ছায় এসে উপনীত হলেন প্রেম-মন্দিরে। প্রেমময়ের অপূর্বলীলা। শিব শক্তির যুগ্মমূর্তির পাশে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী এবং প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত প্রস্তর মূর্তি। ('প্রেম প্রবাহ') ২য় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা। গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলীতে গেয়েছেন:—

"না দেব কামিনী (না) দেব কামুক
কেবল প্রেম প্রকাশ।
গৌরী-শঙ্কর-চরণ-কিঙ্কর
কহই গোবিন্দ দাস।"

উপরোক্ত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি সম্বন্ধে রিষড়া নিবাসী শ্রীবলাই চন্দ্র দত্ত একটি অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করেন তাঁর বাল্যস্মৃতি

থেকে। ছেলেবেলায় প্রতিদিন মায়ের সঙ্গে যেতেন গঙ্গাস্নানে। এক দিন ফেরার পথে কৌতুহল বশতঃ শ্রীমৎ ননীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠীত- অনাথ আশ্রমের চালাঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে পান শিবলিঙ্গের পাশে একটি কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ কোন এক পুরুষ দেবতা ও স্ত্রীদেবতার যুগলমূর্ত্তি। মায়ের কাছে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে উনিই হলেন জগন্মাতা ও জগৎপিতা—হরগৌরীর যুগ্ম-মূর্ত্তি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতি জেগে থাকে দত্তমশায়ের অন্তস্থলে। অনুসন্ধান করেও সে রকম মূর্ত্তির সন্ধান পান নি কোথাও। সে পাথরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিরও আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। কেউ তার কথা বলতেও পারেনি। যাইহোক বহুকাল পরে কোন এক মাসিক পত্রিকায় পূর্বোক্ত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির আলোক চিত্র দেখতে পান। সেই থেকেই তিনি ঐ মূর্ত্তি ধ্যান করতে থাকেন মনে মনে। শেষ পর্যন্ত ১৩৭০ সালে প্রতিষ্ঠীত শ্রীমৎ তার নন্দ মহারাজের স্বপ্নাদিষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে তাঁর বহু আকঙ্খিত দেবতার সন্ধান পেয়ে পরিতৃপ্ত হন।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ ১৩৭৭ সালে 'আর্য্য দর্পণে' প্রকাশিত শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী কর্তৃক 'অর্ধনারীশ্বর তত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধ এবং পৌষ ১৩৮১ 'প্রেম প্রবাহে' প্রকাশিত ডঃ শ্রীশ্রীজীব ন্যায় তীর্থ, এম, এ, ডিলিট মহোদয়ের 'অর্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি' ও 'শক্তি ব্রহ্মবাদ' নামক প্রবন্ধে উক্ত মূর্ত্তি বিষয়ক বৈদিক ব্যাখ্যা পাঠ করতে পারেন।

ইউরোপ ভ্রমণ।

রিষড়ার বহু কৃতি সন্তান অদ্যাবধি ইউরোপ ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে প্রধানতঃ শিক্ষালাভ উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। তাঁদের সকলের সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়। সে ত্রুটী অবশ্যই মার্জনীয়। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ দাঁ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০/২১ সালে তিনি হেষ্টিংস মিলের

চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পি, এন, দত্ত এণ্ড কোংএর পক্ষে (ইউরেকা বেল্টিং ওয়ার্কস) যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে বিলাত যাত্রা করেন এবং এই সুযোগে অনেক স্থান দেখে ও অনেক কিছু শিখে আসার সুযোগ পান। এরপর তিনি পুনরায় হেষ্টিংস মিলের বেল্টিং ডিপার্টমেন্টে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর বাইরেটা ছিল যদিও ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ভিতরটা ছিল কিন্তু খাঁটি হিন্দুয়ানীতে ভরা। দৈব পিতৃকর্মে ছিল তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। তাই তিনি সাগরপারে যাওয়ার জন্যে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করতে কুণ্ঠিত হননি। (শ্রীমন্দলাল চন্দ্রের সৌজন্যে)।

তারপর উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ২৬শে শ্রাবণ ১৩১৫ সোমবার। পিতা ৺হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৫ খৃঃ এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৩৬ সালে বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানে অবস্থান কালে ১৯৩৮ খৃঃ পর্যন্ত D. G. O. (D A B) F. R. F. P. S (Glassgo). L. M. (Rotterdom) M. R. C. P. (Adin) প্রভৃতি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে বৃটিশ আর্মিতে যোগদান করেন। ১৯৪২ খৃঃ তিনি সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হাতে বন্দী হন। তৎপরবর্ত্তী বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। তিনি আই, এন, এ, যুদ্ধবন্দী হিসাবে বিচারের পর মুক্তি লাভ ক'রে জার্ডিন এণ্ডারসন গ্রুপ মিলের চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার রূপে যোগদান করেন। ঐপদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। বর্ত্তমানে তিনি আড়িয়াদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল ও ডাঃ বিধান চন্দ্র শিশুসদন এবং ব্যারাকপুর চেষ্ট ক্লিনিকের সঙ্গে জড়িত। (শ্রীমনীন্দ্র আশের সৌজন্যে এবং ডাঃ শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন ক্রমে) বিভিন্ন কারণে তিনি এখন রিষড়ার সঙ্গে সংশ্রব হীন হয়ে পড়েছেন।

পঞ্চানন তলা ষ্ট্রীটে পূর্বোক্ত মুখোপাধ্যায় বংশের (পৃঃ ৩৩৯)

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানে অবস্থান কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন এবং একজন ফরাসী মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খৃঃ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বোম্বেতে রেডিওলজিষ্ট হিসাবে কিছুদিন চাকরী করেন। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চিকিৎসার্থ তিনি হল্যাণ্ডে গমন করেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বর্ত্তমানে তিনি 'কানাডায়' চিকিৎসা বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ডাঃ মুখার্জী প্রতিবৎসর রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারীকে 'কনকলতা পুরস্কার' প্রদান করে থাকেন।

এরপর দেওয়ানজী বংশের কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য :—
শ্রীকুমুদকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র :—

১। শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় :
১৯৬১ সালে লণ্ডনে গমন করেন এবং ফিলিপ্স সেলেসম্যান-সিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৮ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমানে সারাভাই কেমিক্যালের আণ্ডারে কেম্পিকো ডিভিসনে সেলস্ এক্জিকিউটিভ হিসাবে কার্য করেন।

২। শ্রীভবেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় :—
১৯৬১ সালে সাসেক্স রবার ফ্যাক্টারীতে এ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে কাজ করার পর Rubber Technologist হিসাবে পাশ করার পর দিল্লীতে একটি ইণ্ডিয়ান রবার ফ্যাক্টরীতে (Indo-German Collaboration) ম্যানেজার পদে অভিষিক্ত হয়ে আসেন। ৪ বৎসর কার্য করার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করে ক্রাউন রবার ফ্যাক্টারীর ম্যানেজার হিসাবে কার্যে ব্রতী আছেন।

৩। শ্রীপরমেশ মুখোপাধ্যায় ঃ—

১৯৬৯ খৃঃ ওয়েষ্ট বার্লিনে যান। সেখানে P. R O. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ত্তমানে ওয়েষ্ট জার্মানীতে কার্যে নিযুক্ত আছেন।

৪। শ্রীঅমরেশ মুখোপাধ্যায় :—

১৮-৯-৭৩ তারিখে ওযেষ্ট বার্লিনে গমন করেন এবং বর্ত্তমানে টেলিভিসান শিক্ষালাভে ব্রতী আছেন।

উক্ত বংশের শ্রীসত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযের পুত্র শ্রীবিজয় মুখার্জ্জী ১৯৬২ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থ ওয়েষ্ট জার্মানী Siegen Engineering Callege এ যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমানে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সাইনটিফিক্ গ্লাস কোম্পানীতে সেলস্-ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

তিনকড়ি মুখার্জী ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীসতীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীগণেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডাঃ প্রণব চ্যাটার্জীর ভ্রাতা) ১৯৫৭ সালে জার্মান একাডেমিক্যাল অর্গানাইজেসনের মাধ্যমে জার্মানীতে এবং ইংলণ্ডে গমন করেন। ডেভেলাপমেণ্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নোলজিতে উচ্চ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর ১৯৫৯ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর টাটাষ্টীল এণ্ড টিউব ইণ্ডাষ্ট্রিতে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে পুনরায় উক্ত কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁকে নূতন ধরণের শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। বর্ত্তমানে তিনি উক্ত ফার্মে এ্যাসিট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেটের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

এই প্রসঙ্গে উক্ত ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীরাধিকানাথ মান্নিকের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করে কটন টেক্সটাইল বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বর্ত্তমানে তিনি স্থানান্তরে থাকায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রসঙ্গে রিষড়া সেবাসদনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং পৌর সদস্য শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটকের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জন সেবা ও জনকল্যাণ কর্মসূচীগুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে ১৮/৬/৭০ তারিখে মস্কো যাত্রা করেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা--২৫/৬/৭০)

১৯৭২ সালের ২৪ শে আগষ্ট (তিনি তখন সি, এম, ডি এর সদস্য) পুনরায় সমাজ কল্যাণে বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা গমন করেন। (আনন্দ বাজার পত্রিকা-- ৩০/৮/৭২)।

শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোর ভ্রাতা) শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৭০-৭১ সালে বিলাতে এবং ১৯৭৩—৭৪ সালে আমেরিকায় প্রেরিত হন তত্তৎদেশীয় বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের জন্যে যাতে তাঁর অর্জিত জ্ঞান এবং সংগৃহীত তথ্যাদি শ্রীরামপুর কলেজ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কাজে লাগান যায়।

আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন গীর্জায় ভারতীয় হিন্দু ধর্ম্ম, বিবাহ পদ্ধতি এবং একান্নভুক্ত পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতির সহিত একত্র জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় উক্ত কলেজের হেড এ্যাসিট্যান্ট (administration) এবং অধ্যক্ষের স্পেশাল এ্যাসিট্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

উদীয়মান সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান।

এন, কে, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট নিবাসী সঙ্গীত শিল্পী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৺হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র) দীর্ঘকাল বহু খ্যাতনামা সঙ্গীত বিশারদগণের নিকট বিভিন্ন ঘরোয়ানার টপপা, গজল, রাগ-

প্রধান ও আধুনিক সঙ্গীত শিক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে প্রফেসর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন ঘোষাল, কালীপদ পাঠক এবং ওঃ বাদল খাঁর পুত্র বাচ্চু খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে ১৯৩৮ সালে প্রায় সকল বিষয়েই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেন এবং বহু পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বেতারে বিভিন্ন বিষয়ক সঙ্গীত পরিবেশন করার সুযোগ লাভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি একজন সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে সুপরিচিত। তিনি কিছুদিন একটি কালীকীর্ত্তনের দলগঠন ক'রে (কথায় ও গানে) রিষড়া এবং রিষড়ার বাহিরে বহু স্থানে সুনাম অর্জন করেন।

নবীন পাকড়াশী লেন নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (৺গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র) প্রথমে পণ্ডিত দৌলত রামের ছাত্র খড়দহের শ্রীপাঁচু গাঙ্গুলীর নিকট এবং পরে ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত সত্যেন ঘোষালের নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (খ্যাল) শিক্ষা করেন। তিনি বাহিরে কোথাও পেশাদার হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাই সত্য কিন্তু একনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গীত সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। 'বাটাসু কোম্পানীতে' তিনি একজন অফিসার হিসাবে ২৫ বৎসর চাকুরী করার পর বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন। "Singing is his pastime, rather his sole interest after work. Not light modern songs, a serious student of classical music, he sings khoyal and thumri and sings them well". (Bata Shoe Co :— Congratulation).

সঙ্গীত সমাজ ও সুর-স্মরণী

প্রধানতঃ সঙ্গীত শিল্পী শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডলের প্রচেষ্টায় এবং শশীভূষণ দাঁর পরিচালনায় রিষড়া সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠা

হয় ১৩৫৯ সালে। ১৯৫২ সালে প্রসাদ বসুর সভাপতিতে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় একটি সঙ্গীত জলসার উদ্বোধন হয়। ১৯৫৩ সালে ২১শে ও ২২শে মার্চ্চ উক্ত সঙ্গীত জলসার দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় রিষড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী পরিবেশিত রাগপ্রধান সঙ্গীতের রসাস্বাদনে স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

এই সঙ্গীত সমাজ পরিচালিত (কথা, গানে এবং চিত্র সমন্বয়ে) 'দশমহাবিদ্যা' এবং 'একাদশ মাতৃকা' কীর্ত্তন বহুস্থানে সুনাম অর্জন করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'দি রিষড়া ক্লাব' কর্তৃক রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্থানে স্থানে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সমন্বয়ে ইতিপূর্বে সঙ্গীত জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

ইং ১৯৫৫ খৃঃ (বাং ১৩৬২) 'সুর-স্মরণীর' প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানতঃ সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও অমিয় মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায়। তদবধি এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সমন্বয়ে কয়েকটি সঙ্গীত জলসাও অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ১৯৫৬ সালে ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীদুর্গাপদ দত্ত ও সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে শ্রীসুকুমার সেন, সঙ্গীত রত্নাকরের নামও উল্লেখযোগ্য।

সুভাষ চন্দ্রের অন্তর্ধান

দেশবরেণ্য নেতা সুভাষ চন্দ্রের অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহ ত্যাগের কথা সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হওয়ায় দেশবাসী সকলেই বিশেষ

ভাবে বিচলিত হন। ২৭/১/৪১ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিম্নলিখিত সংবাদটি :—

"গতকল্য অপরাহ্নে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর গৃহত্যাগের সংবাদে সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে সকলেই উৎকণ্ঠিত ভাবে জানিতে চাহিতেছে যে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু কোথায় ?

* * * *

তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে এই সংবাদ দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বসু তখন কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তি রিষড়ায় তাঁহার বাগান বাড়ীতে ছিলেন।' (আনন্দ সঙ্গী ১৯২২—১৯৭১)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় ১৯৩৮ সালে রিষড়া শ্যামনগর লেনে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি বাগানবাড়ী ক্রয় করেন এবং সময়ে সময়ে সস্ত্রীক ঐ বাড়ীতে এসে অবস্থান করতেন। এই বাড়ীটি সম্বন্ধে বহু রহস্যঘন সংবাদের উল্লেখ করেছেন শ্রীশিশিরকুমার বসু (শরৎ চান্দ্রের পুত্র) তাঁর রচিত 'মহানিষ্ক্রমণ' গ্রন্থে।

নেতাজীর অন্তর্ধান সম্বন্ধে পরবর্তিকালে বহুলেখক যে সমস্ত আলোকপাত করেছেন তা থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে নেতাজী সম্ভবতঃ জি, টি, রোড দিয়ে যাবার সময় রিষড়ার এই বাগান বাড়ীতে অগ্রজ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ছদ্মবেশে দেখা ক'রে যান।

যাইহোক, রিষড়ায় শ্যামনগর লেনের উক্ত বাগান বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান হেতু ২৫/২/৫০ তারিখের সভায় পৌর সদস্য-গণ দেশপূজ্য নেতা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে কেবলমাত্র শোক প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, উক্ত রাস্তাটির পূর্বনামের পরিবর্তে 'শরৎচন্দ্র বসু লেন' নামকরণ করেন।

বর্তমানে উক্ত বাড়ীটি এ. সি, আই-এর সম্পত্তি হিসাবে হস্তা-ন্তরিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে সারাটা পৃথিবী তখন থর্ থর করে কাঁপছে। এই অবস্থার মধ্যে দেখা যায় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের (আগষ্ট) 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। সেই আন্দোলনের ঢেউ রিষড়ার বুকে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি না করলেও ভারতের বুকের উপর ছুটে চলেছে রক্ত চক্ষু শাসক বর্গের গুলির আগুন। কঠোর দমন নীতির ফলে প্রতিদিন সাংবাদপত্র মারফৎ নেতাদের কারারুদ্ধ হওয়ার কাহিনী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন রিষড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীরাধারমণ লাল।

ইতি পুর্বেই প্রচারিত হয়েছে বিমান আক্রমণে পূর্ব সাবধনতা এবং পরীক্ষামূলক আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ইস্তাহার। বিশেষ করে কলকারখানা-বহুল শিল্পাঞ্চলে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে বিশেষভাবে আইন প্রস্তুত ক'রে দেওযা হয়েছিল। পূর্ব-বিঘোষিত সময় অনুযায়ী তীব্র সাইরেণ ধ্বনির মাধ্যমে উক্ত মহড়ার প্রয়োগ চলছিল এতদঞ্চলে। এ, আর, পি আর ব্ল্যাক আউটের প্রবর্ত্তনে জনগণ সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানও তখন হয়ে পড়েছিল সংক্ষুব্ধ ও সংকুচিত। রাত্রির অন্ধকারে মাঝে মাঝে সাইরেণ ধ্বনির ফলে সন্ত্রস্ত জননীরা শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে অসহায় অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছেন গৃহকোণে অথবা বাড়ীর নিকটবর্ত্তি ট্রেঞ্চের মধ্যে।

এই রকম বিভীষিকাময় আশঙ্কামূলক পরিস্থিতির মধ্যে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখের রাত্রে কলকাতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপানী বোমারু বিমাণ। ঘন ঘন গর্জ্জে উঠে বিমান বিধ্বংসী কামান। আকাশের বুক চিরে তীব্র আলোক বহ্নি ছড়িয়ে পড়ে ইতস্ততঃ বোমারু বিমাণের অন্বেষণে। সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা কলকাতা ছেড়ে. প্রাণভয়ে দলে দলে যাত্রা সুরু করে দেয় স্বদেশাভিমুখে। সারিবদ্ধভাবে জি,

টি, রোড ধরে চলেছে অগণিত নরনারী পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় নিয়ে, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

রিষড়ার স্বচ্ছল নাগরিকবৃন্দ দূরস্থ আত্মীয়বর্গের বাড়ীতে গোড়ে তোলেন পরিবার বর্গের অস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে অনেকেই তখন মোড়পুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে রাত্রি বাসের উপযোগী আশ্রয় সংগ্রহে উদ্যোগী। যুদ্ধের ভয়াল মূর্ত্তি সংবাদপত্র ছেড়ে তখন বাস্তব পটভূমিকায় নেমে এসেছে। নিদারুণ পরিণাম চিন্তায় সকলে তখন উৎকণ্ঠিত ও ভয়সচকিত। যুদ্ধারম্ভের চতুর্থ বৎসরেও তার অবসানের কোন আশার সঞ্চার দেখা দেয়নি।

নিখিলবঙ্গ পৌর সম্মেলন

উপরোক্ত যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই রিষড়া-কোন্নগর পৌর-সভার তত্ত্বাবধানে ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ রিষড়া উচচ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নিখিলবঙ্গ পৌরসংঘের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন তদানীন্তন স্বায়ত্ব শাসন বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্রী সন্তোষ কুমার বসু এবং দু'দিন ব্যাপী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা মহানগরীর মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম। রিষড়া ও কোন্নগরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ও পৌরসদস্যগণ সম্মিলিতভাবে অভ্যর্থনা জানান সারা বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার বহু মাননীয় অতিথিবর্গকে। পৌর প্রধান নরেন্দ্রকুমার অভ্যাগত সদস্যবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন পৌরবাসীদের পক্ষ থেকে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ অভিভাষণে রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভার সৃষ্টি কাল থেকে বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পৌরসমস্যাগুলি উপস্থাপিত করেন গভীর বিশ্লেষণ শক্তির গুণে। বর্ত্তমান অধি-বেশনটি পৌর সভার রজত জয়ন্তী উৎসব হিসাবে গণ্য ক'রে

তিনি সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নের সুবন্দোবস্ত করতে অভ্যর্থনা সমিতি সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটি করেন নি। এই অধিবেশনেই নরেন্দ্র কুমার নিখিলবঙ্গ পৌর সংঘের সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৫৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ এবং গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪২ সালের 'ভারতবর্ষে' [২৯ বর্ষ—২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা পৃঃ ৩৩৮] উক্ত অধিবেশন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং এই ধরণের বার্ষিক মিলন সভার প্রকৃত উপকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য সংযোজিত হয়। (শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই সময় থেকে সারা বাংলাদেশে (অবিভক্ত) নরেন্দ্র কুমারের সুনাম ও কর্মপ্রতিভা-শক্তি বিচ্ছুরিত হতে আরম্ভ করে তাই তাঁর শ্রাদ্ধ বাসরে পৌর কর্ম্মচারীগণ যে শোকগাথা রচনা ক'রেন তা থেকে প্রাসঙ্গিক কয়েকছত্র উদ্ধৃত হল :—

"তোমার প্রতিভা-গঙ্গা ছুটিল তরঙ্গ ভঙ্গে, কবি
কুলু কুলু ধ্বনি,
বাজিল গৌরবভেরি নিখিলবঙ্গ পৌর সভা মাঝে,
হে জ্ঞানী, হে গুণী,
তুমি বুঝেছিলে ঠিক বঙ্গ-জননীর মর্ম্ম-বেদনা
প্রাণের স্পন্দন,
তাইতো তোমারে ঘেরি মধুকরসম পৌরসংঘ
তুলিল গুঞ্জন।
উদ্ভাবনী শক্তি তব স্বায়ত্ব শাসনেরে দিল
নব নব রূপ,
শাণিত কৃপাণসম চালাইলে লেখনী তোমার
অতি অপরূপ।'

(শ্রাদ্ধবাসরে পৌর কর্মচারীবৃন্দের পক্ষে লেখক
কর্ত্তৃক রচিত শোকগাথার একাংশ)

দুর্গা পূজায় বিপত্তি।

সন ১৩৪৯ সালে (১৯৪২ খৃঃ) দুর্গা সপ্তমীর দিন দিবারাত্র ব্যাপী ঝড়ের তাণ্ডবে রিষড়ায় বহু পূজা মণ্ডপ বিধ্বস্ত ও প্রতিমা সমূহ লণ্ডভণ্ড হ'য়ে এক অভূপূর্ব বিপত্তির সৃষ্টি হয়। বিস্মৃত প্রায় প্রাচীন আশ্বিনে ঝড়ের কথা স্মরণ ক'রে লোকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে মাসিক বসুমতী-কার্ত্তিক, ১৩৪৯ (পৃঃ ১২৯) নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

"গত দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন বাঙ্গলার উপর দিয়ে প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে।··· ' '১৬ই অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন সকাল হইতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ঢাক ঢোলের বাদ্যে গ্রাম পথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীতে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইতে পারে নাই এবং বহু দরিদ্র লোকের যথাসর্বস্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

(ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ পৃঃ ৬১০)

পঞ্চাশের মন্বন্তর।

শারদীয়া দুর্গা পূজায় উক্ত বিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল ছায়া। যুদ্ধ জনিত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভাবের ফলে চারিদিকে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। গৃহ দ্বারে দেখা যায় অসংখ্য কঙ্কালসার নিরন্ন অর্দ্ধনগ্ন ভিখারীর দল। সামান্য একটু ফেন ভিক্ষা করেই সন্তুষ্ট। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে নীরবে নিরুপদ্রবে।

সেই স্মৃতি জাগিয়ে রেখে গেছেন ৺সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর নিম্ন-লিখিত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে :—

'শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত
মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার ?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?"

এ, আর, পি, সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক 'গ্রুয়েল কিচেন বা 'লঙ্গর-খানা খুলে অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষের মুখে একহাতা কদন্ন তুলে দেবার ব্যবস্থা করেন। বিস্মৃত প্রায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে এক আতঙ্কের ভয়াবহ চিত্র। দেশ বরেণ্য নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ — 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে' কঠোরভাবে মন্তব্য করেন সরকারী অব্যবস্থার। এই সুযোগে একদল অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি ক'রে নির্লজ্জভাবে মুনাফা লুটতে থাকে। সেই দুঃখ দুর্দশার কথা আজ প্রায় সকলেরই স্মরণে আছে।

* * * *

আমেরিকান এয়ার-বেস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি যখন ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে তখন রিষড়া হেষ্টিংস মিলের কাজকর্ম বন্ধ ক'রে দিয়ে আমেরিকান এয়ারবেস স্থাপিত হয়। অসংখ্য কলকব্জা, যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করা হয় অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে। মেসার্স এ্যাণ্ড্রুস কোম্পানী

তখন হেষ্টীংস মিলের স্বত্বাধিকারী, শ্রমিক কর্মচারীদের সামান্য অংশ মাত্র পার্শ্ববর্ত্তী ওয়েলিংটন জুটমিলে চাকুরীতে বহাল হন, বাকি সকলেরই ঘটে কাঁটাছাঁটি। এতবড় চটকলের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সকলকে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত ক'রে তোলে। বিমান-আক্রমনের সম্ভাবনা যেন আরও নিকটতর হয়ে উঠে। আকাশের বুকে দিবা–রাত্রি ছোটাছুটি করতে থাকে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধ বিমান।

রিষড়ায় মিত্রপক্ষের বিমান পোতাশ্রয় গোড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তৎকালীন 'এয়ার কমাণ্ডার' যে কারণ লিপিবদ্ধ করেন এই প্রসঙ্গে তার কতকাংশ উল্লেখযোগ্য :—

'Early in 1944, Lt Gen. George E. Stratemeyer, Air Commander of the Allied Eastern Air Command and Comanding General of the Army Air Forces in this Theater, felt it necessary to move his head quarters from Delhi to a locale neaer the Burma battle-fronts. Calcutta being the ideal location, Hastings was selectad as the site for new Readquarters. This proximity made possible plane trips. of short duration, to all operational Bases in India.... ..

The population of Hastings since its inception as A. A. F. Headquarters has been approximately six thousand. · · added to this figures are the more than four thousend Indian men and women, who have worked in clerical and domestic capacities. Over eight thousand meals are served daily at the Mill'

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এই বিমানপোতাশ্রয়ের বিশালতা

এবং বিপুল কার্য তালিকার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা রাসয়ানিক দ্রব্যাদির সাহায্যে মশা মাছি প্রায় নির্মূল করে তোলেন। পূর্বাহ্নে ইস্তাহার বিতরণ ক'রে আকাশ পথে বিমান থেকে ছড়ান হতে থাকে রসায়নিক পদার্থ। উপরোক্ত ব্যবস্থা তাঁদের স্বাচ্ছন্দ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত হলেও এতদঞ্চলের অধিবাসীরা তার সুফল ভোগ ক'রে বিশেষভাবে উপকৃত হন এবং বিমুগ্ধ হন অজস্র অর্থব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সার্থককতা দর্শনে। রিষড়ার অগনিত পুকুর ডোবা তাঁদের নিযুক্ত লোক দ্বারা বহুদিন-সঞ্চিত জলজ উদ্ভিদ ও পানা মুক্ত হয়ে একটা স্বচ্ছ সুন্দররূপ ধারণ করে।

আমেরিকান সৈনিকদের আবাসকেন্দ্রে এবং পোড়ামাঠে বিভিন্ন প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা থাকলেও, দুর্বিণীত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, নিয়মভঙ্গকারী এক শ্রেণীর সৈনিক এতদঞ্চলের কুখ্যাত পল্লীতে ব্যাভিচারের স্রোত বইয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করেনি। অর্থের লোভে মানুষ হয়ে ওঠে সমাজ বিরোধী কার্যে অভ্যস্ত। হারিয়ে ফেলে সামাজিক চেতনা, নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে এসে যায় অস্বাভাবিক অর্থের বিপুল ভাণ্ডার। অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে রাতারাতি ধনকুবের হ'য়ে উঠার কৌশল আয়ত্ব ক'রে ফেলে। অপর দিকে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে জন সাধারণ জর্জরিত ও নিষ্পেসিত হতে থাকেন।

রেসন প্রথার প্রচলন।

উপরোক্ত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে শিল্পসংস্থাগুলি শ্রমিক ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট ন্যায্যমূল্যে প্রধান প্রধান খাদ্যবস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন কারণ পশ্চিমা শ্রমজীবির দল তখন অবস্থা

বিপাকে এবং প্রাণভয়ে দেশে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমেরিকার এয়ার-বেস স্থাপন মানেই এখানে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ একপ্রকার সুনিশ্চিত। যতই কেন গৃহাদির রং কালো করা বা অন্যান্য প্রকারে ছদ্মবেশ ধারণের চেষ্টা হক না কেন ; এখানকার অসমারিক অধিবাসীদের ধ্বংস অনিবার্য এ ধারণা তাদের পেয়ে বসেছিল। অবস্থা বিপাকে পৌরসভাও তার শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বল্পমূল্যে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে দ্রব্যমূল্য জনিত ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করেন।

সরকারও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কল্পে আংশিক রেসনিং প্রথা চালু করতে বাধ্য হন। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হয় - খাদ্য বস্তুর অপচয় নিবারণ উদ্দেশ্যে। পেট্রোলের রেসনিং পূর্ব্বেই চালু করা হয়েছিল।

এতদিন যা ছিল চট বা থলে বা বোরা তারই নানা সাইজের ছোটবড় ব্যাগ তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রী হতে আরম্ভ করে— নাম হয় 'রেসন-ব্যাগ'। চাহিদা ঘরে ঘরে, সব পরিবারে। কয়লা, কেরোসিন, কাপড়, চিনি সবই রেসনিং প্রথার আওতায় এসে যায়। হুগলী জেলা শাসক মিঃ আর, কে, রায় ১৮-১১-৪৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চাল ও ধানের মূল্য নিম্নলিখিত হারে নির্দ্ধারিত করে দেন :—

তারিখ।	চালের সর্ব্বোচ্চ মণ প্রতি পাইকারী মূল্য।		ধানের সর্ব্বোচ্চ মণপ্রতি পাইকারী মূল্য।	
	ব্যবসায়ীরা	কৃষক ও চালের কলওয়ালা।	ব্যবসায়ীরা	কৃষকরা।
১৫ই জানুয়ারী হইতে পুনরায় নোটীশ না দেওয়া পর্যন্ত।	১৫৲	১৪৷৹	৯৲	৮৷৷৹

উপরোক্ত সর্ব্বোচ্চ ধার্য্য মূল্যের অতিরিক্ত দামে কেহ খরিদ

বিক্রয় করিলে তা'রতম্যক্ষা আইনের বিধান মতে দণ্ডনীয় হইবে। ... ইহার কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হইতে কোন বাধা নাই।'

আজাদ হিন্দ বাহিনীর গুজব।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র কর্তৃক উক্ত বাহিনী গঠনের (I. N. A.) সংবাদ প্রায় অনেকেরই কানে আসে কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সুকৌশলে সে সমস্ত তথ্য ধামাচাপা দেন, বেতারে স্থানীয় সংবাদ মারফৎ মিত্রবাহিনীর যুদ্ধে জয়লাভের কথাই কেবলমাত্র প্রচারিত হতে থাকে। অন্যান্য সংবাদ তখন চেপে দেওয়া হয়। সরকার থেকে তখন প্রচার পত্র মারফৎ 'গুজবে কান দেবেন না,' 'দেওয়ালেরও কান আছে,' প্রভৃতি নানাবিধ সাবধানবাণী ঘোষিত হতে থাকে।

'পঞ্চাশের মন্বন্তরে যখন ৫৫ লক্ষ বাঙালী এক মুঠো ভাতের অভাবে, এক ফোঁটা ফ্যানের অভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরে ... তখন আজাদ হিন্দ্ সংঘ সিংগাপুর থেকে বেতারে ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলার এই চরম বিপদে বার্মার যে কোন বন্দর থেকে তাঁরা একলক্ষ টন চাল পাঠাতে প্রস্তুত আছেন, বৃটিশ সরকার যদি দয়া ক'রে বাংলা দেশে পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ সরকার এ রকম দয়া করেন নি।'

'মুক্তি যুদ্ধে বাঙালী'—শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বতন্ত্র রিষড়া পৌর প্রতিষ্ঠান।

১৯১৫ সাল থেকে কয়েকটা বছর যৌথ ভাবে 'রিষড়া-কোন্নগর পৌর সভার কার্য নির্বিবাদে চলার পর ১৯৩৭ খৃঃ তদানীন্তন পৌর সভাপতি নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রিষড়া ১ নং ও ২ নং (বস্তি অঞ্চল) ওয়ার্ডের ড্রেনেজের উন্নতি কল্পে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ফলে কোন্নগরের

করদাতাগণ স্বতন্ত্র পৌরসভা গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করায়, রিষড়ার করদাতা সমিতি 'হেমচন্দ্র দাঁ স্মৃতিমন্দিরে' ২৬/৯/৩৭ তারিখে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কোন্নগরের অধিবাসীদের ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি না করার জন্যে পৌর সভার সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ জানান। যৌথ পরিবার যেমন ক'রে ভাঙ্গে ছোটখাট ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে তেমনই কোন্নগর বিচ্যুত হয়ে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে স্বকীয় স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক আগ্রহে। সরকার বাহাদুরও সম্মতি দিলেন ৫/১২/৪২ তারিখের ১৩৩ সি, এম, নং বিজ্ঞপ্তি মারফৎ।

গঠিত হল বিভাগ বণ্টন কমিটি। আঞ্চলিক অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া ধন সম্পত্তির ৫৭·৫ শতাংশ পেলেন রিষড়া আর বাকি ৪২·৫ শতাংশ নিয়ে গেলেন কোন্নগর। রিষড়া পৌরসভা রয়ে গেল রিষড়া আউট পোষ্টের বিপরীত দিকে ভাড়া বাড়ীতে (বর্তমান নার্সিং হোম), কোন্নগরকেও নূতন ক'রে ঘর সংসার পাততে হ'ল ভাড়া বাড়ীতে।

পরবর্ত্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের দু'জন সদস্যসহ মোট তেরজন সভ্য মনোনীত হলেন অস্থায়ী ভাবে কার্য পরিচালনার জন্যে। ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে নবগঠিত রিষড়া পৌর সভার প্রথম অধিবেশন হল সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে। জয়যুক্ত হলেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায় ও ডাঃ প্রাণতোষ সাহা। রিষড়া বাসী নূতন ব্যবস্থার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। ১৯৪৫/৪৬ সালের পূর্ণ সম্বৎসরে মোট আয় হয়েছিল ৫৫০০০৲ টাকা আর ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮০০০৲ টাকায়। পৌর-সীমা উত্তর, পুর্ব ও পশ্চিম দিকে অপরিবর্ত্তিতই রয়ে গেল, কেবল মাত্র দক্ষিণ দিকের সীমানা নির্দ্ধারিত হল বাগের খালের দক্ষিণ সীমা। উক্তখাল দিয়ে অবশ্য কোন্নগরের জল নিকাশের অধিকার রয়ে গেল।

পৌর সভার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। তিন তিনটা বড় বড় জুটমিল এবং অ্যালকেলি কেমিকেলের মত বৃহৎ রাসয়ানিক কারখানা বিরাজ করতে লাগল রিষড়ার সীমানার মধ্যে, তাদের অসংখ্য শ্রমিকদের আবাসিক নিবাসের অস্তিত্ব নিয়ে।

যে তেরজন মনোনীত সদস্যগণ পৌর কর্ণধার হিসাবে কার্য-ভার গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন :— ১) শ্রীনরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ. বি, এল। ২) ডাঃ প্রাণতোষ লাহা, এল এম, এস। ৩) মিঃ কে এস, জ্যাকসন। ৪) মিঃ জে, পি, স্যাংষ্টার। ৫) সর্ব্বশ্রী প্রমথ নাথ দাঁ। ৬) লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি, ৭) কুমুদকান্ত মুখোপাধ্যায় বি, এ। ৮) ধীরেন্দ্র নাথ লাহা বি, এল। ৯) রাধারমণ লাল। ১০) লক্ষ্মণ চন্দ্র সাধুখাঁ। ১১) মৌলভী সেখ ইব্রাহিম। ১২) ইব্রাহিম খাঁ এবং ১৩) শীতলু সর্দার।

পৌরসভার প্রথম নির্বাচন

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রিষড়া পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন শেষে ৩১/৭/৪৫ তারিখের সভায় যথাক্রমে শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ সভাপতি এবং শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ছিল মোট ১২ জন।

উক্ত নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ২/৮/৪৫ তারিখের রাত্রে নব-নির্ব্বাচিত পৌরসদস্য শ্রীযোধম সিং ঘুমন্ত অবস্থায় অজ্ঞাত আত-তায়ীর নির্মম আঘাতে নিহত হন। এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না পেয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং অপর কয়েকজন পৌর সদস্যদের নিয়ে যে কলঙ্কময় অপবাদের সৃষ্টি হয় তা ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য নয়। পুরুষ-সিংহ যোধন সিংয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তাটি

যোধন সিং রোড নামে অভিহিত হয় এবং পৌর সভাকক্ষে স্থাপিত হয় তাঁর আবক্ষ প্রতিকৃতি। তিনি ছিলেন বস্তি অঞ্চলের করদাতা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং একজন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি।

নবনির্বাচিত পৌরসভাপতি শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় পৌর শাসন ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা স্বত্ত্বেও আন্তরিক নিষ্ঠা ও পক্ষপাতিত্বহীনতার সঙ্গে যে ভাবে যুদ্ধোত্তর অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে কার্য পরিচালনা করেন এবং পৌরসভার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হন তা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি হঠাৎ পদত্যাগ করায় পৌরসদস্যগণ ২৯/১১/৪৭ তারিখের সভায় সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং ১৫-১২-৪৭ থেকে ২৭-১-৪৮ পর্যন্ত শ্রীলক্ষ্মী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি অস্থায়ীভাবে কার্য চালিয়ে যান। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভার মনোনীত সদস্যগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন কারণ (Act XI of 1947) অনুযায়ী মনোনয়ন প্রথা রহিত ক'রে দেওয়া হয়। ২৭/১।৪৮ তারিখের সভায় শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ পুনরায় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রাধারমণ লাল সহসভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর পৌরপ্রধান বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে পৌর কর্মচারীবৃন্দ রিষড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সমবেত করদাতাগণের সম্মুখে তাঁর হাতে তুলে দেন বিদায় অভিনন্দন পত্র। তাঁর বহু সদগুণ এবং পৌরচালন ব্যাপারে যোগ্যতার উল্লেখ ক'রে তাঁর সুখ সমৃদ্ধ দীর্ঘ জীবন কামনা করেন এবং বিনামূল্যে আমেরিকান এয়ার বেসের নিকট থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্যে একখানি ট্রাক সংগ্রহ এবং পৌরসভার নিজস্ব গৃহনির্মাণোপযোগী ভূমি সংগ্রহের কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

১৩৬৩ সালের গৌর পূর্ণিমার দিন তাঁর সংকলিত 'প্রেমের

ঠাকুর' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদি-লীলা বর্ণনাই হল এই গ্রন্থের প্রাণবস্তু। দ্বিতীয়খণ্ডে মনোনিবেশ ক'রে তিনি এক আশ্রমতুল্য উদ্যান কুটিরে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পৌরসদস্যবৃন্দ ৩১। ৩। ৬২ তারিখের সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাটির নিকটবর্ত্তী রাস্তাটি 'বটকৃষ্ণ ঘোষ লেন' নামে অভিহিত করেন।

প্রসঙ্গতঃ তাঁর সহকর্মী পূর্বোক্ত পৌরউপপ্রধান শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি ছিলেন রিষড়ার একটি প্রাচীন বংশের সন্তান কিন্তু মিলিটারী একাউন্টস্ বিভাগে দীর্ঘকাল চাকুরী করার জন্যে রিষড়ার বাইরে অর্থাৎ মীরাট প্রভৃতি অঞ্চলে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবসর প্রাপ্ত জীবনে রিষড়ায় অবস্থানকালে তাঁকে অধিকাংশ সময়েই ভাড়া-বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল যদিও মোড়পুকুর অঞ্চলে বহু জায়গা জমি অবস্থিত ছিল, যার অধিকাংশই কলকারখানা স্থাপন উপলক্ষে বিক্রী হয়ে যায়। তাঁর মধ্যমা কন্যার বিধবা বিবাহ হয়েছিল বলে শোনা যায়।

শ্বেত শ্মশ্রুধারী গৌরবর্ণ এই প্রবীন ছিলেন একজন রসজ্ঞ ব্যক্তি এবং বহু জ্ঞানগর্ভ ছোট ছোট গল্পের রাজা। রিষড়ার বহু প্রাচীন কাহিনী ছিল তাঁর পরিজ্ঞাত। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ৺শম্ভুনাথ ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা। ৪। ১। ৫৬ তারিখে তিনি পরলোক গমণ করায়, পৌর সদস্য-গণ ২৮। ১। ৫৬ তারিখের সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সাইকেল রিক্সা প্রচলন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের গোড়া থেকেই এতদঞ্চলে সাইকেল রিক্সার প্রচলন আরম্ভ হয় কিন্তু সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৯৪৫

খৃঃ থেকে পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাইসেন্স (চালক ও অধিকারী উভয় প্রকার) প্রদত্ত হতে থাকে এবং সেই সময় দূরত্ব ও সময় অনুযায়ী ভাড়ার হারও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৯১৯ খৃঃ থেকে পৌরসভার মধ্যে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর লাইসেন্স ব্যবস্থা চালু হয়েছিল (Calcutta Hackney Carriage Act, 1919) was extended except S. 6 (1) by Notification u/s. 2(a) of the Act to Rishra, Konnagar etc. কিন্তু সাইকেল রিক্সার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে এই সমস্ত ঘোড়ার গাড়ীর অস্তিত্ব ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। স্বল্পাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার ঘোড়ার দলও মুক্তি পায় শকটবহনের কঠিন পরিশ্রম থেকে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষুরের সেই ছন্দে বদ্ধ চলার তাল, সহিসের হুঁসিয়ারী, কোচোয়ানের ঠন্ ঠন্ বেলের শব্দ আর পেতলের বাতিদানের মধ্যে কাঁপা কাঁপা মিটমিটে তেলের আলোর ক্ষীণরশ্মি। শেষ হয়ে যায় প্রাচীন ঐতিহ্যের শেষচিহ্ন টুকু।

নূতন রিক্সাচালকদের কাছে রিষড়া দেওয়ানজী স্ট্রিটে ১৯৪৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত 'মুখার্জি হোসিয়ারি' নামক গেঞ্জিকলটি সুপরিচিত হয়ে উঠে, কারণ এতদঞ্চলে এধরণের যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল একক ও অনন্য এবং তার অভিনবত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বুকে সংঘটিত অমানুষিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মানুষের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত ও বিপদগ্রস্ত হ'য়ে উঠে। উভয় সম্প্রদায়ের বহুমূল্যবান জীবন বিনষ্ট হয়ে রেখে যায় তার অপূরণীয় ক্ষতচিহ্ন। ইতিহাসে কলঙ্কিত এই জঘন্যতম ভ্রাতৃ হত্যায় বিচলিত হয়ে পৌরসদস্যগণ তাঁদের ৭/৯/৪৬ তারিখের সভায় নিম্নলিখিত নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে উভয় সম্প্রদায়ের

নেতৃবর্গকে শান্তি স্থাপনের অনুরোধ জানান :— Before Commencennat of the meeting the Chairman referred to the recent communal riots in Calcutta and moved the following resolution which was adopted unanimously :—

'This meeting of the Commissioners of the municipality deeply deplores the recent tragic happenings in Calcutta and places on record its deep sense of horror and abhorrence for the great killing of innocent men, women and children of all communities and the unbridled loot and arson that took place on the 16th August and afterwards, at Calcutta and its neighbourhood ... '

১৯৪৪ সালের ২১শে এপ্রিল শনিবার রিষড়া শহীদ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ লালের আহ্বানে তদানীন্তন মন্ত্রীবর হুসেন সহিদ সুরাবর্দী এম, এ, (কেম্ব্রিজ) বার-এট-ল যখন এসেছিলেন শহীদ আশ্রম প্রভৃতি পরিদর্শনে তখনও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব ছিল অক্ষুন্ন। তনখও জিন্না সাহেবের দ্বিজাতি তত্ত্বের কূট তর্কে মানুষের মন বিষিয়ে উঠেনি, জাগেনি কোন সংশয়। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি সেদিন ছিল সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। দ্বিখণ্ডিত ভারতের চিত্রও ছিল সেদিন স্বপ্নের অগোচর।

আজাদহিন্দ বাহিনীর বন্দীমুক্তি

সংবাদপত্র মারফৎ রটে গেল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ। সংশয়াকুল মানুষের মন এ সংবাদে

বিচলিত ও বিষন্নতায় ভরে উঠে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য হয় ইংরেজের হাতে বন্দী। দিল্লীর লাল কেল্লায় শুরু হল তাঁদের বিচার। জয়হিন্দ ধ্বনীতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। এই সমস্ত দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্তির দাবী জানাল সারা ভারত। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মুক্তি পেলেন বীর সেনানীর দল। রিষড়ার উদীয়মান প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায় D. G. O, M. R. C. P (Adin) মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন রিসড়ায় সৈনিকের পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে। ব্যায়াম সমিতি তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানালেন ৩/৩/৪৬ তারিখে। ডাঃ ব্যানার্জি আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের বিচিত্র ইতিহাস শোনালেন উপস্থিত অভিনন্দন কারীদের। বিস্মিত হল শ্রোতৃবর্গ। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনমিত হ'য়ে পড়ল জনচিত্ত। সমস্বরে উচ্চারিত হল 'জয়হিন্দ ধ্বনি। মিথ্যা গুজব সৃষ্টিকারীদের ধিক্কার দিয়ে উঠল তরুণের দল স্বাধীনতা লাভের অদম্য উৎসাহে নেচে উঠল তাদের শিরা উপশিরা। ধমনীতে প্রবাহিত হল তপ্ত রক্তের স্রোত।

রিষড়া পৌরসভাও নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। ক্রাভেন রোড়ের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে 'নেতাজী সুভাষ রোড নামকরণ ক'রে। সেই থেকেই শুরু হ'য়ে গেল ইউরোপীয় নাম পরিবর্ত্তন ক'রে স্বদেশীয় নাম পত্তনের পালা।

হুগলী জেলার ইতিহাসে (৩য় খণ্ড) শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় ডাঃ শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখেছেন:
'এই স্থানের একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। সেনা বিভাগের ডাক্তারী করিতেন এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হাতে বন্দী হন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন আই-এন-এ গঠন করেন তখন তিনি তাঁর অন্যতম সহকর্মী হিসাবে আই-এন-এতে যোগ দান করেন ও কর্ণেল হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ইংরাজ সরকার যে সকল ভারতীয়দের 'লালকেল্লায়' বিচার

করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের জন্য তাঁহারা মুক্তি পান। শৈলধন বন্দ্যোপাধ্যায় রিষড়ার এক-জন কৃতী ব্যক্তি ও সমাজসেবী হিসাবে খ্যাত। তিনি জার্ডিন হেণ্ডারসন জুটমিল গ্রুপের মেডিকেল অফিসার হিসাবে কার্য করেন। ইহার পূর্বে কোন ভারতীয় এই পদ লাভ করেন নাই।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বর্ত্তমানে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় পৈতৃক বাস ভূমির সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় কিছুদিন পরে রিষড়ার নবীন অধিবাসীরা তাঁকে হয়তো রিষড়ার সন্তান বলে আর মনে করতেই পারবেন না।

স্বাধীনতার বিজয় ভেরি।

দীর্ঘ দু'শতাব্দী পর ইংরেজী শাসনের অবসানে ভারত গগনে উদিত হল নবারুণ রাগে স্বাধীনতা সূর্য। ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার ১৯৪৭ কে অভিনন্দন জানাল দেশের নরনারী।

রাজনৈতিক পাশাখেলার ফলে সংঘটিত হল ভারত তথা বাংলার অঙ্গচ্ছেদ। ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক 'সার্বভৌম রাষ্ট্র' বলে ঘোষিত হল। অখণ্ড বাংলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে জন্ম নিল পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা বহন ক'রে ছাত্রছাত্রীর দল প্রভাতফেরি সহকারে নগর পরিভ্রমণ ক'রে সমবেত হল রিষড়া 'হেমচন্দ্র দাঁ স্মৃতি মন্দিরে'। স্বাধীনতা উৎসবে ছাত্রগণকে উৎসাহিত ক'রে দেশ মাতৃকার উপযুক্ত স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিজেদের গোড়ে তোলার আহ্বান জানালেন উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়।

পৌরসভা কর্ত্তৃক পৌরপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যা-লয়গুলির ছাত্রবৃন্দকে মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা করা হল।

যে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির জন্যে কত তরুণ ও যুবক লাঞ্ছিত হয়েছিল ইংরেজের লাঠির আঘাতে, বুক পেতে দিয়েছিল গুলির মুখে, আজ মুক্ত কণ্ঠে সেই বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে লাগল প্রতিটি গৃহশীর্ষে।

অপরাহ্নে হুগলী জেলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মহাশয় জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন ক'রে সংক্ষেপে বিবৃত করলেন স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ইতিহাস। ওজস্বিনী ভাষায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন আবালবৃদ্ধ বনিতাকে। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত 'জয়হিন্দ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

বৈকালীন জন সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন কারা ও রাজস্বমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভী আবদুল সত্তার।
(আমন্ত্রণ লিপি দ্রষ্টব্য— শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্য)

সন্ধ্যায় বেতার মারফৎ প্রচারিত হল সর্বজনপ্রিয় সেই গানটি :

"বল বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" ইত্যাদি

গৃহে গৃহে আলোক সজ্জা ক'রে দেশবাসী জানালেন তাঁদের স্বতস্ফূর্ত আনন্দের উচ্ছাস। এই দিনটির স্মারক হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হল তিনখানি স্মরনিকা ডাক টিকিট, ৬ পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনা মূল্যের। (ডাক টিকিটের জন্মকথা - শচীবিলাস চৌধুরী)।

বেঙ্গল টাইম বা ক্যালকাটা টাইমের পরিবর্তে দেখা দিল ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। ভারতবর্ষ ব্যাপী সব ঘড়ির কাঁটা এক সঙ্গে ঘুরতে আরম্ভ করল একই তালে ও একই ছন্দে। পঞ্জিকার গণনাও গেল সেই মত উল্টে পাল্টে।

উদ্বাস্তু সমাগম

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার ফলে সুসংবদ্ধ লৌকিক ও অর্থনৈতিক সমাজ হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে পড়ল। অকস্মাৎ দেশ জুড়ে দেখা গেল বিপুল শূণ্যতা রাষ্ট্রিক জীবনে বিরাট ফাটল। এ ফাটল কোন ভূমিকম্পের ফলে মাটির ফাটল নয়, এ হল সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনের ফাটল। তারা বুঝলেন কালচক্র হঠাৎ গতি পাল্টেছে, এখানে জীবন না গেলেও ধন মান নিয়ে বসবাস করা অসম্ভব। তাই জনতার স্রোত পদ্মা ছেড়ে গঙ্গার দিকে চলতে সুরু করে দিল। "যাহাদের অবলম্বন করিয়া চাষী, মজুর, জেলে, তাঁতী, নাপিত, নমঃশুদ্রের দল সমাজের চাকাকে সচল রাখিবে, মুচিমেথর, গ্রাম্য পুরোহিত, পাঠশালার শিক্ষক প্রভৃতি নানা বৃত্তির নানা স্তরের মানুষ গ্রাম্য জীবন গতিশীল ও প্রাণবন্ত রাখিবেন—তাঁহারাই আজ সর্বাগ্রে দেশান্তরী হইলেন। পুরুষানুক্রমিক বাসভূমি ভয়ে ও ভাবনায় পিছনে ফেলিয়া নিরুদ্দেশের পানে ছুটিয়া চলিলেন।"

বিরল বসতি ঘন বৃক্ষরাজি শোভিত নিঃশব্দ মোড়পুকুর অঞ্চলে তাই হঠাৎ দেখা গেল নূতন প্রাণ সঞ্চার। নির্জন প্রান্তর ও জলাভূমিতে একের পর এক গড়ে উঠতে লাগল নূতন নূতন জনবসতি। এঁদের পথ প্রদর্শক হলেন বিশ্বপরিবার কলোনী :—

"১৯৪৮ খৃঃ শ্রীমৌলীভূষণ দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে ও সহায়তায় ৺বিনোদ বিহারী কর গুটিকতক উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশ্রীমা-দাদার ধ্যানের 'বিশ্বপরিবার' গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার মূলকথা হল বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমাতৃত্ব রিষড়ায় নব বসতির সূচনা প্রধানতঃ এখান থেকেই। তারপর ধীরে ধীরে এল বাঙ্গুর কলোনী, চারুনগর, গভর্ণমেণ্ট কলোনী, রেলওয়ে কো-অপারেটিভ

কলোনী, রামকৃষ্ণ সারদা পল্লী, 'সাধন কানন,' মায়া কানন, লক্ষ্মী পল্লী, সুভাষ নগর, নবীন পল্লী ইত্যাদি। পচা ডোবা ও দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে গড়ে উঠেছে নব বসতি, গত দশ বছরে যে সব নব নব বসতি গড়ে উঠেছে রিষড়ার বর্তমান উন্নয়নের ইতিহাসে তার প্রভাব এবং দান এবং মিল কারখানাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ষ্টাফ্ কোয়াটার্স, ক্লাব ইত্যাদি গড়ে উঠেছে তাতে জন সাধারণ প্রত্যক্ষ ভাবে লাভবান না হলেও তার পরোক্ষ ফল অনস্বীকার্য।" (শান্তিরঞ্জন দাস—রিষড়া পৌরসভা সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা)

"মনে পড়ে ১৯৫০ সালের কথা। হাওড়া থেকে রেলগাড়ী আমাকে নিয়ে এল প্রায় পঞ্চাশ মিনিটে। প্ল্যাটফরমে কেরোসিনের বাতি টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল পশ্চিম দিকে যেখানে ঝিলের তীরে গুটি কয়েক লোক একটি হ্যারিকেনের আলোতে ঢাকের বাজনার সংগে সংগে নাচানাচি করছে। সামনে তাদের বিশ্বমাতার মূর্তি। বন্ধুর নির্দ্দেশে গেলাম এখানেই, নাম তার বিশ্বপরিবার।"

১৯৪৬ সালে 'ক্যালকাটা প্রপার্টিজ' নামক প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছিল ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটের দক্ষিণ পার্শ্বে বিরাট ভূমিখণ্ড, তার অধিকাংশই ছিল পান বরজ ও বাগান। উদ্বাস্তু আগমনে কলকাতার উপর জন সংখ্যার চাপ কমানর জন্যে তখন চলছে নূতন নূতন কলোনী স্থাপনের প্রচেষ্টা। দু'বছর ধরে বহু অর্থব্যয়ে এই জঙ্গলাকীর্ণ অসমতল ভূমি খণ্ড পরিণত হল বাঙ্গুর কলোনীতে। মধ্যস্থলে স্থাপিত হল আধুনিব ধরণের বিস্তৃত পার্ক। পাকা ড্রেন ও রাস্তা সমেত এই বিস্তীর্ণ পার্ক পৌরসভাকে হস্তান্তরিত করা হল ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। বহিরাগত বিশিষ্ট জনগণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল এই উন্মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্র। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল ধনী ও মধ্যবিত্তদের সৌধ শ্রেণী। স্থাপিত হল বাঙ্গুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পার্কের সৃষ্টি।

বাঙ্গুর পার্কের নাম আজ সর্বজন পরিচিত এবং গত কয়েক বৎসরে একক দশক করে বর্ত্তমানে অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। পার্কের দক্ষিণাংশও ক্রমশঃ লোক বসতিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে দুঃখের বিষয়, নাগরিক কর্ত্তব্য বোধের অভাবে এবং জনসার্থ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে বাঙ্গুর পার্কের শোভা বর্দ্ধন কারী মূল্যবান পুষ্পবৃক্ষ সকল আজ অন্তর্হিত এবং শ্রীভ্রষ্ট।

১৯৬৩ সালের ৮ই জুন শ্রীরামপুর রোটারি ক্লাবের আনুকুল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ রোডের দক্ষিপার্শ্বে নির্মিত শিশু-প্রমোদ উদ্যানের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রোটারিয়ান এ রহিম খাঁ গভর্ণরের পৌরোহিত্যে। পৌরসভা প্রদত্ত ক্ষুদ্র ভূমি খণ্ডের উপর স্থাপিত এই পার্কটি বিভিন্ন সাজ সরঞ্জামে সুশোভিত ও সুদৃশ্য করে তুলতে রোটারি ক্লাব চেষ্টার ত্রুটি করেননি। নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে রেজেষ্ট্রি-কৃত দলিল মারফৎ এই পার্কটির রক্ষণা বেক্ষণের ভার পৌর সভার হস্তে প্রদত্ত হয় এবং নব নির্বাচিত পৌর প্রধান ডাঃ নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় পৌরসভার পক্ষে ধন্যবাদের সঙ্গে এই মহৎদান গ্রহণ করেন।

পর বৎসর ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে স্বর্গীয় নারায়ণ দাস মল্লিক মহাশয় প্রদত্ত জমির উপর পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্মিত শিশু প্রমোদ উদ্যান সাধারণের ব্যবহারার্থ উন্মুক্ত হয়। নারায়ণ রাধারাণী নামধেয় এই উদ্যানটি নির্মান কল্পে আজন্ম শিক্ষাব্রতী নারায়ণ দাস মল্লিক মহাশয় জি,টি, রোডের পার্শ্বে এই মূল্যবান জমিটুকু দান করেন তাঁর প্রিয় ছাত্র সমাজের খেলাধূলার উদ্দেশ্যে। স্বল্পবিত্ত স্কুলশিক্ষকের ছাত্র প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই মহৎদানের মাহাত্ম্য অনুভব করা চলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এই বৎসর ৭ই আগষ্ট স্বর্গীয় সাধন চন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ১৬ কাঠা পুষ্করিণী ও জমি

পৌর সভাকে দান করেন তাঁর পিতা চন্দ্র নাথ পাকড়াশী মহাশয়ের নামে একটি শিশু উদ্যান স্থাপন উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ দশবৎসরে পুষ্করিণীটি ভরাট করা ছাড়া পার্কে পরিণত করা পৌরসভার পক্ষে সম্ভব হয়নি, যদিও বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানটি 'পাকড়াশী চিলড্রেন পার্ক' নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

জয়ন্তী সিনেমা।

রিষড়ার সিনেমা দর্শনার্থী নরনারী যদিও ১৯২৩ সাল থেকে শ্রীরামপুর টকিজের মাধ্যমে তাঁদের রসপিপাসা চরিতার্থ করে আসছিলেন কিন্তু ১৯৩৮ সালের ১১ই মে তারিখে তদানীন্তন জেলা শাসক কর্তৃক জয়ন্তী সিনেমার দ্বারোদঘাটন হওয়ায় এতদ অঞ্চলবাসী বিশেষ ভাবেই উপকৃত ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন। স্বত্বাধিকারী মেসার্স প্রদর্শক লিমিটেডের পক্ষে শ্রীযুক্ত বলাই লাল মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রণ জানান বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দকে এবং পৌর পিতাদের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্যে। সবাক ছবি 'প্রিয়তমা' পরিবেশিত হয় সমাগত অতিথিবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন উদ্দেশ্যে। আধুনিক স্থাপত্য শিল্প রীতি অনুযায়ী নির্মিত প্রেক্ষা গৃহটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

এই সিনেমা স্থাপন, স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক থেকে আরও একটি আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ বলা চলে। ইতিমধ্যে বহু উদ্বাস্তু সমাগম ও নূতন নূতন শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে যায়। স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং পর্দাপ্রথার অবলুপ্তি উভয়ই তখন বাস্তবে রূপায়িত। অনুকরণ প্রিয়া বৃদ্ধা, যুবতি কুলবধূনির্বিশেষে সকলের পায়েই তখন স্থান পেয়েছে নানাধরণের স্লিপার বা চর্মপাদুকা যা ছিল এক দশক আগেও সমাজশাসনের ভয়ে অনাগত।

১৯৫৩ সালে স্বয়ং প্রদেশপাল ডঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জ্জি এই সিনেমায় পদার্পন করেন দেশবন্ধু দার্জ্জিলিং মেমোরিয়াল ফাণ্ডে

অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাহায্য প্রদর্শনী উপলক্ষে 'ডুয়েল ইন্ দি সান' নামক চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এই বৎসর অক্টোবর মাসে বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য শিল্পী উদয় শঙ্কর ও অমলা শঙ্কর সম্প্রদায় তিন দিন ব্যাপী ভারতীয় নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকবৃন্দকে অভূতপূর্ব আনন্দ প্রদান করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৮৫৭-১৯৫৭) শতবার্ষিকী দিবস উদযাপন উপলক্ষে জয়ন্তী সিনেমায় ২৬/৮/১৯৫৭ তারিখে শ্রীরামপুরের সুধী নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক 'পথেরদাবী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। যুগোপযোগী এই অনুষ্ঠানটি জনসাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ।

১৯৪৮ সালের ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বার্ষিকী যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। রিষড়া স্বাধীনতা সমিতির সম্পাদক শ্রীমধুসূদন পাল ঐ দিনটিতে দেশগঠনের নূতন সংকল্প গ্রহণের আবেদন জানান, বৈকালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের উপস্থিতিতে শহিদ তর্পণ ও স্বাধীন ভারতের নবজাত শিশুদের অভিনন্দন জানান হয় কিন্তু তখনও দেশবাসী ভাবতে পারেনি কি অশুভ সংবাদ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারী অকস্মাৎ গোধুলির বিষন্ন আলোকের সাথে সুর মিলিয়ে আকাশবাণী ঘোষনা করল মহাত্মা গান্ধী অপরাহ্নে প্রার্থনা সভার দিকে যাবার পথে এক আততায়ীর গুলির আঘাতে বিড়লা ভবনের প্রাঙ্গনে নিহত হয়েছেন। এই মর্মান্তিক সংবাদে দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন সারা বিশ্ব আজীবন অহিংসার পূজারী মহাত্মাজীকে হিংসার বলি হিসাবে নিহত হতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত। পিতৃহারা সন্তানের মত সাত দিন ধরে অশ্রু বিসর্জিত হল ভারতের সর্বত্র। (আনন্দবাজার ৩১/১/১৯৪৮)

তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রমের সভাপতিত্বে শোক সভা অনুষ্ঠিত হল রিষড়া উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সমবেত পৌরবাসী পবিত্র জাহ্নবী জলে তর্পণ করলেন পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে। কলুষনাশিনী গঙ্গাজল স্পর্শ করে বিধৌত করলেন তাঁদের মনের কালিমা। হত্যাকারীর মহাপাপের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান হল ভারতসরকারের উদ্দেশ্যে। ৩০ ১০।৪৮ তারিখে পৌরসভা ফিনলে রোডের নাম পরিবর্তন করে গান্ধী সড়ক নাম করন করেন। গান্ধী সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত যমুনাতলাও সরকারের ল্যাণ্ড একুইজিসন এ্যাক্ট অনুযায়ী অধিগ্রহণের পর গান্ধী পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব অর্থঅভাবে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।

॥ সামাজিক পরিবর্ত্তন ॥

১/১০/৪৮ তারিখে যোগেন্দ্র নাথ তর্ক বেদান্ত তীর্থের সভাপতিত্বে রিষড়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘হিন্দু কোড’ বিলের প্রতিবাদে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিপূর্বে ১৯২৮ খৃঃ বাল্যবিবাহ নিবারণ করে যখন ‘সারদা আইনের’ খসড়া প্রস্তাব সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে জনমত এতখানি সোচ্চার হয়ে ওঠেনি, তার কারণ একমাত্র নিম্নশ্রেণী ছাড়া মধ্যবিত্ত সমাজে তখন যুগের প্রভাবে বাল্যবিবাহ একপ্রকার বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। স্মৃতি শাস্ত্রের বচন:-

“কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহেবসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ং॥”

অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষের মধ্যে যদি কন্যার বিবাহ না হয়, তবে তার পিতা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হবে এবং ঐ কন্যা ইচ্ছানুসারে পতি বরণ করতে পারবে। অথবা প্রাচীণাদের বক্রোক্তি-‘ওমা, কি ঘেন্না! কি লজ্জা! অতবড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে পুষছে; বাপ মায়ের

মুখে অন্ন উঠছে কি করে ? " ইত্যাদি

উপরোক্ত শাস্ত্রবচন বা কটূক্তি তখন আর কেউ বড় একটা গায়ে মাখতেন না। বাল্যবিবাহ (অর্থাৎ ১০/১১ বছরে কন্যার বিবাহ এবং ১৬/১৭ বছরে পুত্রের বিবাহ) তার আগে স্বাভাবিক কারণে সমাজ দেহ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

আনন্দ বাজার পত্রিকা ত' উক্ত আইনের সমর্থনে লেখেন :- "বাল্য বিবাহ রোধ করিতে হইলে আইন আবশ্যক। সতীদাহ নিবারণে আইনের আবশ্যক হইয়াছিল। ... ... বাল্য বিবাহের কুফল লইয়া বহু আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে আমরা সে সকল কথা তুলিব না। . বাল্যবিবাহ নিষেধ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন আমরা আবশ্যক বলে মনে করি। হিন্দু সমাজের ক্ষয় নিবারণ করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই দুই অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য সংস্কার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে।" (১৮/৪/১৯২৮)

উপরোক্ত পরিস্থিতির ফলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ আইন (সারদা এ্যাক্ট) তাই পাশ হয়ে গেল। এই আইনানুযায়ী পাত্রের নিম্নতম বিবাহের বয়স আঠারো এবং পাত্রীর কমপক্ষে পনের বৎসর নির্দ্ধারিত হয়।

আলোচ্য হিন্দু কোড বিলে কিন্তু পূর্বপ্রচলিত বিবাহের আইন বা লৌকিক বিধি বিধানগুলো একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল – অসবর্ণ বিবাহ এবং সগোত্র বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে (প্রথম খণ্ডে পৃঃ ১৯৬/৯৭) এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যে আক্ষেপ বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন তা এই প্রসঙ্গে আংশিক উদ্ধারযোগ্য :-

"১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের একুশ নম্বর আইনের দ্বারা জাতিগত, বর্ণগত

শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত যত কিছু বাধা বিপত্তি হিন্দু বিবাহের মধ্যে ছিল, তাহা আমূল সংস্কৃত হইয়া বিবাহ বিচ্ছেদের জমি হিসাবে ১৯৫৪ খৃঃ ভেত্তাল্লিশ নম্বর আইনের দ্বারা আধা বিচ্ছেদের বিলাতী ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত হইল ·

বর্তমান হিন্দু দম্পত্তির চির জীবনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন 'বিবাহ' পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জিত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজের সম্পত্তি হস্তান্তরের ন্যায় হিন্দু বিবাহ একটি চুক্তিপত্রে (Marriage contract) মাত্র পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর প্রত্যেক কার্যে স্বার্থ-বিসর্জ্জনের যে পবিত্র ছবি বিদ্যমান ছিল, বিবাহে তাহা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইত কিন্তু আজ হিন্দু বিবাহের প্রাচীনধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সেই পুণ্যতম পবিত্র চিত্র ক্রমশঃ সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে গত ৩০ ৩৫ বৎসর যাবৎ রিষড়ায় অসবর্ণ বিবাহ কিভাবে প্রসারলাভ করছে তা কারও অবিদিত নেই। এর কারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্যঃ— (১) ভারতীয় সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। (২) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা। (৩) কো-এডুকেশন এবং অবাধ মেলা মেশা। (৪) পণ প্রথা জনিত অভিভাবকগণের অর্থ নৈতিক বিপর্যয়। (৫) সিনেমা জগৎ। (৬) গুণ-কর্ম বিভাগের ভিত্তিতে চাতুর্বর্ণ সৃষ্টির ভগবৎ উক্তি কালাতিক্রমণ দোষ দুষ্ট।

অসবর্ণ বিবাহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত্র খোঁজেন উপার্জনশীলা মহিলার পাণিগ্রহণের সুযোগ। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন প্রবাদ- 'যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম' স্মরণীয়।
বাঁধতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত খুনো খুনিতে পরিনত হয়।

শিল্প-সংস্কার সম্প্রসারণ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একটা বছর যেতে না যেতেই রিষড়ায়

এ্যালুমিনিয়মের তৈজসপত্র এবং নিত্য ব্যবহার্য বাসন পত্র দ্রুত প্রসার লাভ করে। হাঁড়ি, ডিক্সেল, কড়া, হাতা খোন্তা থেকে আরম্ভ করে চায়ের কেট্‌লি, কাপ পর্যন্ত সুলভে বিক্রি হতে থাকে। ইতিপূর্বে অবশ্য কলাইয়ের (এনামেল) জিনিষ পত্র চালু হয়েছিল কিন্তু পাকপাত্র তৈরী না হওয়ায় স্থানীয় কুম্ভকারদের ব্যবসায়ের উপর এতখানি আঘাত হানে নি। গ্রহণাদি উপলক্ষে মাটির হাঁড়ি কুড়ি ত্যাগ করার প্রথাও উঠে যেতে আরম্ভ করে। মাটির জিনিষের মত ক্ষণভঙ্গুর না হওয়ায় সাধারণ গৃহস্থরা এ্যালুমিনিয়মের তৈজস পত্রাদি ব্যবহারের বিশেষত্বের উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

॥ পদে পদে পদ—শোভা ॥

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জুতা বা পাদুকার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে মহিলা মহলে। সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পরমবন্ধু এবং কলকতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে ও তাঁর সহকর্মিগণ যেদিন কলকাতা চাঁদপাল ঘাটে অবতরণ করেন সেদিন তাঁদের দর্শন লালসায় যে বিরাট জনতা ঐ স্থানে সমবেত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল নগ্নগাত্র ও নগ্নপদ। এদের দেখে স্যার ইম্পে বলেছিলেন—"মাত্র ছয়মাস আমাদের কাজ করার সময় দিন, তারই মধ্যে আমি নিশ্চয় আপনাদের জুতো ও মোজা পরাতে সাহায্য করব ও দুর্দ্দশা দূর করব।"

তাঁর আশ্বাসবাণী যে একশো বছরেও সফল হয়নি সেকথা সর্ববাদী সম্মত বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে কিন্তু সকলের পায়ে জুতো তুলে দিয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসী জন বাট্‌স! কোন্নগরে বাটা-সু-কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হওয়ায় রিষড়া ও কোন্নগরের শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবক সমাজই যে কেবলমাত্র তাঁদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন তাই নয়, বালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে প্রায় সকলের পায়েই শোভা পেতে থাকে—মাত্র আটআনা

দামের কেডস্ জুতো। আতুর খঞ্জ এমন কি কুষ্ঠ রোগীও বাদ যায়নি।

তার পরের ইতিহাস অর্থাৎ বাটা-স্থ কোম্পানীর অগণিত ধরণের জুতো, চপ্পল, স্যাণ্ডেল এবং মহিলাদের ব্যবহার্য বিচিত্র ধরণের স্লিপারের কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তার শোভনীয় ও লোভনীয় বর্ণনা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সর্বজন বিদিত।

অর্থ নৈতিক বিপর্যয়।

জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং দ্রব্যমূল্য ধাপে ধাপে উর্দ্ধগামী হতে থাকে। যুদ্ধোত্তর যুগে মানুষের ধর্মভাব স্বাভাবিক কারণেই শিথিল হয়ে পড়ে। নারী জাতির প্রতিপাল্য ব্রত নিয়মাদি ব্যয়বাহুল্য হেতু একপ্রকার পরিত্যক্ত হয়। "বিশ্বযুদ্ধ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। জন সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন তেমন বাড়েনি, ঊনবিংশ শতকেও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা গিয়েছে। জমিদার শ্রেণীও গ্রামের গরীব প্রজাদের শোষণ করে গিয়েছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে পাপপুণ্য বোধও প্রবল ছিল। যে কারণে পুষ্করিণী খনন থেকে স্কুল, মন্দির, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। নীতিবোধ মানুষকে অনেক বেশি শাসন করেছে। এই বিংশ শতাব্দীতে যার সবচেয়ে বড় অভাব। এই অভাব যত বাড়বে আমাদের অর্থনীতি, সমাজ নীতি, পরস্পরের প্রতি মমত্ব বোধের দুর্দিন তত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসবে।" -নিশীথ দে।

সরকারী কর্মচারীদের উপরতলা থেকে নীচু তলা পর্যন্ত দুর্নীতি এবং বল্গাহীন অর্থ লোলুপতা স্বাধীন শিশু রাষ্ট্রকে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা কারও অবিদিত নেই। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভেজালের যুগ। অসাধু ব্যবসায়ীরা শুধু খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দিয়ে ক্ষান্ত হয় নি, রোগীর রোগ নিরাময়ের শেষ সম্বল ওষুধেও ভেজাল দিতে পশ্চাৎপদ হয় নি। জাতীয়তাবোধের অভাব হেতু স্বার্থান্বেষী মানুষের দল কেবল আপনার কোলে ঝোল টানতে আরম্ভ করে এবং রাজনৈতিক দলাদলি ক্রমশঃ দানা

অবহেলিত নির্জন প্রান্তর ও বরোজ জমি গুলোর পরিবর্তে গড়ে উঠতে লাগল নূতন নূতন শিল্প সংস্থা, যার ফলে অগনিত শ্রমিক শ্রেণীর দল সমবেত হতে লাগল রিষড়ার পশ্চিমাঞ্চলে। বলা বাহুল্য রেল লাইনের পূর্ব প্রান্ত ইতি পূর্বেই জন সমাগমে, উদ্বাস্তু আগমনে এবং ছোট বড় শিল্পাগার নির্মাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কাজেই নূতন শিল্প সংস্থাগুলি বেছে নিলেন জনবিরল পশ্চিমাঞ্চল।

বনস্পতি তৈল ও সাবান উৎপাদনের জন্যে কুসুম প্রোডাক্টস্ লিঃ ভারতের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৪৫ খৃঃ রেজেষ্ট্রিকৃত হয়ে ১৯৪৮ খৃঃ উৎপাদন আরম্ভ করে। এঁদের নির্মিত 'স্পা' এখন ঘরে ঘরে ব্যবহৃত এর পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল ইউনাইটেড ভেজিটেবিল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, গান্ধী সড়কের প্রান্তভাগে। ২০/৭/৫৯ তারিখের রাত্রে এই কারখানায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে অদূরবর্ত্তী রেল লাইনের অংশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সহরবাসী গভীর রাত্রে বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দে স-শঙ্কিত ও কারণানুসন্ধানে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। পরদিন সংবাদ পত্রে ঘটনার বিবরণ ও ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশিত হয়। এই দুর্ঘটনার পর শিল্পসংস্থাটি কিছুদিন বন্ধ থাকার পর কুসুম প্রোডাক্টসের পরিচালনায় পুনরায় কার্য আরম্ভ করে। (রিষড়া পৌরসভা সুবর্ণ জয়ন্তী পত্রিকা)

বয়ন শিল্প সংস্থার প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৪ খৃঃ রেজিষ্ট্রীকৃত জয়শ্রী টেক্সটাইলস লিঃ (প্রারম্ভিক যুগের নাম) রেল লাইনের পশ্চিমে বিস্তৃত ভূমি ক্রয় করার পর ১৯৪৯ সালে কার্যারম্ভ করে এবং ১৯৫০ সালে পূর্ণোদ্যমে উৎপাদন সুরু হয়। "It was a pioneering Venture and even to this day it is the ony concern in India manu-

facturing flax goods. The company also turns ont fire fighting hoses, Canvas, tarpaulins, water bottles etc. Hooghly Dist. Gagetteer—1972.

"টেক্সটাইলস ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে এই কারখানা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

West Bengal has also got the proud privilege of being the home of the first flax mill to be establishd in India. Throgh the cvterprisos of a well-known Indian firm a mill has recently been erectd at Rishra near Caloutta for the spinning and weaving of flax.

এই পুস্তকেই উক্ত কারখানার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

"Flax yarn and twines.

Flax Canvas.

Flax Buckram.

Pure Linen fabrics.

Mg. Agent : Birla Bros. Ltd.

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এই কারখানায় নিযুক্ত লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,০০০ এবং বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য ছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা। বিদেশে রপ্তাণী কৃত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :- Cotton yarn, Cotton Canvas, Paulins, flax twines for manufacture of heavy & light duty boots and shoes etc.

বলা বাহুল্য, হুগলী জেলায় প্রধান বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জয়শ্রী টেক্স টাইলস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (বর্তমান নাম) অন্যতম। (হুগলী জেলার ইতিহাস- সুধীর কুমার মিত্র পৃঃ ৫৬৩)

এরপর উল্লেখযোগ্য হল লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিমিটেড ১৯৫১ সালে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ইহা একটি বাঙালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত। মিল কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় কয়েক বৎসর-শ্রী শ্রী ৺ কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের অভিনয় মাধুর্যে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ আনন্দলাভ করেন এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন তালিকায় স্থান পেয়েছে—Various counts of yarn in cones cheese & Hank forms.

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উক্ত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু সংখ্যক চাকুরী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় এই কারখানাতেও শ্রমিক-বিক্ষোভ সময়ে সময়ে মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে।

বিভিন্ন কারণে বস্ত্র শিল্প সংস্থাগুলি ১৯৬৯ খৃঃ থেকে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে যার ফলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কারখানাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। মাহেশের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলও বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় তিন বৎসর পরে কংগ্রেস সরকারের "বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা অধিগ্রহণ প্রকল্প" অনুযায়ী শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগের প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত কারখানাটির পরিচালনভার সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় বহু বেকার শ্রমিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

(Vide Notification No 929 C-S-I-dt 12-12-72)

১৯৭৫ সালে রিষড়া হেষ্টিংস মিলের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীরাম সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে ইহা কোন্নগরে স্থানান্তরিত। (এই প্রতিষ্ঠানটি রেশম শিল্পের একটি বড় কারখানা, ভারতবর্ষে রেশম শিল্পের এত বড় কারখানা খুব কম আছে) হুঃ জেঃ ইঃ পৃঃ ৫৬৩।

বার্কমাযার ব্রাদার্স পরিচালিত 'ত্তেরপল নির্মাণ' কারখানার পরিবর্ত্তে এটি একটি উল্লেখ যোগ্য সংযোজন বলা চলে।

শ্রমিক কো-অপারেটিভ কটন মিলস্ লিঃ এর কার্য আরম্ভ হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। ইহাও একটি বাঙ্গালী পরিচালিত ছোট খাট বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ যোগ্য।

উপরোক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও গত কয়েক বৎসরে কযেকটি ক্ষুদ্র সূতা বা সূতা হতে তৈয়ারী কাপড় প্রস্তুতের কারখানা (যার মধ্যে কুটির শিল্পও আছে) গড়ে উঠেছে এগুলির মধ্যে দেওয় নজী ষ্ট্রীটে সিদ্ধেশ্বরী উইভিং ফাক্টরী ও শ্রীরামকৃষ্ণ রোডে কৃষ্ণা টেক্সটাইলস, কালী টেক্সটাইলস, নন্দবাণী টেক্সটাইলস' প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

।। ইস্পাতের কারখানা ।।

'ভারতবর্ষে 'বেলিং হুপস্' যে কয়টি কারখানায় প্রস্তুত হয়, জে, কে, ষ্টীল লিঃ তাদের মধ্যে অন্যতম। ইস্পাতের দড়ি অর্থাৎ ষ্টিলরোপ' এই কারখানা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও উৎপন্ন হয় না। ১৯৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্নোদ্যমে কার্য আরম্ভ করে এবং ১৯৫৭ সালে ইহার উৎপাদন তালিকায় সংযুক্ত হয কোল্ড রোল্ড ষ্ট্রীপস্ এবং ওয়্যাররোপস্। ১৯৬৬ সালে কোম্পাণীর Authorised Capital ছিল দেড কোটি টাকা এবং Subscribed Capital ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। এই সালে কারখানার মোট ৮৯৯ জন কর্মির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৯৯ (অদক্ষ) ৩৬২ (অর্ধদক্ষ) এবং ১৫ জন উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ দক্ষ শ্রেণীভুক্ত। হাওড়া থেকে মাত্র ১১ মাইল দূরে (১৭ কিঃ মিঃ) ইষ্টার্ন রেলওয়ে থেকে কারখানার মধ্যে নিজস্ব সাইডিং হল একটি বিশেষ সুবিধা জনক সম্পদ।

(হুগলী জেলা বিবরণী—১৯৭২)

১৯৫৬ খৃঃ ১লা আগষ্ট এই ইস্পাত কারখানায় ৪র্থ বার্ষিক

অধিবেশনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দকে কারখানা পরিদর্শনের সুযোগ করে দেন এবং খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পিদের দ্বারা সঙ্গীত জলসার মাধ্যমে অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়িত করেন। ভারত গবর্নমেণ্টের আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কণ্ট্রোলার শ্রী আর এন দও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। উপরোক্ত জুট বেলিং হুপস এবং ষ্টীল ওয়্যার্স ও ওয়্যার রোপ ছাড়াও তখন উৎপাদন তালিকায় Electric Hoist Blocks and chain pulley Blocks ও স্থান পেয়েছিল।

১৯৬৫ সালে (২২ শে বৈশাখ ১৩৭২) বসুমতি পত্রিকায় নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় :–

চাকুরীর দাবিতে রিষড়ায় বেকার যুবকদের মিছিল। শ্রীরামপুর ৩-রা মে। গত ২৬ শে এপ্রিল প্রাতে প্রায় শতাধিক বেকার যুবক চাকুরীর দাবিতে কংগ্রেস পতাকা হস্তে লইয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে... রিষাড়া জে, কে, ষ্টিল ফ্যাক্টরীর কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় বেকারদের কর্মে নিয়োগ ব্যাপারে প্রথম সুযোগ দিবার দাবী পেশ করেন। ...এই বেকার যুবকদের নেতৃত্ব করেন রিষড়া পৌর সভার সদস্য ও সমাজ সেবী শ্রী সুনীল কুমার দাসগুপ্ত। ...এখানে উল্লেখ যোগ্য যে রিষডা পৌর এলাকার লোক সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার এবং এখানে প্রায় ১৫টি ছোটবড কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, অথচ স্থানীয় অধীবাসীরা এইসকল কলকারখানায় চাকুরী পান না।

এই প্রসঙ্গে 'গোবিন্দ ষ্টীল কোং লিঃ' এর নামও উল্লেখযোগ্য। ৫/৮/৬২ তারিখে প্রেসিডেন্সী মিলের উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠা হয় এই লৌহ কারখানার-একেবারে নাগরিক বসতির সন্নিকটে (বাগদি পাড়া লেনের দক্ষিণাংশে)। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিবাদধ্বনি চাপা পড়ে যায় সরকারী পর্যবেক্ষকদের ফাইলের অন্তরালে। এতদঞ্চলে তখন গড়ে উঠেছিল 'রামকৃষ্ণ সারদা পল্লী'-কলোনী।

কয়লার গুড়ো ও লোহার গুড়ো পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়া আংশিক বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নাতিউচ্চ চিমণীর মাথায় একটি

আচ্ছাদন বা টুপি লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়।

ঢালাই লোহা থেকে বিভিন্ন সাইজের (ক্ষুদ্রতম থেকে দশ মেট্রিক টোন পর্যন্ত) বাটখারা তৈরীর করা এবং 'ম্যানহোলের' ঢাকনা প্রভৃতি প্রস্তুত করা এই কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতম, যেগুলি রেলওয়ে বোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থায় সরবরাহ করা হয়। ৫ই আগষ্ট ১৯৬২ খৃঃ সকাল ৭ ঘটিকায় উক্ত কারখানা উদ্বোধন উপলক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত রতনলাল সুরেকা রিষড়ার বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান।

(আমন্ত্রণ লিপি দ্রষ্টব্য)

শিল্প উপনগরী রিষড়ায় দশভূজা মূর্তির পরিবর্তন ঘটে যায় মোড়পুকুর অঞ্চলে রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে ১৯৬২ খৃঃ বিন্দা-ওয়ালা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেসনের ভিত্তি স্থাপনায়। এটিও একটি ছোট খাট লৌহ কারখানা। পাশা-পাশি সমরেখায় উপরোক্ত তিন-তিনটি কারখানা স্থাপিত হওয়ায় স্থানটির গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং বহু বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিক তাদের রুজি রোজগারের সুযোগ পেয়ে যায়। (BIC manuefactures all kinds of ACSR and Alumiminm Conductors).

অন্যদিকে এই বিরাট এলাকার পূর্ববর্তী স্বাভাবিক নিম্নাভিমুখী জল নিকাশের সমস্যা দেখা দেয়। রিষড়া পৌর এলাকা পশ্চিম দিকে ক্রমশ সম্প্রসারিত হওয়ায় গুরু গার্ডেন রোডে অবস্থিত শ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট লিঃ রিষড়ার মধ্যে গণ্য হয়। লৌহ ঢালাই কারখানা হিসাবে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল এই সময়ে যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ রোডে হুগলী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ঋষি বঙ্কিম রোডে ওরিয়েন্ট ল্যামিনেটিং কোং (মোজেক টালি নির্ম্মাণ কারখানা) প্রগেসিভ পোরসিলিন ইণ্ডাস্ট্রিজ, ডি, এন, ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি।

এক লক্ষ মণ আলু সংরক্ষণ হিম-ঘর হিসাবে গুরু গার্ডেন রোডে স্থাপিত হয় 'চণ্ডী কোল্ড ষ্টোরেজ' — ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে। (The biggest and the most modern Coldstorage. with the aid of scientific methods). এই ধরণের কোল্ড ষ্টোরেজের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা আজ সর্বত্র স্বীকৃত, তাই গ্রামাঞ্চলেও গড়ে উঠেছে একে একে বহু হিম-ঘর।

!! কাঁচের কারখানা !!

গুরু গার্ডেন রোডের উত্তর পার্শ্বে, ৪ নং রেলওয়ে গেটের সন্নিকটে 'হিন্দুস্থান ন্যাশানাল গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ' হুগলী জেলার দু'টি বৃহৎ কাঁচের কারখানার মধ্যে অন্যতম। বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য এক কোটি টাকার উপর। (হুঃ জেঃ ইঃ, পৃঃ — ৫৬৪)

ইঁহাদের নির্মিত ৮ আউন্স, ১০ আঃ ও ১২ আঃ সাইজের 'অম্বর' মার্কা সাদা বোতল ও টাম্বলার গ্লাসের চাহিদা প্রচুর এবং মজবুতও বটে।

সার উৎপাদন কারখানা।

রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা-ফসফেট্ কোম্পানী একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গুর ব্রাদার্সের পরিচালনায় ১৯৪৯ খৃঃ রেজিষ্ট্রিকৃত হ'য়ে ১৯৬২ সাল থেকে পূর্ণোদ্যমে উৎপাদন কার্য আরম্ভ হয় এবং ফেরোলুম প্ল্যাণ্ট স্থাপিত হয়।

সুপার ফস্ফেট (লবণক্ষার), সালফিউরিক এসিড, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সার, ফেরিক এল্যাম প্রভৃতি উৎপাদনই এঁদের বিশেষত্ব। রিষড়ার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত এ্যালকেলি কেমিকেল করপোরেশনের ন্যায়

রিষড়ার উত্তর প্রান্তবর্ত্তী এই কারখানা থেকে সময়ে সময়ে শ্বাস-রোধকারী গ্যাস নির্গমনের ফলে জনজীবনে বিশেষ ক্লেশ সঞ্চার হয়ে থাকে এবং তার প্রতিবাদে স্থানীয় এলাকা থেকে বহু প্রতিবাদ ও আবেদন পত্রাদি সংশ্লিষ্ট মহলে প্রেরিত হতে থাকে।

২৮-২-৬২ তারিখে ফসফেট কোম্পানীর কারখানা প্রাঙ্গনে মহাসমারোহে "বৈকুণ্ঠনাথজী বিগ্রহের" সম্প্রদান উৎসব পালিত হয় এবং তদুপলক্ষে সাতদিন ব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় (আমন্ত্রণ লিপি দ্রষ্টব্য)।

এই কারখানার অনতি দূরে স্থাপিত হয়েছে বি এণ্ড এম কেমিক্যাল ফ্যাক্টারী এখানে সোডিয়াম বাইক্রোমেট, সোডিয়াম সালফেট প্রভৃতি তৈয়ারী হয়ে থাকে।

উপরোক্ত কারখানাগুলি ছাড়াও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু গড়ে উঠেছে।

হুগলী জেলার ইতিহাসে (পৃঃ ১২১৫) শ্রী সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় রিষড়ার কারখানাগুলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন :—

"রিষড়া এলাকায় বর্তমানে কলকারখানার সংখ্যা আঠারটি। কলকারখানা বৃদ্ধির ফলে গ্যাসবাষ্পের দরুন এই অঞ্চলের নারিকেল গাছগুলি এখন ফলশূণ্য হইয়া বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ...... পলিথিন গ্যাস ডাব জন্মগ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে কিনা তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাগ খালের উত্তর পার্শ্বে স্থাপিত হয় রাজকিশোর লালের ইট খোলা। (R. K. LALL.) পরবর্তী কালে 'যুবক ব্যবসায়ী দল' এই ইঁট খোলার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং নিজেদের নামে (J. B. D. মার্কা) ইঁট তৈরী করতে থাকেন। এই ইঁট গড়ার প্রাচীন ইতিহাসে হুগলী জেলার

স্থান অগ্রগণ্য। সিপাহী বিদ্রোহের পর মজবুত জাতের ইঁটের প্রয়োজনে বাংলায় মাটি পরীক্ষার কাজ সুরু হয়। সেই সমীক্ষায় জিতে যায় হুগলী। ভদ্রকালী, কোতরঙের গঙ্গার পলিমাটির ইঁটের তুলনা হয় না বলে সাব্যস্ত হয়। বুল সাহেব সেইখানেই আধুনিক ইটের ভাঁটার পত্তন করেন। মাটি থেকে টাকা তৈরী হতে দেখে কালক্রমে এদিক সেদিক আরও ইঁট ভাঁটা গজিয়ে উঠে। ১০,১২ টাকা ইঁটের হাজার থেকে ১৯৬৫ সালে আটাত্তর থেকে একশ টাকা হাজার দরে ইঁট বিক্রী হয়েছে। (যুগান্তর) সত্যচরণ শাস্ত্রী ষ্ট্রিটের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত টি, এন, ভড় এণ্ড কোংএর ইঁটের সুনাম বাজারে সুবিদিত।

বলা বাহুল্য "এই সমস্ত কলকারখানার অসংখ্য স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের উপস্থিতির চাপে বহু জরুরি সমস্যা ছড়িয়ে আছে নানাদিকে। মিল কারখানার পরিচালক বর্গের পূর্ণ সহযোগিতা এবং সহায়তাতেই এই ক্ষুদ্র জনবহুল শহরের কল্যাণের সার্থক রূপায়ণ হওয়া সম্ভব" (শান্তিরঞ্জন দাস- রিষড়া পৌরসভা স্মরণিকা-১৯৬৬)

।। শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের চিকিৎসা ।।

১০৩ পৃষ্ঠায় জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে রিষড়া থেকে কুম্ভকার বংশধরগণ কর্তৃক গঙ্গাজল নিয়ে যাবার কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। বৎসারান্তে ঐভাবে স্নান করার ফলেই নাকি তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন, এটি একটি বহুজন বিঘোষিত জনশ্রুতি। অমাবস্যার দিন অর্থাৎ নবযৌবন উৎসবের দিন সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠেন। তাঁর উক্ত অসুস্থতার চিকিৎসার নিমিত্ত রিষড়ার পূর্বোক্ত বৈদ্যবংশ (পৃঃ ২৯৯) বহুকাল ধরে অমাবস্যার পূর্বদিন তাঁদের তৈরী কবিরাজী

বড়ি ও অন্যান্য অনুপান দিয়ে আসতেন। বিভূতিভূষণ গুপ্ত মহাশয় ১৯৪৭ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় উক্ত শতাব্দী-প্রাচীন প্রথা লোপ পায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রিষড়ার কবিরাজী চিকিৎসাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সুলভে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য যদিও ১৯৩৮ খৃঃ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় পাশ করেন কিন্তু তাঁর পশার জমতে বা হাতযশ হ'তে বেশ কয়েকটা বছর কেটে যায়। তখন দু'আনা, এক আনার বিনিময়ে হোমিওপ্যাথী ওষুধ পেয়ে লোকের খুবই সুবিধা হত। এই সময় শ্রীকুঞ্জ বিহারী আশ (পৃঃ ৩০৯) বিনা মূল্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিতেন এবং তার কার্যকারিতাও অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন তখন হেষ্টিংস মিলের কর্মচারী। তাঁর জনৈক সহকর্মীর কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স হলেও স্তনোদ্গম না হওয়ায় বিবাহে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি বহু গবেষণা করে একটি ওষুধ নির্বাচন ক'রে দেওয়ার ফলে উক্ত কন্যা স্তনবতী হয়ে উঠে এবং অচিরেই তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। (এই কাহিনী তাঁর নিজের মুখে শোনা)

।হেষ্টিংস মিলে নেহেরুজীর পদার্পণ॥

১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯ বাং ২রা মাঘ ১৩৫৫ ভারতের মহামান্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাট উদ্বোধনের পর লঞ্চযোগে কলকাতায় ফেরার পথে হেষ্টিংস মিলের জেটিতে অবতরণ করেন। শ্রীপুরুষোত্তম বাঙ্গুর ও ম্যানেজার মিঃ আলেকজাণ্ডার তাঁকে মাল্যভূষিত ক'রে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন

করেন ও ক্ষণিকের অবস্থিতি হলে এই গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি হেষ্টিংস মিলের কর্ত্তৃপক্ষ আলোকচিত্রের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

এই সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের ডাকটিকিটের রূপাকৃতি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং স্থানগুলির প্রতিকৃতি সম্বলিত বিভিন্ন মূল্যের টিকিট প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গুর ব্রাদার্সের আতিথেয়তা।

২৫ শে শ্রাবণ ১৩৫৭ বৃহস্পতিবার (ইং ১০/৮/৫০) হেষ্টিংস মিল লিঃ এর পক্ষে তৎকালীন ম্যানেজার ডবলিউ আলেকজেণ্ডার স্বর্গীয় মাননীয় শেঠ মাগনীরাম বাঙ্গুর মহাশয়ের স্মরণার্থে রিষড়ার বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দকে রাত্রি ৭ ঘটিকায় জলযোগে আপ্যায়িত করেন। ভোজন ব্যবস্থার প্রাচুর্য ও বৈশিষ্ট সকলের প্রশংসা অর্জন করে। প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক হেষ্টিংস লজে (বর্ত্তমানে ঠাকুর বাড়ীতে রূপান্তরিত) উক্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাগানবাড়ীর আলোক চিত্র প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। এই অট্টালিকার উত্তর দিকের দেওয়ালে সুবৃহৎমর্মর ফলকে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ নিম্নরূপ।

THIS HOUSE AND ESTATE INCLUDING ORIGINALLY SIXTY MORE BIGHAS OF LAND ON THE NORTH KNOWN AS THE RISHRA BAGAN OR GARDEN FROM 1780 TO 1784 THE PROPERTY OF WARREN HASTINGS GOVERNOR GENERAL OF FORT WILLIAM IN BENGAL.

।। নেতাজীর জন্মতিথি পালন ।।

২৩ ১/৪৯ তারিখে ভারতের বিপ্লবী সন্তান দেশবরেণ্য নেতাজীর জন্মতিথি পালনের আহ্বান এল দেশবাসীর কাছে। ১২/১৫ মিঃ গৃহে গৃহে শুভ শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে জন্ম মুহূর্তটাকে শ্রদ্ধা জানাল রিষড়ার অধিবাসীবৃন্দ। মশাল শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক রে দেশবাসীর অন্তরে উজ্জল ক রে তুলল তাঁর পুণ্যস্মৃতি তাঁর অমূল্য অবদান। এরপর থেকে এই দিনটি এবং শুভ জন্মলগ্নটিকে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক রে আসছে বছরের পর বছর। বিভিন্ন মহল থেকে রব উঠেছিল নেতাজী আবার ফিরে আসছেন— তাঁর মৃত্যু সংবাদ একটা মিথ্যা রটনা। সকলে একথা বিশ্বাস না করলেও অন্তরে কিন্তু ক্ষীণ আশার উৎকেন্দ্র হ'তে বাধা পড়েনি। বহু বিঘোষিত সে আশা যে নিরাশায় পরিণত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

।। কলঙ্কময় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ।।

২৬/৩/৫০ তারিখে শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা পূজার পূর্ব রাত্রে রিষড়া বস্তি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে রিষড়ার ইতিহাসে রচিত হয় এক কলঙ্কময় অধ্যায়, যার ফলে বহু অহিন্দু বাসিন্দা সরকারী তত্ত্বাবধানে তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হন। কয়েকটি গৃহে অগ্নিসংযোগ এবং দু'একটি প্রাণহানির সংবাদে জনগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এই অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেরণা এসেছিল সম্ভবতঃ বাইরে থেকে উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাবাজ লোকের প্ররোচনায়।

২৩/৪/৫০ তারিখে শ্রীযুক্তা মৃদুলা সারাভাই পৌর ভবনে পৌরসদস্যবৃন্দ এবং উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় নাগরিকগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তি স্থাপনের আবেদন জানান। এই একই উদ্দেশ্যে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ওয়েলিংটন

জুটমিলে সমবেত জনতাকে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপনের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির অনুকূলে সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান।

বলা বাহুল্য সম্প্রদায় বিশেষের এক বৃহদাংশের সাময়িক অনুপস্থিতির ফলে গণতান্ত্রিক ভারতের প্রথম জনগণনা (১৯৫১) বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং পৌরসভার ট্যাক্স আদায়কার্য নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল।

।। স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন ।।

গণতান্ত্রিক ভারতের আসন্ন প্রথম সাধারণ নির্বাচণের প্রস্তুতি উপলক্ষে এতদঞ্চলবাসী বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেন। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারে (নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে) নির্বাচিত হবেন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি। ২১/১০/৫১ তারিখে রিষড়া পৌরসভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে জয়যুক্ত করার জন্যে রিষড়া ও মাহেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ একটি যুক্ত আবেদন পত্র প্রচার করেন। প্রার্থী হিসাবে নরেন্দ্র কুমারও স্বয়ং শ্রীরামপুর নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটারগণের উদ্দেশ্যে ইংরাজীতে মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন।

এই নির্বাচন উপলক্ষে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে পূর্ণবাবুর ময়দানে ভাষণ দিতে আসেন শ্রীমতী অরুণা আশফ্ আলি। হেষ্টিংস ময়দানে এসেছিলেন শ্রীজগজীবন রাম আর পোড়ামাঠে দীর্ঘ প্রতীক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন দেশ গৌরব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নির্বাচনের মাত্র একবৎসর পরে ১৯৫৩ খৃঃ জুন মাসে কাশ্মীরে তাঁর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। পৌরসদস্যগণ ২৭/৬/৫৩ তারিখের সভায় এই মহান নেতার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

উক্ত খৃষ্টাব্দে ৯ই মে তারিখে পৌর প্রধান নরেন্দ্র কুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় "যজ্ঞেশ্বর ওয়েল মিলের" শুভ উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সাধুখাঁ ব্রাদার্সকে অভিনন্দন জানান তাঁদের এই উদ্যম ও নূতন ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাকে। খাঁটি সরিষার তেল সংগ্রহের জন্যে বাইরের আর কোনও প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। এই আশ্বাসবাণীতে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সরকারী উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসদস্যগণ ২৮/৪/৫১ তারিখের সভায় রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী রাইলাণ্ড রোডের নাম পরিবর্তন ক'রে 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড' নামকরণ করেন। পার্শ্ববর্তী পৌর এলাকা-গুলিতেও উক্ত নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত রাস্তার নামকরণ করা হয়।

পৌরসভার সম্প্রসারণ।

উপরোক্ত মিল কারখানা স্থাপন এবং গভর্ণমেণ্ট কলোনীতে উদ্বাস্তু সমাগমে একদা নির্জন বিরল বসতি মোড়পুকুর অঞ্চল তখন কলকোলাহলে পরিপূর্ণ। রিষড়া ষ্টেসন থেকে নেমে রাত্রে একা বাড়ী ফেরার ভয় তখন আর নেই বরং উভয় দিকে হাজার হাজার লোকের গা ঘেঁসে চলা থেকে কি করে একটু নিস্তার পাওয়া যায় তাই তখন সকলের চিন্তা। বটতলায় (৩নং রেলওয়ে ফটক) দাঁড়িয়ে আছে অন্ততঃ একডজন সাইকেল রিক্সা। রেল ফটকের পশ্চিম দিকেও ষ্ট্যাণ্ডে রিক্সার অভাব নেই। নূতন নূতন বিপণী ভরে তুলেছে রাস্তার দুটো ধার।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের যান বাহন চলাচলের সুবিধার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ল ভাল রাস্তা আর আগন্তুক নরনারী এবং শ্রমিকদের জন্যে চাই আলো, পানীয় জল, কনজারভেন্সি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা। এরই পটভূমিকায় পৌরসভার কাছে এল আবেদন নিবেদন, দাবী দাওয়া

— পৌরসভার এলাকা প্রসারিত করতে হবে, দিতে হবে উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পৌর সভাধীশ নরেন্দ্র কুমারের চোখে যেন ফুটে উঠল ভবিষ্যৎ চিত্র। সম্প্রসারণের দাবীর সারবত্তা। নিয়ম-তান্ত্রিক ভাবে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান হল খসড়া প্রস্তাব কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হবার পর ২৫/৮/১৯৫২ তারিখের ১ এম-৮০/৫২ নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী রিষড়া পৌর এলাকার পশ্চিম-দিকস্থ কিছুদূর পর্যন্ত পৌর শাসনাধীন করা হল। ৬/১০/৫২ তারিখে পৌর প্রধান মুদ্রিত বিজ্ঞাপন মারফৎ উক্ত সরকারী সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের অবগতির জন্যে প্রচার করে দিলেন। কিন্তু স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসীর প্রতিবাদের ফলে মহামান্য হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতে প্রায় দু'বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে যদিও উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজাধরপুর ইউনিয়নের কিয়দংশ পৌর এলাকা ভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু সরকারী মৌজা ম্যাপ অনুযায়ী রিষড়ার পশ্চিমাঞ্চল ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই এই সম্প্রসারণকে কোনও নূতন এলাকা বা অঞ্চল বিশেষকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা বলা চলে না। (আলোকচিত্র)

সম্প্রসারিত এলাকার উত্তর সীমানায় গুরু গার্ডেন রোড আর দক্ষিণে পড়ল চাষাপাড়া। রেল লাইনের পশ্চিম প্রান্তে স্থাপিত জে, কে, স্টিল ফ্যাক্টারীর প্রয়োজনে চাষাপাড়া লেনের পূর্ব দক্ষিণাংশের কিয়দংশ তাঁরা পৌর সম্মতি ক্রমে গ্রাস করে নেন। তার পরিবর্তে অবশ্য তাঁরা কারখানার উত্তর ধার দিয়ে নূতন রাস্তা বাহাল ক'রে দেন। পৌরসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত চাষাপাড়া লেনের নূতন নাম করণ হল 'দাস পাড়া লেন' বলে।

সম্প্রসারিত এলাকা বর্দ্ধমান ভুক্তিপতির ২২/২/৫৪ তারিখের ৩২৭ এম নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ নং ওয়ার্ড বলে গণ্য হয়। এতদঞ্চল

বাসী তখন অধিকাংশই চাকুরীজীবী, চাষবাসের পাঠ প্রায় উঠেই গিয়েছিল। (হুগলী জেলা বিবরণী— ১৯৭২)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পৌর এলাকা সম্প্রসারণের পালা এই-খানেই থেমে যায়নি। দশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে অধিকতর লোক সমাগমের ফলে এবং দিল্লী রোড স্থাপিত হওয়ার কারণে ক্রমশঃ পৌর শাসনাধীন হওয়ার বিশেষ ক'রে বিধিবদ্ধ রেসন এলাকাভুক্ত হওয়ার প্রয়োজনে ৭/১২/৬৪ তারিখের ৭৪৩৫/এম, ১ এম-৪৬/৬৩ নং সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়. এবং বর্দ্ধিত এলাকার অধিবাসীরা আঞ্চলিক ভিত্তিতে বহু নূতন নূতন 'পল্লী' হিসাবে নামকরণ করেন। "The new strueture and functions of urbanism have thus invited a process of change in the patterns of human relation-ships, in which earlier ties of caste, village, distriet are solely subjeeted to dis-integration." – Hooghly Dist. Gazt.— 1972

উপরোক্ত সংযুক্তির ফলে একদিকে যেমন পৌরসভার আয় কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, অপরদিকে তার দায়দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছিল চর্তুগুণ। প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছিল নিম্নভূমিগুলির উপযুক্ত জল নিকাশী ব্যবস্থা। বিশেষ করে বর্ষাকালে এতদঞ্চলবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। নীচু জলা জমিতে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট ঘরের সারি আর তারই পাশে কূয়া পাইখানা। ১৯৫৫ সালের প্রবল বর্ষণে বৃষ্টির জল জমে উঠল ঘর দুয়ারে। অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে কয়েকদিন কেটে যাবার পর পাম্পের সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা হল। সংবাদপত্রগুলো মুখর হয়ে উটল পৌরসভার অব্যবস্থার নিন্দায়, কিন্তু সরকারী অবিবেচনার কথা রইল অপ্রকাশিত । রোগের আসল কারণ নির্দ্ধারণ হল না, শুধু সাময়িক প্রলেপের ব্যবস্থা হল মাত্র।

১৯৬১ সালে যেখানে লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭৪৬২ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ হাজার, উপরোক্ত সংযুক্তির ফলে ১৯৬১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮,৫৮০ (প্রায় চল্লিশ হাজার)। হুগলী জেলা বিবরণীতে এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়:— "Accounting for a growth of 40. 3% within a decade. The bulk of the inereaie is due to immegration of factory labour as is indicated by the growth of males from 17,598 in 1951 to 24,790 in 1961 and their large excess over females who in 1961 numbered 13,745. According to the 1961 census, the total number of workers in the town was I6,628 of whom I2,108 (72·7%) were engaged in manufacturing other than household industries and 1,735 (10·4%) employed in trade and commerce." শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ১৭৯৩৯ অর্থাৎ লোক সংখ্যার (৪৬·৬%)। ১৯৫১ খৃঃ শিক্ষিতের (লিখিতে পড়িতে সক্ষম) সংখ্যা ছিল মাত্র ৭,২৭৬ এবং করদাতার সংখ্যা ছিল ২৮৫৯ অর্থাৎ মোট জন সংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ। (হুগলী জেলার ইতিহাস ও পৌর সভার বাৎসরিক কার্য বিবরণী)। জন সংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৩০,৮২০ (হুগলী জেলা বিবরণী—১৯৭২)

।। খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ।।

বাঙালীদের সম্বন্ধে 'ভেতো বাঙালী' বলে যে অপবাদ, সে বহুকালের। দু'বেলা দু'মুঠো চালের ভাত খেতে পেলে তার যেমন তৃপ্তি, অন্য কিছুতে তেমন তৃপ্তি সে পায়না। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাসে' প্রাচীন যুগে বাঙালীদের খাদ্য তালিকার মধ্যে ভাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আজকের রেসনের যুগে শ্রবণ-সুখকর হলেও তদনুযায়ী রসনার তৃপ্তি সাধনের কোনও উপায় নেই :— "পাতে গরম ভাত দেওয়া হয়েছে— তা থেকে ধোঁয়া উঠছে, প্রত্যেকটি কণা তার অভগ্ন, একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যায়; সরুসরু প্রত্যেকটি দানা তার সুসিদ্ধ, সুস্বাদু এবং দুধের মত সাদা, তাতে ভুরভুর করছে চমৎকার গন্ধ।" একটি প্রাচীন শ্লোকে বলা হয়েছে—"যিনি রোজ কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল আর পাট শাক পরিবেশন করেন, তাঁর স্বামীই পুণ্যবান।"

"নিরামিষ আহারে বাঙালীর কোনদিনই রুচি নেই। বাঙালীর এই মৎস্য প্রীতি আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনদিনই ভাল চোখে দেখেনি। ...... বাংলা দেশের চিরাচরিত আমিষ খাওয়ার প্রথা টলাতে না পেরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শেষ পর্যন্ত তাকেই কিছুটা বিধি-নিষেধের মধ্যে ফেলে শাস্ত্র সম্মত ক'রে নিলেন। তাঁরা বললেন, মাছ-মাংস খাওয়া দোষের নয়— তবে কয়েকটা বিশেষ বার বা তিথিতে না খেলেই হল। ... আজকের মতই প্রাচীন বাংলাদেশেও ইলিশ মাছ বাঙালীর বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল; ইলিশ মাছের তেল বিশেষ কাজে লাগত।" এই প্রসঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধার যোগ্য :—

"ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে।
ওড্রে ভ্রাতৃ বধূভোগে গৌড়ে মৎস্য ভক্ষণে ॥" ইত্যাদি

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্বয়ং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বিধান দিলেন যে — পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বাঙালীই ডায়াবিটিস্ রোগী, কাজেই তাদের পক্ষে রুটি খাওয়ার অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

ঠিক উক্ত বিধান অনুযায়ী না হলেও, অবস্থার চাপে পড়ে এতদঞ্চলবাসী এক বেলা ভাত আর এক বেলা রুটি খাওয়ার অভ্যাস

করতে বাধ্য হন। কথায় বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।'

প্রথমে রেসনে মাথাপিছু সপ্তাহে বারশো গ্রাম চাল আর ঐ পরিমাণ গম দেওয়া হত, কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে বরাদ্দ ক্রমশঃ কমতে থাকে তার ফল স্বরূপ অধিকাংশ পরিবারেই খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্ত্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। রেসনে যেমন ধাপে ধাপে চালের দাম বেড়েছে তেমনই খোলা বাজারেও (ব্ল্যাক মার্কেটে) হু হু করে চালের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে। এই সময়কার সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন শ্রীশীতাংশু নাথ গুপ্ত- '১৩৫৯-এর (ইং ১৯৫২) দুর্গাপূজা' শীর্ষক কবিতার মাধ্যমে। তার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার যোগ্য :

"এবারের দুর্গাপূজা, দশভূজা! কেমন হোল, বল্‌তো খুলে,
খেলে কি? আটার রুটি? কড়াই শুঁটি? পুঁইপাতা, শাখ, বার্লিগুলে,
রেশনের এই বাজারে নগদ, ধারে চাল মেলে না একটি মুঠো,
কি যে মা অদিন এলো, প্রাণটা গেলো, মাসনা যেতে ব্যাগটা ফুটো।

* * * * *

দেখেছিস হাট-বাজারে দোকানদারে শাঁখের করাত চালায় কেমন?
ক্রেতাদের পয়সা চুষি নয় সে খুশী, কথার জ্বালায় জ্বালায় তেমন।
শুনে মা খুসী হবে, আমরা সবে মজে' গেছি অহিংসাতে,
ছেড়েছি মাছের আশা, হোক না খাসা, স্বাধীনতার সুপ্রভাতে।
দুধে আর নাই নবনী, এম্‌নি শনি লেগেছে মা গ্রহের ফেরে,
শুধু মা রংয়ের বাহার আছে তাহার, জলভরা সব দুধের কেঁড়ে!
এ পোড়া বাংলা দেশে ভেলায় ভেসে কেনই এলে, তাই যে ভাবি,
হোক না মা জয় পরাজয় দে বরাভয়, তোর চরণে জানাই দাবী।"

ইত্যাদি।

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও তরুণ সমাজে কাপড়ের পরিবর্ত্তে প্যাণ্ট পরার রীতি প্রায় সার্বজনীন হয়ে দাঁড়াল। এযুগের স্কুল কলেজের ছাত্রদের বেশভূষা দেখলে বোঝাই যাবে না যে

মাত্র একদশক পূর্বেও কাপড় জামা পরে ছেলেরা বিদ্যালয়ে যেত। বয়স্ক মহলে পদব্রজে চলার অভ্যাসও কমতে থাকে। অফিসগামী চাকুরীয়ার দল যাঁরা ইতিপূর্বে পায়ে হেঁটে ষ্টেসনে যেতেন, তাঁরাও রিক্সা ছাড়া আর পথ চলতে পারেন না। নবনির্মিত হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে যাঁরা হেঁটে বড়বাজার এলাকায় যেতেন, তাঁরাও ট্রা.মর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন—১৯৪৩ সালে ব্রীজের উপর দিয়ে যান বাহন চলাচল আরম্ভ হওয়ার পর থেকে। (ভাগীরথীপর্ব—শ্রীসুবোধ চক্রবর্ত্তী)

আর্টের দোহাই দিয়ে প্রতিমার য.থচ্চারও এ যুগের একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তন। যে মাতৃমূর্ত্তি দর্শনে একদিন দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হ'ত সে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে যে সব মূর্ত্তি গড়া হতে থাকে তাতে আর যাই থাক, উক্ত ভাবের একান্ত অভাব সহজেই চোখে পড়ে। আরও একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তন হল—ছাড়াছাড়া কাঠামোয় লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির অধিষ্ঠান। একান্নভুক্ত পারবারে বোধহয় আর কেউ বাস করতে চান না। সামাজিক পরিবর্ত্তন ও রুচিভেদের প্রতিফলন দেবতার প্রতিমার মধ্যে এবং পূজা ব্যবস্থার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। নাট মন্দির ছেড়ে দেবতারা সব নেমে আসেন বারোয়ারী তলায়-রাস্তার মোড়ে মোড়ে. চট্ ত্রেরপলের ছাউনির নিচে, একক দশক ক'রে ভজন দরে।

টেবিল চেয়ারে খাওয়া ও খাওয়ানর (ভোজ বাড়ীতে) প্রথা এযুগেরই অবদান।

নব নব শিক্ষায়তন।

১৯৩৭ সালে পৌরসভা কর্ত্তৃক গৃহীত অবৈতনিক শিক্ষা প্রকল্প অনুযায়ী যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার গ্রহণ করা হয় তার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ৪৩৬) এবং তদনুযায়ী

চারবাত্তির কাছে যে বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয় তার দ্বারা তৎকালীন ৩নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ ছাত্রবৃন্দের যোগদান করা সহজসাধ্য হলেও দূরবর্ত্তী অঞ্চলের অর্থাৎ ৪নং ওয়ার্ডের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অঞ্চলের ছাত্রদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে এবং স্থান সংকুলানেরও অভাব ঘটে। এই কারণে ১৯৪৪ খৃঃ ১ লা মে তারিখে পৌরসভা কর্ত্তৃক মাসিক ৫৲ টাকা ভাড়ায় অনাথ আশ্রমের দুটী ঘর ও বারাণ্ডায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিভিন্ন কারণে বিশেষতঃ অনাথ আশ্রম কর্ত্তৃক উক্ত কক্ষ দুটীর ব্যবহার অত্যাবশ্যক হওয়ায় আলোচ্য ৪নং ওয়ার্ডের বিদ্যালয়টি শেষ পর্যন্ত চারবাত্তির (হাড়িপাড়া) নিকটস্থ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং প্রাতঃ কালীন বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হয়।

বস্তি অঞ্চলে স্থাপিত হয় বিশ্বনাথ হরিজন বিদ্যালয় ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৪৭/৪৮ খৃঃ একটি প্রৌঢ় শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয় গোয়ালা পাড়া লেনে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং শিল্প সংস্থার শ্রমিকগণের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির পক্ষে উক্ত বিদ্যালয় দুটীর অবদান অনস্বীকার্য।

রিষড়া বিদ্যাপীঠ।

১৯৫২ সালের ১৫ই আগষ্ট স্থাপিত হয় বিদ্যাপীঠ নামক হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয়। 'গিরিনার' আশ্রমের মহান তপস্বী নাগা বাবার প্রেরণা এবং স্থানীয় মুকুটধারী লাল মহাশয়ের বদান্যতায় প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর এই প্রতিষ্ঠানের কার্য আরম্ভ হয়। ৺মুকুটধারী লাল, ঠাকুর প্রসাদ সাউ, শিব প্রসাদ সাউ এবং শহীদ আশ্রম মিলিত ভাবে প্রায় দশ বিঘা জমি বিদ্যালয়কে দান করেন। বলা বাহুল্য রিষড়া পৌরসভার সহসভাপতি শ্রীরাধারমণ লালের দীর্ঘকালের স্বপ্ন সার্থক হয় এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে। একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে হুগলী

জেলার মধ্যে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে রিষড়াতে প্রথম স্থাপিত এই বিদ্যাপীঠ একটি প্রশংসনীয় উদ্যম এবং রাধারমণ লালজীর অমর অবদান। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বস্তি অঞ্চলের হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট ছিলেন এবং ১৯২৬ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় "স্বামী চেতন প্রকাশ স্মারক গোপীচাঁদ পুস্তকালয়" (হিন্দী লাইব্রেরী) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের গুরু দায়িত্বভার তিনিই বহন করেছিলেন। পৌরসভার কার্য বিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৯২৮ খৃঃ তিনিই শিক্ষাকর ধার্য ক'রে বস্তি অঞ্চলে হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব আনয়ন করেন। (৪-৫-১৯২৮)

উক্ত বিদ্যাপীঠের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি ট্রাষ্ট বোর্ড গঠিত হয়। ইহার সদস্য ছিলেন ৺জিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, শ্রীযমুনা রায় শর্মা, ৺যোগেশ্বর রাম, রাম প্রসাদ সিং এবং শ্রীমতী কমলা দাস। ১৯/১/৫৩ তারিখে বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে তদানীন্তন খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। বিদ্যাপীঠের তখন শৈশবাবস্থা, মাত্র কয়েকখানি ঘর নির্মাণ করে বিদ্যালয়ের কায পরিচালিত হচ্ছিল। মন্ত্রীমহোদয়ের শুভাগমনে একটা নূতন প্রাণ সঞ্চার দেখা দেয়।

ক্রমশ: ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান হর্ম্যরাজী। এর পিছনে রয়েছে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য। মাত্র কয়েকশো ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু ক'রে বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা সহস্রাধিক এবং বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ও বিভাগ স্থাপিত হয়েছে ধীরে ধীরে।

ছাত্রগণকে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে "আলোক"

নামক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয় প্রায় প্রারম্ভিক কাল থেকেই। খেলাধূলার ব্যবস্থারও ত্রুটি করেননি পরিচালকবর্গ। নিজস্ব পুস্তকালয় এবং ডিবেটিং ক্লাশও (বাদ প্রতিবাদ) সংযোজিত হয়েছে ছাত্র বর্গের উন্নতি কল্পে। শিক্ষক বর্গের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের যোগ্যতার মানোন্নয়নের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মোট কথা সুপরিচালনার ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে, এক জায়গায় থেমে যায় নি।

।। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ।

মাহেশ ও রিষড়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বলতে কেবল মাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত বা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারা রূপায়নে উৎসর্গীত প্রাণ কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম বা সাধনভূমি নয়, এর অবদান বহুমুখী। জাতীয়তাবোধে, দেশপ্রীতিতে, সমাজ চেতনায়, সাহিত্য সাধনায়, একনিষ্ঠ কর্মীরূপে গড়ে তুলতে হবে বাংলার কিশোর-কিশোরীদের ; এই লক্ষ্য নিয়েই স্থাপিত হয় উক্ত আশ্রম। রিষড়ায় ছিল এ ধরণের আশ্রমের একান্ত অভাব।

১৯৬৪ সালে আশ্রম বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'কিশোর' পত্রিকা থেকে এই আশ্রম গড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে দেওয়াই ভাল।

তার আগের কথা হল স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ প্রথমে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম ছিল 'শান্তি আশ্রম' এবং ব্রহ্মচারী দ্বিজদাস হলেন বর্তমান স্বামী সোমানন্দ। প্রারম্ভিক যুগে সম্পাদক হিসাবে কার্য করেন ৺বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। (আমন্ত্রণ লিপি দ্রষ্টব্য)

"বাংলা ১৩৪৮ সাল। পয়লা বৈশাখ 'কিশোর বাংলা' নতুন চিন্তা

নিয়ে প্রকাশিত হল—জোড়া সাঁকোয়, ২৫ নং বলরাম দে ষ্ট্রীটের দোতলার সেই প্রায় জীর্ণ বাড়িটি থেকে। সংকল্প হল প্রেস হলে পত্রিকা ও প্রকাশনা সহজ হবে। দু'বছর পরে কিশোর বাংলা প্রেস হল। স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ হলেন অরূপ-ছোটদের কাছে হয়ে গেলেন তাদের প্রিয় 'অরূপদা।'

হঠাৎ ডাক এল রিষড়া থেকে—একটি নষ্ট আশ্রমকে গড়ে তুলতে হবে। এটি হবে কিশোর সভার শিক্ষণকেন্দ্র। আশ্রম কমিটি রেজিষ্টারী করা হল ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে। সভাপতি হলেন স্বামী শ্যামানন্দ।

প্রায় দু'বছর পরে ১৯৫২ সালের ২রা জানুয়ারী রিশড়ার পৌরসভাপতি — নরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায় মশায় পাঠশালার উদ্বোধন করলেন। মাত্র ১৩ জন ছাত্র। এই উদ্বোধন উপলক্ষে অনেকেই এসেছিলেন। এসেছিলেন বটুবাবু, শৈলেনবাবু, সুরেন বাবু, হরিনন্দন সিং এবং আরো অনেকে। চালা ঘরের মেঝেতেই চটপেতে ক্লাশ হল।

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাতে এই চালা ঘরের আয়তন বাড়াতে হল।

১৯৫৩ সালের পয়লা মে থেকে এই পাঠশালার চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদন লাভ করে। সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এবার ভার পড়ল ব্রহ্মচারী দ্বিজদাসের ওপর। ত্যাগী কর্মীদের সান্নিধ্যে ছেলেদের চরিত্র গোড়ে তোলার জন্যে ৫/৬টী ছাত্র নিয়ে ছাত্রাবাস খোলা হল।

১৯৫৫ সালের ২রা মে থেকে দ্বিতীয় পদক্ষেপের শুরু। ২রা জানুয়ারী সপ্তম শ্রেণী খোলা হল। যে নতুন কমিটি গঠিত হল তার সভাপতি হলেন পৌরপতি ৺সুনীল চন্দ্র আওন; সম্পাদকের ভার পড়ল স্বামী সোমানন্দের ওপর। ১৯৫৬ সালে ৪ শ্রেণী মাধ্যমিক পর্যন্ত অনুমোদন লাভ করে। এমনই ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে বিদ্যালয় গড়ার কাজ। পাকা বাড়ি তৈরীর কাজ তখন আরম্ভ হয়ে

গেছে। ১৯৫৯ সালে উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৯৬৩ সালে বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিবর্তন এল। বিবর্তন এল ঘর-দোর আসবাব-পত্রে। ইতিমধ্যে নার্শারী, নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠা হল, আর হল দাতব্য চিকিৎসালয় এবং গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা।

"এ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান ভবন, প্রায় ৭০টি ছেলের উপযোগী সুন্দর ছাত্রাবাস, শিক্ষক আবাস এবং আচার্য্য ভবন।" "পাঁচ ধরণের পাঁচটি বিদ্যালয় চলে এই আশ্রমের পরিচালনায়। মোট কথা এর যাত্রাপথ রুদ্ধ হয়নি—আশ্রমের উন্নতি, বিদ্যালয়ের উন্নতি চলেছে—শিক্ষায়, শৃঙ্খলায়, আদর্শে ও নিষ্ঠায়।

বলাবাহুল্য, আশ্রম গড়া থেকে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পিছনে বহু লোকের সহৃদয় দানের কথা উল্লিখিত আছে আশ্রমের কার্য বিবরণীগুলির মধ্যে। স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-গুলি এদের মধ্যে অন্যতম। রিশড়ার শ্রীমায়ালাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পিতা স্বর্গীয় রসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুণ্য স্মৃতিতে আশ্রমে একটি নলকূপ ক'রে দিয়েছেন। রিশড়া পৌর সভা বিনামূল্যে জল সরবরাহের একটি সংযোগ দিয়েছেন। আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি অনেকেই দিয়েছে-।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন সময়ে ক্রীত ও দান হিসাবে প্রাপ্ত প্রায় সাড়ে এগার বিঘা জমি আশ্রমের সম্পত্তি। ছেলেমেয়েদের আনার জন্যে চালু হয়েছে বাসসার্ভিস ৪টি ভ্যানরিক্সার ব্যবস্থাও রয়েছে। আশ্রমে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা, শ্যামা পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথি প্রভৃতি উৎসবও সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। ১৩৭৩ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১ শতের উপর।

এর পরই ১৯৫৩ সালে হেস্টিংস ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত হয় 'সাহা বিদ্যালয়'—হিন্দীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের

উদ্দেশ্য নিয়ে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন— স্থানীয় অধিবাসাদের অর্থানুকুল্যে।

সমসাময়িক কালে প্রেসিডেন্সি জুট মিলের দক্ষিণাংশে গেটের সন্নিকটে স্থাপিত হিন্দী বিদ্যালয়টি নিঃসন্দেহে বাগখাল অঞ্চলের হিন্দী ভাষাভাষী ছাত্রবৃন্দের পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক হয়েছিল কিন্তু অনিবার্য কারণে কালক্রমে উক্ত বিদ্যালয়টি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল এই বিদ্যালয় ভবনে। বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উক্ত নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা অংশ গ্রহণ করতে বিরত হয়নি।

এ্যাকী বিদ্যালয়

উক্ত বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৫৫ সালে অ্যালকেলি কেমিকেলের কর্মীদের সন্তানবর্গের শিক্ষাদান কল্পে। পরবর্তীকালে এই শিক্ষায়তনটির নামকরণ হয় জে, এম, লাল স্কুল। ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০। প্রতিষ্ঠাকালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১৫। "For the children of employees there is the Vidya-mandir. It was started in 1955 at the instance of the Works Director, Dr. E. C. Fairhead. It is a primary school with 115 children and 5 teachers…the Company contributes towards supply of free milk to all pupils and subsidised school uniforms" (Roundel May, 1962).

বলা বাহুল্য উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে রিষড়ার অধিবাসীদের সংখ্যা নগণ্য নয়।

॥ বাণী ভারতী ॥

১৯৬০ সালের শেষের দিকে জয়শ্রী টেক্সটাইলস্ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ মধ্যে 'বাণীভারতী' বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশেষ ধরণের শিক্ষাদান ব্যবস্থা এই বিদ্যালয়টির বৈশিষ্ট। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে বিদ্যালয়গৃহ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়। হিন্দী শিক্ষার্থী শিশুছাত্র ছাত্রীদের বাসগৃহ থেকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার জন্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে আচ্ছাদন বিশিষ্ট ছোট ছোট রিক্সাগাড়ীর প্রবর্তন করেন তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই প্রসঙ্গে হুগলী জেলা বিবরণী (১৯৭২) থেকে রিষড়া মহিলা মণ্ডল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য :

"Social segregation, as iu the case of labour group, is found at higher levels also. For example a womens association, the Rishra Mohila Mondal, is composed of wives of executives from the industrial units in the neighbourhood. There are altogether 36 members of whom only three are Bengalies, the president and secretary both being non-Bengali.

অর্থাৎ উক্ত মহিলামণ্ডলের মোট ৩৬ জন সভ্যার মধ্যে মাত্র ৩ জন বাঙালী। সভাপতি ও সম্পাদিকা দুজনেই অবাঙালী। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে যেমন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেও তেমনি পদাধিকার অনুযায়ী শ্রেণীগত পার্থক্য বর্তমান।

বাঙ্গুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৯৪৭/৪৮ সালে ক্যালকাটা প্রপার্টিজ্ লিঃ বাঙ্গুর পার্কে

জমি বিক্রয় কালীন যে দুটি সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দিয়েছিলেন তার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ পার্ক স্থাপিত হলেও বিদ্যালয় স্থাপনের কোন আগ্রহ দশ বৎসরের মধ্যে তাঁরা প্রকাশ করেননি। এদিকে তখন পার্ক এলাকায় অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ১৯৫৯ খৃঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় তঁাদের বহির্বাটিতে "শিশুভারতী" প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় উক্ত অভাব আংশিকভাবে পূরণ হলেও প্রয়োজনের তুলনায় সেখানে স্থানাভাব বশতঃ অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করা সম্ভব হয়নি।

উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় অধিবাসীরা ক্যালকাটা প্রপাটিজ্ লিঃ এর নিকট আবেদন নিবেদন করতে থাকেন এবং তাঁদের প্রতিশ্রুত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে দাবী জানান। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীআশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় তাঁর বাসভবনের একাংশে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয় ১৯৬০ খৃঃ ১১ই জানুয়ারী তারিখে। তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৫ জন।

ক্যালকাটা প্রপাটিজ লিঃ ২০ কাঠার মধ্যে দশ কাঠা জমি ও গৃহ নির্মাণ উপলক্ষে ৫০১্ নগদ সাহায্য দান করেন। বলা বাহুল্য স্থানীয় অধিবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বর্ত্তমান বিদ্যালয় গৃহ। প্রায় আট বছর পরে ১৬-৪-৬৭ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে প্রথম পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। এই সময় পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন পৌর প্রধান ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ সভাপতি শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীপ্রসাদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়

ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬৫। গৌরবের বিষয়, বিদ্যালয়ের ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৬ সালের বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের শতকরা হার ছিল পুরাপুরি। তিনজন সহকারী শিক্ষক সহ প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীঅসিত কুমার রায়চৌধুরী। প্রাক্তন পৌর পতি ৺সুশীল চন্দ্র আওনের সাহায্যে ও সহায়তা লাভে বিদ্যালয়টির সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হয়।

এরপর উল্লেখযোগ্য হল মোড়পুকুর অঞ্চলে ১৯৬২ খৃঃ (অবিনাশ চন্দ্র সেন রোডে) শ্রীমনীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় স্থাপিত 'বিদ্যানিকেতন' নামে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। মোড়পুকুরে ক্রমবর্দ্ধমান লোক সংখ্যার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কল্পে তাঁর এই উদ্যম ও সংসাহস সত্যই প্রশংসণীয়। এর দ্বারা বালিকাদের রেল লাইন পার হয়ে এক মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী জি, টি, রোডের নিকট রিষড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদানের ক্লেশ দূরীভূত হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র বিদ্যালয়

৫-৫-৬২ তারিখে রিষড়া সেবাসদন কর্তৃপক্ষ মাননীয়া ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান ক'রে সম্মান প্রদর্শন করেন। ঐ দিনই মন্ত্রী মহোদয়া কর্তৃক 'ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটকের প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয় নির্মানোপযোগী ভূমিখণ্ড সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়—গভর্ণমেণ্ট কলোনীর অধিবাসীদের কল্যানার্থে।

১৯৬১ সালের মার্চ্চ মাসে সাধনকাননের একটি ভাড়াটে বাড়ীতে এই বিদ্যালয়ের প্রথম আত্ম প্রকাশ ঘটে। পূর্বোক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যা-

লয়ের ব্যবহার্য কুটীর সদৃশ কক্ষগুলি প্রথম নির্মিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর যোগ্য পরিচালনায় এবং সরকারী সাহায্যে বর্তমান অট্টালিকা গড়ে উঠে এবং উক্ত বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

৫-১-৬৪ রবিবার অপরাহ্নে উক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের' ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং নব নির্মিত বিদ্যালয় ভবনেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

সম্পাদক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক 'ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন' প্রতিষ্ঠিত পবিত্র সাধন কাননের স্মৃতি বিজড়িত এই মোড়পুকুর গ্রামে আলোচ্য বিদ্যালয়টির নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর পতি ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হুগলী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ সরখেল।

কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি শ্রী এন, সি, ঘোষ ও শ্রী এম, সি, চ্যাটার্জী কেশবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা ও অবদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তিনিই যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রথম প্রবর্তক এই দাবী উপস্থাপিত করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কেশব চন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ' নামটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রদত্ত। (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন চরিত ও পরিশিষ্ট পৃঃ ২৪)।

এই প্রসঙ্গে বস্তি অঞ্চলে ১৯৬২ খৃঃ আনোয়ার-উল-উলুম প্রাইমারী স্কুল এবং আঞ্জুমান ফলাহুল মুসলেমিন কর্তৃক আঞ্জুমান নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও উল্লেখনীয়

সুখদাময়ী নারী শিল্পমন্দির

সাধারণ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে উক্ত শিক্ষায়তনটির পার্থক্য বিশেষ

তাবেই উল্লেখযোগ্য। মহিলারা যাতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে দুঃস্থা অসহায়া মাতৃজাতি স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজে পায় এই উদ্দেশ্যে সমাজ সেবী ৺সাধনচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ৺সুখদাময়ীর স্মরণার্থে একখণ্ড জমি ও দ্বিতল বাড়ী উক্ত শিল্পমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে দান করেন। মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে শ্রীমতি বিভা মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এই শিল্পমন্দিরের কার্য আরম্ভ হয়। শ্রীললিত মোহন হড় প্রদত্ত ২ খানি তাঁত এবং ১৯৬৫ সালে ৺মাণিকলাল দের স্মৃতিরক্ষার্থে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণ কর্তৃক প্রদত্ত একখানি সরঞ্জাম সহ তাঁত নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কার্য অগ্রসর হতে থাকে। পৌর সভার অর্থ সাহায্যে পরে আরও ২ খানি তাঁত কেনা হয়। এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন লাহার সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৩ সাল থেকে সীবন বিভাগে 'লেডি ব্র্যাবোর্ণ' ডিপ্লোমা কোর্স আরম্ভ হয়, এবং শ্রীমতি রেবা সরকারের নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে প্রেরিত ৩ জন ছাত্রী প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশংসাপত্র লাভ করে। ১৯৬৭ সালে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২৩ জন। প্রতি বৎসরই ২৩ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর প্রদান করে এবং প্রতিষ্ঠানটির গৌরব অক্ষুন্ন রাখে। বলা বাহুল্য বহু ব্যক্তির দান ও নানা প্রকার সাহায্যে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং পৌর সভা প্রদত্ত মাসিক ১০৲ অনুদান লাভে সমর্থ হয়েছে। ছাত্রীদের নির্মিত বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যগুলি প্রায় প্রতিবৎসরেই প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণের পরিদর্শনের ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

॥ চন্দ্রনাথ শিশুভারতী ॥

১৯৫৯ সালের ১লা মে তারিখে শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় শিশুভারতী নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯ জন। তখন না ছিল বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ী, না ছিল আসবাব পত্র। ১৯৬০ সালে বিদ্যালয়টি যদিও সরকারী অনুমোদন লাভ করে কিন্তু দিন দিন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গৃহ সমস্যা প্রকট হয়ে উঠে।

উক্ত সমস্যার আংশিক সমাধান ঘটে ৺সাধনচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের বদান্যতার ফলে। তিনি নবীন পাকড়াশী লেনে ১৯৬৪ খৃঃ বিদ্যালয়কে বিস্তৃত জমি দান করেন এবং তদীয় পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে উক্ত বিদ্যালয়ের নাম করণ করা হয় 'চন্দ্রনাথ শিশুভারতী'। প্রারম্ভিক কার্য হয় একটি লম্বা চালা ঘরে যেটি ক্রমশঃ পাকা ঘরে রূপায়িত হয়।

১৯৬৭ সালে ৩০-৬ তারিখে শ্রীরামপুর রোটারী ক্লাব কর্তৃক বিদ্যালয় ভবনের দক্ষিণাংশে একটি ব্লক সংযোযিত হয়। তাঁদের এই সহানুভূতি ও দানশীলতার জন্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ১৯৬৯ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০ জনে। বলা বাহুল্য প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়টি প্রাথমিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে উঠার সুযোগ লাভ করে। প্রত্যহ প্রার্থনা, জাতীয় সঙ্গীত ও খেলাধুলা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাণী বন্দনা, স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, নেতাজী জন্ম দিবস প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও ১৯৫০ খৃঃ মোড়পুকুর বিশ্ব-পরিবার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ডাঃ হরিপদ কর ও

শ্রীসদানন্দ বিশ্বাসের প্রচেষ্টায়। এর পর ১৯৫৪ খৃঃ পৌর সদস্য শ্রীসুনীল কুমার দাসগুপ্তের প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট কলোনীতে সরকার প্রযোজিত (Sponsored) দুটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ ছাড়াও রয়েছে নূতন গ্রাম, সুভাষ নগর রেলওয়ে কো-অপারেটিভ কলোনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি। (পৌর সভার সুবর্ণজয়ন্তী পত্রিকা)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়ের সন্নিকটেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর প্রদত্ত জমির উপর স্থাপিত হয়েছে রিষড়া পৌর সভা পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয় ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এবং নিজস্ব ভবনও নির্মিত হয়েছে ১৯৬৬/৬৭ সালে। গৃহ নির্মান সম্পূর্ণ না হওয়া পযন্ত উক্ত বিদ্যালয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়ের সৌজন্যে তাঁদের বিদ্যালয় ভবনে প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

বিধান চন্দ্র কলেজ।

উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলি নিঃসন্দেহে রিষড়া ও সংযুক্ত গবর্ণমেণ্ট কলোনীর ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম হলেও তখনও পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে এতদঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, হাওড়া উইমেন্স কলেজ, কলকাতার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করতে হচ্ছিল। এই সমস্ত মহাবিদ্যালয়গুলির আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় ভর্ত্তি হবার সুযোগ লাভ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই অভাব আংশিক দূরীভূত হয় ১৯৫৭ সালে দেওয়ানজী বংশের শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যা-য়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উক্ত কলেজ স্থাপনার ফলে। বলা বাহুল্য, এই গড়ার কাজে বাধা বিঘ্ন এসেছে ধাপে ধাপে, কিন্তু সিনেটর শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় এবং তদীয় ভ্রাতা শ্রীকুমুদ কান্ত মুখোপাধ্যায় (তদানীন্তন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক) উভয়ের যুগ্ম সহযোগিতা

এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা সে সমস্ত বাধার শৃঙ্খল মোচন করতে সক্ষম হয়েছিল অতি সুন্দরভাবে। তাঁদের এই নিষ্ঠা ও উদ্যম সকলেরই প্রশংসনীয়।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল গৃহ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ৯-৩-২৫ তারিখে সম্পাদিত মহৎ হৃদয় এ্যাডাম বার্কমায়ার সাহেব প্রদত্ত ভূসম্পত্তির সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাষ্টের অন্যতম ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত শ্রীভূষণ বসু মহাশয়ের সহযোগিতায়। বার্কমায়ার ব্রাদার্সের শেষ বংশধর স্যার হেনরি বার্কমায়ার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাওয়ার আগে ৬-৭-৫৩ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলমূলে বিখ্যাত এটর্নি শ্রীভূষণ বসু মহাশয়কে উক্ত ট্রাষ্টের একমাত্র পরিচালক নিযুক্ত করে যান।

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এমনকি প্রাথমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, এই তিন তিনটি বিদ্যালয়ের কার্য গঙ্গা-তীরবর্তী ৮ বিঘা জমির উপর স্থাপিত এম, ই, স্কুল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। সৌভাগ্যক্রমে ৩-২-৫৭ তারিখে পোড়ামাঠে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। ডাঃ রায় ভাগীরথী তীরবর্ত্তী প্রশস্ত প্রাঙ্গনে পরিশোভিত উক্ত বিদ্যালয় ভবনের মনোরম দৃশ্যে মুগ্ধ হন এবং স্থানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী উক্ত তিনটি বিদ্যালয়কে জি, টি, রোডের পশ্চিম পার্শ্বে নির্মীয়মান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনের উভয় পার্শে স্থানান্তরিত করা সাব্যস্ত হয়। ডাঃ রায় প্রস্তাবিত কলেজটিকে তাঁর নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব সমর্থন করায় উপস্থিত জনগণ উল্লসিত হয়ে উঠেন। কলেজ গৃহ মধ্যে তাঁর শুভ পদার্পণ স্মরনীয় হয়ে আছে তদুপলক্ষে গৃহীত আলোক চিত্রের মধ্যে। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীভূষণ বসু মহাশয় পোড়ামাঠের ৫ বিঘা জমি বিদ্যালয় তিনটিকে দান করে দেন। বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব গৃহাদি নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত কলেজের কার্য বৈকালে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে মাত্র ৬টি ছাত্র নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট ষ্ট্যাণ্ডার্ড হিসাবে কলেজের কার্য আরম্ভ হয় এবং শ্রীরামপুর, রিষড়া ও মাহেশের ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরিচালক কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি পদে ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীভূষণ বসু, সহ-সভাপতি পৌর প্রধান শ্রীসুশীল চন্দ্র আওন এবং সম্পাদক শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়। (কলেজ পত্রিকা ১৯৬৪)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই সালেই (১৮৫৭-১৯৫৭) স্বর্গীয় কালী কুমার দে (বক্সী) কর্তৃক স্থাপিত 'বঙ্গ বিদ্যালয়ের' শতবর্ষ পূর্ণ হয় এবং এই বৎসরের ১৯-৩-৫৭ তারিখে সেই প্রাচীন জীর্ণ ভবনটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনে অর্থ সংকুলানের তাগি'দ বিক্রী হয়ে যায়। শ্রীগোপাল চন্দ্র সাধুখাঁ ও ভ্রাতাগণ ৭০০০ সাত হাজার টাকায় শ্রীরামপুরে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি কিনে নেন। এইভাবে যে ১৪০০০ টাকা সংগৃহীত হয় তার মধ্যে ২০০০ টাকা দিয়েছিলেন সম্পাদক শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসুশীল কুমার আওনের দানও উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য রিষড়ার প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ছিলেন তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তাদের উন্নতিকল্পে তিনি যথাসাধ্য দান করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর মৃত্যুর পর সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন জেলা শাসক শ্রীযুক্ত গ্রেগরী গোমেশ, আই, এ, এস এবং সর্বশ্রী আতপ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও পঞ্চানন দাঁ পরিচালক কমিটির সভাপদ থেকে বিদায় গ্রহণ করায় শ্রীরামপুর ইণ্ডিয়া জুট মিলের ম্যানেজার শ্রী বি, বি, শর্মা সেই শূণ্য পদ পূর্ণ করেন।

অভিজ্ঞ ও কর্তব্যনিষ্ঠ অধ্যাপকবৃন্দ শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। প্রথম অধ্যক্ষ পদে বৃত হন শ্রীযুক্ত গিরীধন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পর ডঃ হরিমোহন ভট্টাচার্য, এম, এ, ; পি, এইচ, ডি। এর পর যিনি আসেন তিনি হলেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, এম, এ, এল, এল,

বি, (পি, এইচ, ডি)। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে কার্য পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ ; সম্পাদক শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ১৯৬২-৬৩ খৃঃ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর প্রচেষ্টায় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থায়ী ভাবে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১৯৫৯ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বি, এ, ষ্ট্যাণ্ডার্ডে পরিণত হয় এবং ১৯৬০ সালে বিজ্ঞান শাখা ও সান্ধ্য বি, কম শাখা সহ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

১৯৬৪ খৃঃ থেকে 'কলেজ পত্রিকা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, তার মধ্যে ২৩-১২-৬৪ তারিখে অনুষ্ঠিত স্পোর্টসে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত কে, কে, দত্ত এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সমর ব্যানার্জী। বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি ক'রে বিবৃতি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে ছাত্র সংসদ কর্তৃক। ইতিপূর্বে হাতে লেখা পাক্ষিক পত্রিকা 'দিশারী' এবং 'বাণী' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

গত দশ বৎসরের মধ্যে কলেজ ভবনের বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে নূতন নূতন সংযোজনের ফলে। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য তালিকাও হয়েছে পরিবর্ত্তিত। কার্যকরী সমিতির অস্থায়ী সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন শ্রীযুক্ত নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়। রিষড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করার পর গত ১৫-১২-৭৩ তারিখে হয়েছেন লোকান্তরিত। তাঁর আমলে কি প্রশাসন ক্ষেত্রে কি অধ্যাপনা বিভাগে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

২৮-৯-৭২ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে চুঁচুড়ায় জেলা ভিত্তিক সাপ্তাহিক মন্ত্রী সভায় যোগদান উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে

বিধান কলেজের ছাত্রপরিষদ ও ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে মুদ্রিত আকারে আটদফা দাবি সম্বলিত একটি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়।

৬-৯-৭৩ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় 'নিষেধ সত্ত্বেও পরীক্ষা হয়ে গেছে ২/৩ জায়গায়'' শীর্ষক সংবাদে বিধান চন্দ্র কলেজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :–

"যে দুটি কলেজে (বি, এ ও বি, এস, সি, পার্ট ওয়ান) পরীক্ষা হয়েছে সে কলেজ দুটি হল রিষড়া বিধান চন্দ্র কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় মুখপাত্র বলেন এর মধ্যে রিষড়া কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। খবরের কাগজ ও রেডিও মারফৎ পরীক্ষা হবে না জানানো সত্ত্বেও কেন পরীক্ষা নেওয়া হল জিজ্ঞাসা করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ না কি জবাব দেন – বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। কাগজের খবরকে বিশ্বাস করতে পারিনি।

॥ রিষড়া সেবাসদন ॥

শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হলেও রিষড়ায় চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত ও নগণ্য। 'কারমাইকেল চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারীও' ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হতে হতে একেবারে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা পূর্বের অখ্যাত ও অনাদৃত ক্ষুদ্র জনপদ রিষড়া তখন বিরাট শিল্প শহরে পরিণত হয়েছে। রুজির সন্ধানে শিল্প-উপনগরী রিষড়ায় তখন শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণীর চলেছে অব্যাহত গতি। একই সময়ে এসেছেন আর এক শ্রেণীর ভাগ্যহত মানুষের দল সীমান্তের ওপার হতে পুঞ্জীভূত দুঃখ ও বেদনা সম্বল করে। এই রূপান্তরের দিনগুলি যে কত সমস্যাবহুল ও বেদনাময় ছিল সে কথা আজ হয়তো অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন।

খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই; নিজ বাসভূমি হতে ছিন্নমূল এই সমস্ত মানুষ পথে প্রান্তরে সামান্য আচ্ছাদন রচনা ক'রে আত্মরক্ষায় ব্যর্থ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। ক্ষুধার্ত্ত মায়ের ,কোলে শীর্ণরুগ্ন শিশুর কান্নার রোল পথচারী মানুষের মনে বেদনার দাগ কেটে গেছে। এই সমস্যার সমাধান যে অত্যন্ত দুরূহ ও ব্যাপক একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু পরদুঃখকাতর ব্যক্তি কখনও নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারেন না তাই সমাজসেবী শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘটক মহাশয় এগিয়ে এলেন একটা বৃহৎ পরিকল্পনাকে রূপদান করতে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। অংকুরিত হল 'সেবাসদন' ১৯৫৬ সালে।

৬ই মার্চ্চ ১৯৫৬ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় উদ্বোধন করলেন একটি শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র। পরিচালক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটকের সৃজনী প্রতিভার গুণে পরবর্ত্তী যুগের অসামান্য কল্যাণকর হাসপাতাল গড়ে উঠে এই শিশু হাসপাতালটিকেই কেন্দ্র ক রে। রিষড়া পৌরসভা অনুদান দিয়ে এই শিশু প্রতিষ্ঠানটিকে সহায়তা জানাল তার প্রথম পদক্ষেপে। স্থানীয় ডাক্তারদের মধ্যে এগিয়ে এলেন ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ করুণা কিঙ্কর সরকার প্রভৃতি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতে। একটা ভাড়া বাড়ীতেই চলতে লাগল এই শিশু চিকিৎসাকেন্দ্র; একজন পার্ট টাইম কম্পাউণ্ডার নিয়োগ করা হল সামান্য বেতনে।

১।১।৫৮ তারিখে অধ্যাপক শ্রী অতুল সেন মহাশয়, সেবাসদন হাসপাতাল ভবনের শিলান্যাস করেন। সভাপতিত্ব করেন কুসুম প্রোডাক্টস লিঃ এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীজি, এস নিভেটিয়া। সম্পাদক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক গত ২ বৎসরের শিশু হাসপাতালটির সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রদান করেন এবং উৎসাহদাতা এবং সাহায্যকারীদের উদ্দেশ্যে সাধুবাদ জ্ঞাপণ করেন।

"ক্রমশঃ আশা ও ভরসায় পরবর্ত্তী দিনগুলি সহজ ও সুন্দর

হয়ে উঠতে লাগলো, অর্থীরা যোগালেন অর্থ, কর্মীরা দিলেন নিঃস্বার্থ শ্রম, শ্রেষ্ঠীর দানে ও সরকারী দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হয়ে উঠল এই প্রতিষ্ঠানের কলেবর।"

২১।৩।৫৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় নবনির্মিত প্রসূতি ভবনের উদ্বোধন করেন। রিষড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের বহু আকাঙ্খিত ও প্রয়োজনীয় এই প্রসূতি-আগার আধুনিক সাজসরঞ্জাম সমন্বয়ে লোক কল্যাণের পথে প্রথম পদক্ষেপ করল। দুঃস্থ ব্যক্তিদের সুবিধার্থে পৌরসভা একটি অবৈতনিক শয্যার ব্যয়ভার বহন ক'রে প্রভূত উপকার সাধন করেন; একথা বলাই বাহুল্য।

২২।৪।৬০ তারিখে ডাঃ ফুলরেণু গুহ মহোদয়া (Chairman, West Bengal Social Welfare Board) সেবাসদনের চতুর্থবার্ষিক অনুষ্ঠানে এবং অপারেসন থিয়েটারের উদ্বোধন উপলক্ষে সভানেত্রীর আসন থেকে মাত্র ৪ বৎসরের মধ্যে সেবাসদনের উন্নতিমূলক কার্যাবলীর সৌষ্ঠবদর্শনে ভূয়সী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন এবং অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। উক্ত সালের ২৫।১০।৬০ তারিখে সেবাসদন গৌরবান্বিত হল ভারতগবর্ণমেণ্টের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মাননীয় মেহের চাঁদ খান্নার শুভাগমনে। মন্ত্রী মহোদয়ের পরিদর্শান্তের মাত্র ৪ দিন পরে সদনের শিশু বিভাগও প্রসবাগার নির্মাণ এবং আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৬০,০০০৲ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন।

২৪ ১২।৬১ তারিখে ফসফেট কোং লিমিটেডের ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত রামনিবাস বাঙ্গুর মহোদয় X' Ray ward (রঞ্জনরশ্মি বিভাগ) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে দ্বিতীয়বার সেবাসদনে পদার্পণ করেন। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই

বিভাগের নামকরণ করা হয়—"বিধানচন্দ্র এক্সরে ক্লিনিক" এবং এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্ণেল এম, সি, চ্যাটার্জি, পশ্চিম বাংলার ডাইরেক্টোরেট অফ্ হেলথ সার্ভিস।

১৯৬৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখে শ্রীরামপুর রোটারি ক্লাবের সৌজন্যে চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পুরবী মুখার্জি। ১৯৬৬ খৃঃ ২৪শে জানুয়ারী তারিখে রিষড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাঁর বদান্যতায় তদীয় জনক-জননী জ্ঞানেন্দ্র নাথ ও আমোদিনী দাঁ ব্লকের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত ভি. এস, সি বনার্জি, আই, এ, এস মহোদয়। 'কালীচরণ চক্রবর্ত্তী' এবং 'কাদম্বিণী ঘটক' ব্লকের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় উক্ত তারিখেই।

এইভাবে একের পর এক নূতন নূতন বিভাগ স্থাপিত হওয়ার ফলে 'সেবাসদন' তখন একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয় এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্র যেটি হুগলী জেলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করে। ১৯৬৪ খৃঃ মোট ৫০টি শয্যার মধ্যে সার্জিকাল ও মেডিক্যাল বিভাগে ২০টি, প্রসূতি বিভাগে ২০টি এবং চক্ষু বিভাগে ছিল ১০টি শয্যা। মাত্র ৮ বৎসর পরে উক্ত শয্যা সংখ্যা একশোতে বর্দ্ধিত হয়। সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়—"রিষড়া সেবাসদনে নতুন ওয়ার্ড"। চন্দননগর, ১৭ জানুয়ারি সি, এম, ডি এর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীবি, এস, গাঙ্গুলী শনিবার (১৫-১-৭২) বিকালে রিষড়া সেবাসদনে ১০ শয্যার একটি নূতন ওয়ার্ডের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করেন। সেবাসদনের এই সংযোজনের জন্য সি, এম, ডি, এ অর্থ সাহায্য করেছেন। এতে সদনের মোট শয্যা সংখ্যা দাঁড়াল একশ। শ্রীভূপতি মজুমদার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।"

বলাবাহুল্য, ইতিপূর্বে ১৯৬৭ সাল থেকে সেবাসদনে বহু নূতন ব্লক সংযোজিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৬৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব বিপ্লবী মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন সেই সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় দেশভক্ত সৈনিকগণ শেষজীবনে যাতে সুষ্ঠু চিকিৎসা, সম্মানজনক ও যথোচিত সেবা যত্নের সুযোগ পান সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের অর্থ সহায়ে একটি পৃথক স্বাস্থ্যভবনের শিলান্যাস পর্ব সমাধা হয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক। বর্ষীয়ান বিপ্লবী নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী গাঙ্গুলী এবং শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। (শ্রীরামপুর সমাচার ও ষ্টেসনম্যান ২১-১২-৬৯) "More than 100 British-era revolutionaries were among others who attended the function." এই নূতন ব্লকটির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় ৭-২-১৯৭১ তারিখে এবং এই ব্লকটি "মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী" ওয়ার্ড নামে অভিহিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী মহারাজ ১২-৭-৭০ তারিখে সেবাসদন পরিদর্শন করেন (যুগান্তর ১৪-৭ ৭০) যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রীযুক্ত ললিত কুমার সান্যাল মহাশয় তাঁর রচিত 'বিপ্লবতাপস মহারাজ ত্রৈলোক নাথ নামক গ্রন্থে। তার কয়েক লাইন তুলে ধরছি পাঠকবর্গের অবগতির উদ্দেশ্যে : "একদিন চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য পরিবেশে অসুস্থ বিপ্লবীদের জন্য আরোগ্য নিকেতন নির্মানের যে বাসনা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল তাহাকে রূপ দিতে তিনি পারেন নাই, তাই তাঁহার ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। সেই ক্ষোভ মিটিয়াছে তাঁহার অনুগামী ও অনুরাগী বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত ও পরিচালিত এই 'হাসপাতাল' পরিদর্শনে। এখানে সেবার মানসিকতা অর্থের হিসাবনিকাশের যাঁতা কলে নীরস হইয়া পড়ে নাই। মানবিকতা এখানে

লাঞ্ছিত হইয়া দৈনন্দিন গতানুগতিকতায় সম্ভ্রম নষ্ট হয় নাই। পরিচালক ও কর্ম্মীর দল এখনও সেবাব্রতের আদর্শে বিশ্বাসী ও আসক্ত।

আনন্দোৎফুল্ল ত্রৈলোক্যনাথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতাল সম্মুখেই ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের স্মৃতিপুতঃ "সাধনকানন' বর্ত্তমানে তাঁহারই এক বিপ্লবী অনুগামীর বাসভূমি। উদ্যানে নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পার্থসারথির মূর্ত্তি। অশ্ববল্গাঘাতে পুরুষোত্তম অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিতেছেন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজঃ'। ত্রৈলোক্যনাথ আভূমি প্রণতঃ হইলেন।" (পৃঃ ২৯৮-৯৯)

রিষড়া সেবাসদনের কথা শেষ করার আগে একথা বলা প্রয়োজন যে এর সেবার কায দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে দূরের ও কাছের প্রশংসামুখর জনগণের মধ্যে। বিভিন্ন বিভাগের কার্যধারা পরিপূর্ণতা লাভ করছে পরিচালক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘটক ও তাঁর নিঃস্বার্থ সহকর্মীদের অক্লান্ত এবং সুযোগ্য পরিচালনার গুনে যার সংক্ষিপ্ত এবং সুচারু বিবরণ তুলে ধরেছেন ৯-২-৭৩ তারিখে 'পল্লীডাকের' সম্পাদকীয় নিবন্ধে।

"উপরোক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র ছাড়াও, সেবাসদন এই অঞ্চলের শিক্ষা সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হয়ে 'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়' স্থাপন করে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানীয় মোড়পুকর বাজার পরিচালনার ভার ন্যাস্ত করেন সেবাসদনের কর্তৃপক্ষের উপর। গ্রামাঞ্চলে 'বিধান স্মৃতি সেবা ভবন' নামে আরেকটি কেন্দ্র সেবাসদন কর্ত্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে এখানে একটি পশু চিকিৎসালয় গত কয়েক বছর ধরে সুন্দর ভাবে কাজ করে চলেছে।" (পৌরসভা সুবর্ণ জয়ন্তী পত্রিকা, ১৯৬৬)

॥ দশমিক মুদ্রার প্রচলন ॥

স্বাধীন ভারতে প্রচলিত হ'ল নূতন দশমিক মুদ্রা আর মেট্রিক

ওজনের বাটখারা। নয়া পয়সার হিসাব নিকাশে প্রথম পর্য্যায় বেশ কিছুটা অসুবিধা দেখা দিল ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে তার কারণ, আগে ছিল ৬৪ পয়সায় ১ টাকা আর এখন হলো ১০০ পয়সায় ১ টাকা। কাঁচ্চা ছটাকের বদলে এলো ডেকা হেক্‌টো ও কিলোগ্রাম। নূতন ক'রে লেখা হল ধারাপাত ও অঙ্কের বই। প্রাচীন শুভঙ্করের আর্যা ভুলে গিয়ে পরিবর্ত্তিত নয়া পয়সার গরমিলের আর্যা মুখস্থ করতে হল ছাত্র সমাজকে। পুরাতন লোহার বাটখারাগুলো অকেজো হয়ে পড়ে রইল যত্র তত্র এক নয়া পয়সার ক্ষুদ্রাকৃতি দেখে অনেকে ঠাট্টা করে বলতে লাগল যে আগেকার ছেঁদা পয়সার মাঝের যে অংশ টুকু টাঁকশালে পড়েছিল সেগুলো এখন কাজে লেগে গেল। ডাক টিকিট ও খাম পোষ্ট কার্ডের দামও নয়া পয়সায় ধার্য করা হল এবং টিকিটের উপর ছাপা হল খণ্ডিত ভারতের মানচিত্র।

বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব।

বিশ্বমানবতার মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে—১৯৫৭ সালে জুলাই ও আগষ্ট মাসে মস্কোতে ষষ্ঠ বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে ৪ঠা ও ৫ই মে (১৯৫৭) রিষড়া পোড়াঘাটে ও হাইস্কুলে আঞ্চলিক যুব ছাত্র উৎসব আয়োজিত হয়। নানাবিধ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবটি সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে উঠে। এতদুপলক্ষে যোগদানকারী সদস্য ও জনসাধারণ-কে রিষড়া থেকে প্রকাশিত কয়েকখানি পত্রিকা পাঠের অনুরোধ জানান হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'নবোদয়', 'প্রগতি' ও 'চরৈবেতি'।

॥ রিষড়া ওয়াটার ওয়ার্কস ॥

১৭।১১৫৭ রবিবার ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি

প্রকাশিত হয় :—

RISHRA WATER WORKS SCHEME APPROVED.

From our Correspondent.

SERAMPORE :- Nov. 16. The State Government has it is learnt, adproved the Water Works Scheme of the Rishra Municipality, Hooghly. at an estimated cost of 9 lakhs.

৬'' ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গভীর নলকূপের মাধ্যমে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে সমগ্র পৌর এলাকাকে দুটো জোনে ভাগ করা হল তার প্রথমটা রইল রেলের পূর্ব পারে আর দ্বিতীয়টা রইল রেলের পশ্চিম পার্শ্বে – নবগঠিত ৫নং ওয়ার্ডে।

১নং জোনে ১৯৬১ সালে স্থাপিত হল ১,৫০,০০০ গ্যালন জলাধার (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য) আর ২নং জলাধার হল ৪০, ০০০ গ্যালনের। যদিও ১½'' ব্যাস বিশিষ্ট নলকূপের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অপ্রতুল না হলেও অনেকেই গৃহসংযোজন নিতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ওয়াটার ওয়ার্কসের কার্যভার আনুষ্ঠানিকভাবে পৌর সভার হস্তে অর্পিত হল। অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পূর্ণ করার ভার অবশ্য রইল সরকারী ইঞ্জিনিয়ারের কর্তৃত্বাধীন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় লিখেছিলেন– "রেতে মশা, দিনে মাছি এই নিয়ে কলকাতায় আছি। সুখের মধ্যে একটি আছে, হাত বাড়ালেই কলটি কাছে॥ রিষড়ার হল এখন সেই অবস্থা, মাথার উপর এলেকট্রিক ফ্যান আর রান্নাঘর অবধি জলকল। বাথরুম'ত আছেই, পুকুরে মেয়েদের কাপড় কাচা বাসন মাজার বালাই প্রায় উঠেই গেল।

॥ বৈদ্যুতিক ট্রেন ॥

শতাব্দী পুরাতন ষ্টীম ইঞ্জিন চালিত রেলওয়ের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হল ১৯৫৭ সালে। বৎসরের শেষে ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্নে ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু উদ্বোধন করলেন হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি জংসন পর্যন্ত এই দ্রুতগামী ইলেকট্রিক ট্রেন। তিনি স্বয়ং এই বিদ্যুৎগামী ট্রেনের যাত্রী হিসাবে এই পথ অতিক্রম ক'রে অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেন। রেল রোডের এই নবরূপায়ন যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করল। ট্রেনে ভিখারী বালকের দল নূতন করে গান বাঁধল—'চোখে কয়লা পড়বে না' বলে। (উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী মেসার্স আর, ডি, ব্যানার্জি এণ্ড কোং-এর স্বত্তাধিকারী শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।)

এতদুপলক্ষে ঘটে গেল কয়েকটা দুর্ঘটনা, অপরিণামদর্শী কয়েকজন যুবক প্রাণ হারালেন তাঁদের হঠকারিতার ফলে। বাধানিষেধ লঙ্ঘন ক'রে তারা অনধিকার প্রবেশ করেছিল এই দ্রুতগামী ইলেক্ট্রিক ট্রেনের মধ্যে বা দরজার প্রান্তদেশে। (দৈনিক সংবাদ পত্র) নূতন ধরণের কামরাগুলো সত্তাই প্রশংসা পাবার যোগ্য বলে তৎকালে বিবেচিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য অকাতরে এই মূল্যবান সৌন্দর্যপূর্ণ কামরার ক্ষতিসাধন করতে এক শ্রেণীর যাত্রীরা কিছুমাত্র দ্বিধা সংকোচ বোধ করেন নি।

১০ই মার্চ্চ ১৯৬৬ তারিখে রিষড়া ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে ডাউন বারৌনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কয়েকখানা অগ্নিদগ্ধ হয় এবং সেই আগুন নেভাতে এসে দুটি দমকলও অগ্নিদগ্ধ হয়। (ফটো: যুগান্তর ১১।৩।৬৬) শ্রীনিশীথ দে লিখেছেন :—"গত ১৯৬৬ সালে বাংলা বন্‌ধ, খাদ্য আন্দোলন, বসিরহাটে গুলি চালনা থেকে এই রিষড়ায়

ট্রেন পুড়েছিল, তার মূল কারণ চালের দর উঠেছিল ১ টাকা কিলো। আজকে রেশনেও ১ টাকায় চাল পাওয়া যায় না। যে সব বামপন্থী এখন খাদ্য আন্দোলনের তোড়জোড় করেছেন তাঁরাই দাবি করেছেন, ১ টাকা কিলো দরে রেশনে চাল দিতে হবে।" (আমরা আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পূজা স্মরণিকা—১৯৭৩)

পর বৎসর অর্থাৎ ৮।৮।৬৭ তারিখ মঙ্গলবার খাদ্যের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে ট্রেন আটক করা হয়। রিষড়া ষ্টেশনে রেল লাইনে সকাল ৮॥ টা থেকে ট্রেন চলাচল অবরোধ করা হয়। বিকালে অবশ্য এই অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। (ফটো – আনন্দবাজার ৯।৮।৬৭) এই সময় মুড়ি মিছরি প্রায় একদর হয়ে গিয়েছিল, মুড়ির দর কিলো প্রতি ৫ টাকায় উঠে গিয়েছিল।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে রিষড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের দুরবস্থা সম্পর্কে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮।৭।৬৬ তারিখের আনন্দ-বাজারে। ফটো: লীনা দত্ত, রিষড়া।

মাতৃসদনের ভিত্তি স্থাপন

স্বর্গীয় নরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায় পৌর সভাপতি থাকাকালীন রিষড়ার উন্নতিমূলক যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়িত করার সংকল্প করেছিলেন মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা ছিল তার মধ্যে অন্যতম কিন্তু ১৯৫৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী আকস্মিকভাবে লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁর সে ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর প্রিয়পাত্র এবং অনুরাগী শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গুর ব্রাদার্সের নিকট থেকে মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দশকাঠা জমি সংগ্রহ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং ২৮।৭।৫৮ তারিখে উক্ত সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয়—শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন মিশ্র এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন কোন্নগর লক্ষ্মীনারায়ণ জুটমিলের ডাইরেকটার শ্রীযুক্ত ছোটেলাল কানোডিয়া। বহু সম্ভ্রান্ত অতিথি সমাগমে অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, এবং এই মহৎ প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করেন। ১৫।৮।৫৮ তারিখের শ্রীরামপুর সমাচারে এই অনুষ্ঠানের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত তিন বৎসরব্যাপী চেষ্টার ফলে এতদ্দুদ্দেশ্যে ১০ কাঠা জমি ও পঞ্চ সহস্রাধিক অর্থ সংগ্রহের বিবরণ প্রদান করেন। স্থানীয় কয়েকজন যুবকের আগ্রহে অভিনয়ের মাধ্যমে এতদ্দুদ্দেশ্যে প্রায় ৭১৯্ সংগৃহীত হয়।

সংগৃহীত অর্থানুকূল্যে গৃহাদি নির্মাণ কার্য কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দীর্ঘকাল অসম্পূর্ণ থেকে যায় যার ফলে স্থানটি দুর্বৃত্তদের নৈশবিহার ক্ষেত্র-রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। উপায়ান্তর না থাকায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালক সমিতির সদস্যগণের মতানুসারে উক্ত সম্পত্তি রিষড়া পৌরসভাকে অর্পণ করেন এবং তদনুযায়ী পৌরসভা কর্তৃক আনুমানিক বিংশ সহস্রাধিক অর্থব্যয়ে নির্মাণকার্য ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পর্ব শেষ করেন ১৯৬৬ সালে এবং পৌরসভা পরিচালিত দশশয্যা বিশিষ্ট এই মাতৃসদনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে অক্টোবর ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে, প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন আর, জি, কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ এইচ, কে, ইন্দ্র। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঃবঙ্গ পৌরসংঘের সম্পাদক ডাঃ গোপালদাস নাগ, ডাঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ চণ্ডীসাহা প্রভৃতি। ১।১১।৬৬ তারিখের

যুগান্তরে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়। ডাঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ডি, জি, ও অবৈতনিকভাবে এই মাতৃসদণের পরিচালনভার গ্রহণ করায় সকলের ধন্যবাদার্হ হন।

ইতিপূর্বে ৩রা জানুয়ারী ১৯৬০ তারিখে থানার সামনে জি, টি, রোডের পশ্চিম পার্শ্বে (প্রাক্তন পৌর কার্যালয়) ডাঃ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত রিপাবলিক নার্সিং হোমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয় নিমন্ত্রিত নাগরিকবৃন্দের আপ্যায়নের মাধ্যমে। এই নার্সিং হোমের কার্য অবশ্য প্রথমদিকে আরম্ভ হয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাঁর ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটস্থ নবনির্মিত অট্টালিকায়। ডাঃ প্রণব চ্যাটার্জির ন্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রসূতি বিদ্যাবিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই নার্সিং হোমের দ্রুত উন্নতি ও দীর্ঘ স্থায়ীত্ব সকলেই কামনা করেন।

কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ঘরখানিই আঁতুড় ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত, ফলে শিশু মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি। কিন্তু বর্তমানে প্রসূতি ও শিশুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার ফলে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে একথা বলাই বাহুল্য। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ছুঁই ছুঁই বাতিকও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং গঙ্গার প্রতি পূর্বেকার ভক্তি শ্রদ্ধা ম্লান হলেও গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য কমে নি, তাই আঁতুড়ে কেউ ছুঁয়ে ফেললে তার মাথায় একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছে—স্নান করা বা কাপড় ছাড়ার রীতি আজ অবলুপ্ত।

পৌরসভা পরিচালিত মাতৃসদনের বহির্বিভাগে পালাক্রমে আসন্ন প্রসবাদের পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন স্থানীয় কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ডাঃ করুণা কিঙ্কর সরকার, তাঁদের এই নিঃস্বার্থ জনসেবামূলক অবদান মাতৃসদনের প্রারম্ভিক যুগে সুনাম অর্জনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসে ঘন বসতিপূর্ণ বস্তি অঞ্চলে পৌর-সভা পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে আদৃত ও প্রশংসনীয় হয়ে উঠে। একদিকে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অপরদিকে 'কারমাইকেল চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী'র অবলুপ্তি এই উভয় সঙ্কটে স্বল্প বেতন ভোগী শ্রমিকাঞ্চলে এই নিঃশুল্ক চিকিৎসালয় জনকল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণণীয়।

পৌর সভার নব নব অবদান।

১৯৩২ সালে স্বর্গীয় নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৌর প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রিষড়ার ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রিট ও কোন্নগরের ক্রাইপার রোড এই দুটি প্রধান রাস্তায় প্রথম পিচ দেওয়া হয়। ১৯৩৭ খৃঃ বৈদ্যুতিক আলো ১৯৩৮ নিঃশুল্ক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ১৯৪২ সালে রিষড়ায় নিখিলবঙ্গ পৌর সংঘ সম্মেলনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তাঁর আমলে ১৯৫২ খৃঃ রেল লাইনের পশ্চিমাঞ্চলের কিয়দংশ পৌরাঞ্চলভূক্তির বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে। এরপর একান্ত তাঁরই চেষ্টায় এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে পৌর আইনের ১২৬(১)(৩) ধারার সংশোধন একটি বিশিষ্ট ঘটনা, এতদিন ইংরাজ শাসনাধীনে এতদঞ্চলে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহদানের অজুহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মিউনিসিপ্যাল কর প্রদান ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ ক'রে আসছিলেন তা ন্যায়সঙ্গতঃভাবে আংশিক হ্রাস করার ফলে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির যুদ্ধোত্তর যুগের ব্যয় বৃদ্ধির প্রবল চাপ সহ্য করার পক্ষে প্রথম সহকারী পদক্ষেপ বলা চলে কিন্তু দুঃখের বিষয় নরেন্দ্র কুমারের জীবনদীপ আকস্মিকভাবে ৬।২।৫৪ তারিখে নির্বাপিত হওয়ায় তিনি এই বর্দ্ধিত আয়ের মাধ্যমে পৌর অঞ্চলের অধিকতর উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনাগুলির রূপায়নের সুযোগলাভে বঞ্চিত হন।

ক্ষণজন্মা পুরুষ নরেন্দ্র কুমারের জীবন ছিল জনকল্যাণের দিকে সর্বদা প্রসারিত। বহুমুখী প্রতিভায়-ভাস্বর ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর অকালপ্রয়াণে তাই গুণমুগ্ধ দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। অন্ধকার নেমে আসে রিষড়ার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কক্ষে কক্ষে। বিয়োগ ব্যথাতুর জনগণের অন্তরের বাণী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠে তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে অর্পিত মুদ্রিত আকারে নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্রে—"হে কর্মযোগী, হে প্রতিভাধর তুমি আমাদের অনেক দিয়াছ — অনেক প্রগতির পথিকৃৎ তুমি, হে পরমাত্মীয় তোমাকে আমরা স্মরণ করি শূণ্যহৃদয়ে নয়নের জলে।

হে অমৃত পথযাত্রী, তোমার অমর আত্মা, অমৃতলোকে অধিষ্ঠিত — আবার তুমি আসিও যুগে যুগে, জনমে জনমে।"

(প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে রিষড়া-কোন্নগর পৌর—সদস্যগণ গুণীসম্বর্দ্ধনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে নরেন্দ্র কুমারের জীবদ্দশায় ১১।১২।৪৩ তারিখে ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটের শেষাংশ (কালুরায় লেনের সংযোগ থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত) নরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জি ষ্ট্রীট (N. K. Banerjee Street) নাম করণ করেন।)

পৌরকর্মচারীগণের পক্ষ থেকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয় তার কতকাংশ ৫২৮ পৃঃ উল্লিখিত হয়েছে, নিম্নে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত হল :—

"অনাথ আতুর তরে সেবার অদম্য ইচ্ছা তব
ছিল সঙ্গোপন,
'অনাথ আশ্রম' তাই ধন্য হ'ল স্নেহের পরশে
পেল জাগরণ।
পৌর সভা মাঝে ক্রমে বিছাইলে আপন আসন
অতি দৃঢতম,

বৈদ্যুতিক আলো শোভে সুচিক্কণ পিচঢালা পথে
অতি অনুপম।
'উচ্চ বিদ্যালয়' তব অদম্য উৎসাহে গড়া
নব অবদান.
যুগ যুগ ধরি তব কীর্তি ঘোষিবে বিদ্যার্থী যত
তুমি হে বিদ্বান।

✲ ✲ ✲ ✲

তব কীর্ত্তি, যশোরাশি ভাস্বর রবে চিরকাল
লহ হে প্রণাম,
'নরেন্দ্র প্রসূতি-সদন' গড়িলে জানি, পূর্ণ হত
তব মনস্কাম।"

তাঁরই আমলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর যক্ষা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় এবং রিষড়া পৌরসভা কর্ত্তৃক এই অত্যাবশ্যক চিকিৎসাকেন্দ্রে বাৎসরিক অনুদান প্রদত্ত হয়। অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে যক্ষার আক্রমণ তখন এতদঞ্চলে, বিশেষভাবে শ্রমিক মহলে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিষেধক চিকিৎসা ব্যবস্থার কল্যাণমূলক আরোগ্য নিকেতন হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান সময়োচিত ও সুলভে ঔষধপত্র প্রদান ব্যবস্থা মধ্যবিত্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবেই আদৃত হয়েছিল। (শ্রীরামপুর পৌরসভা শতবার্ষিকী স্মরণিকা)

শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় সংকলিত কর্মবীর নরেন্দ্র কুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৯৭০ সালের রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তা থেকে কয়েকটি তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

নরেন্দ্র কুমারের জন্ম হয় ১২৯৮ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

তাঁর পিতার নাম ডাঃ কিশোরীলাল বন্দোপাধ্যায় ও মাতার নাম সরস্বতী দেবী। ১৩১৪ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান থেকে তিনি বি, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। ১৩২০ সালে তিনি সসম্মানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৬ খৃঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই — আলিপুর কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এই সময়ে তিনি স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় — শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সান্নিধ্য লাভ করেন। অল্পকাল পরে মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় (১৯২১)। দেশের ডাকে তিনি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

নরেন্দ্র কুমারের ছিল অসাধারণ সংগঠন শক্তি। তাঁর ছিল বাগ্মিতা, তেজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য। বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে তিনি বক্তৃতা দিতে পারতেন।" (পৃঃ ৪৩।৪৪)

তাঁর স্বর্গারোহণে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় তার মাধ্যমে যে স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল তারই উদ্যোগে ও অর্থ সংগ্রহের ফলে নির্মিত স্বর্গীয় নরেন্দ্র কুমারের আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন ৫।১০৫৮ তারিখে শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী (এম, এল, সি) মহাশয়। তিনি একজন ইংরাজ কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে প্রস্তর মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতির মধ্যে মানুষ অমর হয়ে থাকে না, অমরত্ব লাভ করে তাঁর কীর্ত্তির মধ্যে, অর্থাৎ আমাদের সেই প্রাচীন উক্তি — "কীর্ত্তি যস্য স জীবতি।" দুর্ভাগ্যক্রমে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গৃহচত্বরে স্থাপিত উক্ত আবক্ষ মূর্ত্তিটি ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনকালে বিনষ্ট

হয়। সে সময় বিদ্যালয়ে যে অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ৫।১২।৭০ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অভিভাবকগণকে রবিবার ৬।১২।৭০ তারিখে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির অনুরোধ জানান।

সুখের বিষয় ১৮।৫।৭৪ তারিখে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ৺নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুন: নির্মিত আবক্ষ প্রস্তর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র নাথ দাঁ মহাশয়। মূর্ত্তিটি এবার লাইব্রেরী কক্ষে স্থাপিত হওয়ায় সহসা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে নরেন্দ্র কুমারের পরলোকগমনে শোক সন্তপ্ত পৌরসদস্যগণ ১৯।২।৫৪ তারিখের সভায় তাঁর বহু গুণাবলী এবং পৌরশাসন ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিশেষ কৃতিত্বের কথা উল্লেখ ক'রে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্যে সকলেই মর্মাহত হন।

নরেন্দ্র কুমারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সর্ববাদীক্রমে পৌর প্রধানের পদে নির্বাচিত হন পৌর সদস্য শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র মাওন। তাঁর দানশীলতার কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর আমলে (৬।২।৫৪ ১২।২।৬৩) প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১) পৌরপ্রধান পদে নির্বাচিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই যে পঞ্চবার্ষিকী কর সংশোধন চালু করা হয় তার প্রতিবাদে ২০।৩।৫৫ তারিখে পোড়ামাঠে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী চিন্তামণি পাল, যদুগোপাল সেন, সত্যনারায়ণ ঘোষ, বিশ্বনাথ আশ প্রভৃতি। কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে এ ধরণের জন-সভা এই প্রথম। যাইহোক এই সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিনিধিদল পৌর প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসা করে নেন।

২) ২।১।৫৬ তারিখে রিষড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে পোড়ামাঠে অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ, এন, ডেবরকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর করকমলে একটি মানপত্র অর্পিত হয়। স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভাপতিকে মাল্যদান করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

৩) ২রা জুন ১৯৫৬ তারিখে আয়োজিত ভগবান বুদ্ধদেবের ২৫০০ বৎসর উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব প্রবল বর্ষণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতদুপলক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক বুদ্ধ মূর্ত্তি সম্বলিত বিভিন্ন মূল্যের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

৪) ১৯১৫ সাল থেকে একে একে বিভিন্ন ভাড়াবাড়ীতে পৌর কার্যালয় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ২৪।১।৫৮ তারিখে শ্রীপঞ্চমীর পূণ্য তিথিতে পৌর সভার বর্ত্তমান নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত কর্মী শ্রীজিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী।

এই গৌরবময় অনুষ্ঠানে সাদর আহ্বান জানিয়ে পৌর প্রধান শ্রীসুশীল চন্দ্র আওন দীর্ঘকাল পরগৃহে পৌর কার্যালয় পরিচালনার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর আমলে সেই অভাব পূরণের সুযোগ লাভ করায় তিনি নিজেকে ধন্য বোধ করেন।

৫) রিষড়া ষ্টেশনের পার্শ্বে নবনির্মিত পৌর ভবনে ২৫।৭।৫৯ তারিখে তিনি পৌরসদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানান এবং ২৭।৯।৫৯ তারিখে তৎকালীন স্বায়ত্বশাসন বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বর দাস জালান মহাশয় এই পৌরভবনে সদস্যগণের আয়োজিত সভায় ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে পৌর সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং পৌর তহবিল থেকে এই ধরণের পৌর কার্যালয় নির্মাণের যোগ্যতাকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন। কথায় বলে পর ভাতি ভাল কিন্তু পরঘরি ভাল নয়।

৬) তাঁরই আমলে ২৪।৭।৫৯ তারিখে জয়শ্রী টেক্সটাইলের প্রচেষ্টায় এবং তাঁদের কারখানার দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহাদি স্থাপনের ব্যবস্থাপনায় একটি নূতন পোষ্ট অফিস স্থাপিত হয়। এর দ্বারা যে কেবলমাত্র উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই সুবিধা হয় তাই নয়, পার্শ্ববর্ত্তী কলোনীর অধিবাসী এবং ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

তাঁরই আমলে রিষড়া পৌরঅঞ্চলে প্রথম জলকল স্থাপনের কথা আগেই বলা হয়েছে। গৃহসংযোজন বাবদ রয়ালটি হিসাবে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তার ফলে পৌরসভার আংশিক আয়বৃদ্ধিও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য।

রিষড়া বস্তি অঞ্চলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন (১৯৬১) তাঁরই আমলের ঘটনা।

১৯৬২ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে ২২।৭।৬২ তারিখে রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে যে শোকসভা হয় সেখানে উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নামাঙ্কিত একটি স্মৃতিরক্ষাহল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের ফলে সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার সুযোগ নষ্ট হয়। সুখের বিষয় রিষড়া সেবাসদনে ১৯৬৭ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেকটার অফ্ হেলথ সার্ভিস — লেফটেনান্ট কর্ণেল এন, সি, চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রভূত উদ্দীপনার মধ্যে বিধান চন্দ্র এক্সরে ক্লিনিকের' উদ্বোধন কার্য সমাধা হয়। এর মাধ্যমে কর্মবীর স্বনামধন্য — ভারত রত্ন ডাঃ রায়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয় একথা বলাই বাহুল্য।

৩০।৯।৬২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে আগমন উপলক্ষে রিষড়ার জি, টি, রোডের স্থানে স্থানে তোরণ নির্মিত হয় এবং

মুখ্যমন্ত্রীর রিষড়া এলাকায় প্রবেশ কালে বাগখালের — সন্নিকটে পৌরপ্রধান শ্রীসুশীল চন্দ্র আওন তাঁকে মাল্যভূষিত ক'রে স্বাগত জানান। ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দনপত্র পাঠ ক'রে তাঁকে সম্মানিত করেন।

তাঁরই আমলে ১৯৬১ খৃঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়, সেকথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এতদুপলক্ষে পৌরসভা কর্তৃক ২০।১২।৬১ তারিখে চারু-কলোনীর রাস্তাসমূহের রবীন্দ্রসরণি নামকরণ করা হয় এবং এই বৎসরই গোয়ালাপাড়ার নাম পরিবর্তন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ রোড নামাঙ্কিত হয়।

॥ অষ্টগ্রহ মিলন ॥

অষ্টগ্রহ মিলনের কুফলের প্রভাবেই বর্ষাশেষে রিষড়ার ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক অশুভ ঘটনা, ২৯শে মাঘ ১৩৬৯ (ইং ১২ ২ ৬৩) তারিখে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন পৌরপ্রধান শ্রীসুশীল চন্দ্র আওন। তাঁর মৃত্যুতে রিষড়ার অধিবাসীরা দলমত নির্বিশেষে তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন — সম্মিলিত শব শোভাযাত্রার মাধ্যমে। পৌরকর্মচারীবৃন্দ তাঁদের শ্রদ্ধা জানান নিম্নলিখিত শোকগাথা রচনা করে। (আংশিক) একথা উল্লেখ যোগ্য যে তাঁর সময়ানুবর্ত্তিতা ছিল একটি অনুকরণীয় বৈশিষ্ট। পৌরসভার কার্য পরিচালনার মধ্যে তিনি রেখে গেছেন তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাধারা এবং বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ব্যবস্থা। ১৬।২।৬৩ তারিখের সভায় পৌরসদস্যবৃন্দ তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা ক'রে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশ সুশীলচন্দ্র আওন রোড নামকরণ করেন। • বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম ও বহু দুঃস্থ ব্যক্তি — তাদের একজন অকৃত্রিম সাহায্যকারী বন্ধুকে হারানোর ব্যথা ও অভাব অনুভব করেন।

হুগলী জেলার ইতিহাসে (পৃঃ ১২১৮) শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় বারুজীবী কুল প্রদীপ সুশীল চন্দ্র আণ্ডন সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ—' পৌরসভার ভূতপূর্ব সভাপতি সুশীল চন্দ্র আণ্ডনের চেষ্টায় রিষড়ার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯শে ভাদ্র ১৩০৪ সালে তাঁর জন্ম এবং ২৯শে মাঘ ১৩৬৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে পৌরকর্মচারীগণ যে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেন তার চার পঙক্তি এইরূপ :

"সেবাধর্ম পবহিতে উৎসর্গিলে বিধিমতে
স্বোপার্জিত অর্থ রাশি রাশি।
গোপনে সাধন পথে মগ্ন ছিলে আনন্দেতে
ছিলে তুমি মোক্ষ অভিলাষী ॥"

উক্ত শোক গাথাব আব কয়েকটি পঙক্তি হল নিম্নরূপ :—

"বসাযে গুরুর আসনে পূজিতে যে মনে মনে
পূর্বাচার্য্য নবেন্দ্র কুমাবে।
মৃত্যু মাঝে সেই ছবি সেই মাস, সেই রবি,
অনুসরি গিযাছ তাহাবে ॥
দিযে গেলে জলকল অসমাপ্ত টাউন হল,
অসম্পূর্ণ মাতৃসদন আজি।
অব্যক্ত রহিল কত মনে আশা ছিল যত
অকস্মাৎ গেলে সর্ব্ব ত্যজি ॥
পৌব সভাব নিজ গৃহ রচিতে ছিল আগ্রহ
পূর্ণ তব সেই মনস্কাম ॥
সঠিক সময় মত হইতে যে উপস্থিত
গর্বভরা ছিল তব নাম ॥"

সন ১৩৭২ সালের ১৮ই বৈশাখ পৌরসভার প্রাক্তন সহ সভাপতি স্বনামখ্যাত জমিদার বংশসম্ভূত ডাঃ প্রাণতোষ লাহার মৃত্যুতে রিষড়ার বাকজীবী সম্প্রদায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ছিল সর্বজন প্রিয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল সে যুগে অনন্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাঁর পরলোক গমনে রিষড়া পৌরসদস্যগণ ২৬ ৬ ৬৫ তারিখের সভায় একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে সুশীল চন্দ্র আওন রোডের সংযোগস্থল থেকে এন, কে, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট পর্যন্ত (চারবাতি) ডাঃ প্রাণতোষ লাহা ষ্ট্রীট নামে অভিহিত করেন এবং সভাকক্ষে তাঁর প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়। (২৮।৭।৫১)

৩০।১।৭২ তারিখে (ইং ১৩ ৫।৬৫) যুগান্তরে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় :—

পরলোকে ডঃ প্রাণতোষ লাহা--"রিষড়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ প্রাণতোষ লাহা গত ১লা মে ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার রিষড়াস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। ১৯১০ সালে মেড্রিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে তিনি স্বগ্রামে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং ক্রমে তিনি এই অঞ্চলের সর্বজনপ্রিয় চিকিৎসক রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ৩৫ বৎসর কাল রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৭ বৎসর কাল তিনি উক্ত পৌরসভার ভাইসচেয়ারম্যান রূপে কাজ করেন। তিনি নিজ ব্যয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করিয়ে দিয়ে পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, একমাত্র পুত্র ও তিন কন্যা রেখে যান।"

অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৩।৫।৬৫ তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশিত হয় :—

"OBITUARY:— Death occurred of Dr. Prantosh Laha at his residence at Rishra, on 1-5-65. He was

83. Dr. Laha was Comissioner of Rishra-Konnagar Municipality cousecutively for 35 years and was later elected Vice-Chairman of the Municipality. He was prominently connected with all the social organisations of the locality." তাঁরই আমলে জমিদারী উচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৯৫৩ সালে (বাং ১৩৬০)। The West Bengal Estates Acquisition Act. 1953.

অশৌচ সংক্ষেপ

স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষের পরিবর্তে যেমন ভারত চালু হয়েছে, এবং ইতিহাস ও ভূগোল বড় ঐ ভাবেই লেখা হচ্ছে তেমনই সমাজে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক সংক্ষিপ্ত করণ সাধিত হয়েছে। পূর্বেকার ৫ ঘণ্টা ব্যাপী যাত্রা থিয়েটার আর এখন কেউ দেখেন না; কাট ছাঁট ক'রে ২। ঘণ্টায় দাড় করান হয়েছে। ১ ঘণ্টার একাঙ্ক নাটকও প্রচলিত হয়েছে। বাসের বদলে মিনি বাস, স্কার্টের পরিবর্তে মিনিস্কার্ট, ঢিলা প্যান্টের স্থলে (ট্রাউজার) চোঙা প্যান্ট প্রভৃতি পরিহিত হচ্ছে; সর্বত্রই সংক্ষিপ্তকরণ চালু হয়ে গিয়েছে। গলাবন্ধ, ফুলহাতা কোট আর এখন কেউ পরেন না, তার স্থলে এখন বুশসার্ট এবং হাওয়াই শার্ট পরিহিত হচ্ছে। গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গন এখন অঙ্গনে রূপায়িত হয়েছে।

দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির পূর্ব প্রথানুযায়ী অশৌচ ব্যবস্থা দৃষ্টে অপরাপর সম্প্রদায় প্রায় সকলেই ১৫ দিনের বেশি অশৌচ পালন করতে পারছেন না। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও বৃত্তি বা চাকুরী ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন নগ্ন পদে, নগ্ন গাত্রে এবং রুক্ষ বেশে যাতায়াত করা শুধু অশোভন নয় কষ্টসাধ্য বলে লোকে গণ্য করছেন, তারই ফলে এই অশৌচ সংকোচ ব্যবস্থা। সকলেই এখন গন্ধ বণিক, স্বর্ণবণিক প্রভৃতি বৈশ্য জাতিবাচক পদবী গ্রহণ

ক'রে পঞ্চদশাহ অশৌচ ব্যবস্থা শাস্ত্র সম্মত বলে জাহির করছেন। স্থানে স্থানে কিছু প্রতিবাদের ঢেউ উঠলেও, এই ব্যবস্থা প্রায় সর্ববাদী সম্মত হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা চলে। গত ৩০।৩৫ বৎসর যাবৎ নির্বিবাদে সমাজে অসবর্ণ বিবাহের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ; তার সুফল বা কুফল যাচাই ক'রে দেখবার সময় এখনও আসেনি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমস্ত কুলললনারা ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখতেন তাঁদেরই উত্তর-মহিলাদের উর্দ্ধাঙ্গের অধিকাংশই আজ অনাবৃত ও লোকচক্ষুর গোচর হয়ে পড়েছে। বাসে, ট্রামে ট্রেনে, রাস্তা ঘাটে তাঁদের সাবলীল অবিরাম গতি। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে তাঁরাও ১০ টা ৫ টা অফিস করছেন। যুগ প্রভাবে সমাজে এসব পরিবর্ত্তন এখন আর দোষণীয় বা নিন্দার্হ নয়—কারণ "দোষ গুণ কব কার, এক ভস্ম আর ছাই।" সবই চলে যাচ্ছে প্রগতির নামে কেবল চলল না সেই 'অচল দুয়ানিটি'।

॥ রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী ॥

আসন্ন রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালনে প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই ১৯৬১ সালের গোড়া থেকেই প্রস্তুতি পর্বে মেতে উঠেন। সমগ্র দেশবাসী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিনটি স্মরণীয় ও বরণীয় ক'রে তোলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

শতবর্ষ পরে ফিরে এল বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ সোমবার। কবিগুরুর সেই শুভ জন্ম দিনটি ১৩৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ পালিত হল জগৎ জুড়ে, তাঁরই রচিত কাব্যাবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে।

ক) রিষড়া রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব সমিতি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ২০শে থেকে ২৬শে মে পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সম্পাদনায় ছিলেন

শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় এবং সমিতির সভাপতি ছিলেন পৌর-প্রধান শ্রীসুশীল চন্দ্র আওন।

খ) রিষড়া আঞ্চলিক রবীন্দ্র শত বার্ষিকী সমিতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ১৫ই থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১, তিনদিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীরামদয়াল মুখোপাধ্যায় আর সভাপতি পদে ছিলেন শ্রীভবানী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বলা বাহুল্য যে রিষড়ায় উপরোক্ত উৎসব অনুষ্ঠানে বহু মনীষীর শুভাগমন ও কবিগুরুর সাহিত্য, নাট্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন এবং বহু খ্যাতনামা শিল্পী সমাগমে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

গ) মাহেশ-রিষড়া সংযুক্ত শতবার্ষিকী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত হয়েছিল উৎসব অনুষ্ঠান। বিচিত্রানুষ্ঠান ছিল এই সব উৎসবের অঙ্গ।

ঘ) রিষড়া টাউন ক্লাব আয়োজিত ৪ঠা জুন ১৯৬১ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে এসেছিলেন সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রীশম্ভুনাথ চ্যাটার্জ্জি ও ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত মহাশয়।

ঙ) বঙ্গেশ্বরী কটন মিলে—শ্রীরামপুর, রিষড়া ও কোন্নগরের সংযুক্ত শিল্পসংস্থাগুলিও আয়োজন করেছিলেন কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের— এতদুপলক্ষে ১১ই জুন মঞ্চস্থ হয়েছিল 'মুক্তধারা' ও 'শাপমোচন'।

চ) এ্যালকেলী কেমিক্যাল কর্মচারীবৃন্দও আয়োজন করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে রবীন্দ্র সংগীত ও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের। এই প্রসঙ্গে মিঃ ফেয়ারফেড সাহেবও সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিশ্ব কবির বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে বহু প্রতিষ্ঠানেই কবিগুরুর জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ দিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণীয় ক'রে তোলা হয়। ২৮শে বৈশাখ ১৩৬৮ শনিবার সন্ধ্যায় সেবাসদনের প্রাঙ্গণে মোড়পুকুর উদয়ন সংঘ রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। অধ্যাপক ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র, এম, এ, বি, এল যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নব সংযুক্ত রিষড়া পৌর এলাকার অধিবাসীদের সাহচর্যে একটা বৃহত্তর পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ ঘটে।

পৌরসভা কর্তৃক এতদুপলক্ষে চারু কলোনীর রাস্তাগুলির রবীন্দ্র শরণি নামকরণের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৫৬২ তারিখে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রিষড়া কংগ্রেস সেবা ও সংস্কৃতি পরিষদের আহ্বানে প্রখ্যাত সমালোচক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। অভিনীত হয় কবিগুরুর বিখ্যাত নৃত্যনাট্য- 'চিত্রাঙ্গদা'।

জনস্ফীতি

১৯৪১ সালে যেখানে রিষড়ার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২৩,৬৯০, ১৯৫১ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭,৪৬২ তে, কিন্তু ১৯৬১ সালের লোক গণনার ফলাফল অনুযায়ী সেই জনসমষ্টি দাঁড়ায় ৩৮,৫৮০ তে। (সংযুক্ত এলাকা বাদে)।

এই লোকগণনা কার্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে পৌর কর্মচারী শ্রীমন্মথ নাথ আশ রাষ্ট্রপতি রৌপ্যপদক লাভের অধিকারী হন।

ভারতে অস্বাভাবিক জনস্ফীতি রোধ কল্পে তখন চলেছে পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) কার্যসূচী। ১৮।১২।৬১ থেকে

২৪।১২।৬১ এই এক সপ্তাহব্যাপী রিষড়া সেবাসদনে ফ্যামিলি প্ল্যানিং শিক্ষা শিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়। 'ছোট পরিবারই সুখী পরিবার' এই কথা তখন পত্র পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকাশিত ক'রে সরকার থেকে পুরুষের ক্ষেত্রে নিবীজ করন এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বন্ধ্যাত্ব করণ জন্য আবশ্যকীয় অপবেশান কার্য অনুষ্ঠিত হয় এই সমস্ত ফ্যামিলী প্ল্যানিং কেন্দ্রে। সাধারণ ব্যক্তিরা এই প্রচার কার্যে কতখানি আকৃষ্ট হয়েছিল বা ত দের ক'জ্জা মিলেছিল তা বলা শক্ত কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তখনও এক ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে পুত্রকন্যার জন্ম ভগবানের দান, কাজেই কৃত্রিম উপায়ে তাদের জন্ম নিরোধ করা পাপ। বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে অধিক সংখ্যক পুত্রকন্যার যথোপযুক্ত ভরণপোষণ ও লালনপালন করা যে স্বল্পবিত্ত পিতামাতার পক্ষে কিরকম কষ্টসাধ্য তা অনেকেই অনুভব করছিলেন। তাছাড়া গৃহসমস্যাও তখন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। দু'কামরা ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম সংযুক্ত গৃহসীমানার মধ্যে ৫ ৬টি লোকের (যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে) বসবাস এক রকম অসম্ভব। তার উপর মাতার ঘন ঘন গর্ভ ধারণ জনিত ক্লেশ ও স্বাস্থ্যভঙ্গের কথাও বিবেচনা যোগ্য। যাই হোক, এ বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টা আজও চলছে এবং চলবে।

একদিকে সরকার পক্ষ থেকে যখন জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসাবে 'লুপ 'নিরোধ' প্রভৃতি কৃত্রিম উপায় গ্রহণের জন্যে প্রচার কার্য চালান হচ্ছে, অপর দিকে কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী আজও ব্রাহ্মণের কুশণ্ডিকায় অগ্নির নিকট বর পত্নীকে দশ পুত্রের জননী হবার প্রার্থনা করে যাচ্ছেন—"দশাস্যাং পুত্রানাধেহি, পতিমেকাদশং কুরু"। অবশ্য এই মন্ত্রগুলি বর ও কন্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থবোধহীন ভাবে পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ বলে যান। এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা একপ্রকার অসম্ভব।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের লোকগণন অনুযায়ী রিষড়ায় (সংযুক্ত এলাকা

সমেত) জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে- ৬৩,৫৮২। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা শক্ত যে জন্মের হার বাড়ছে না কমছে অথবা স্থিতিশীল আছে।

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ।

গত বৎসরের রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নাচে গানে ভরা আনন্দের রেশটুকু মিলিয়ে যাবার আগেই শান্তিপ্রিয় ভারত রাষ্ট্রের উপর নেমে এল প্রতিবেশী কম্যুনিষ্ট চীনের সশস্ত্র আক্রমণ। ভারত-বাসী মাত্রেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠল। 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই' ধ্বনি লজ্জায় মুখ লুকাল ডাষ্টবিনের মধ্যে।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সমগ্র দেশব্যাপী তড়িৎ গতিতে গড়ে উঠল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল স্তরের নরনারী যুক্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠল—"এক জাতি এক প্রাণ, একতা।" দেশাত্মবোধ সঙ্গীতের মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে উঠল স্বাধীন ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী। সরকারী প্রতিরক্ষা ভাণ্ডার ভরে উঠল স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত অর্থ ও স্বর্ণের সমাহারে। দেবতাত্মা হিমালয়ের তুষারশুভ্র শীর্ষদেশ দেখতে দেখতে ভারতীয় জোয়ানদের তাজা লাল রক্তে রক্তিম হয়ে উঠল।

২৫।১১।৬২ তারিখে পোড়ামাঠে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বর্বর চীনের নির্লজ্জ ভারত আক্রমণের প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়ে উঠল ধিক্কার ধ্বনি। দলমত নির্বিশেষে ভারতভূমিতে চীনা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংকল্প গৃহীত হল। সাবধান বাণী উচ্চারিত হল গৃহ শত্রুদের বিরুদ্ধে।

মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার পূর্ণবাবুর ময়দানে এবং কলকারখানায় উপস্থিত হ'য়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও সরকারী প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থার পরিচিতির মাধ্যমে জনচিত্তে জাগিয়ে তোলেন দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সহযোগিতা। সকলেই কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দৈহিক বল প্রকাশ ক'রে লড়তে পারবে না শত্রুর বিরুদ্ধে কিন্তু 'মন ও ধন' দিয়ে সাহায্য করতে পারেন প্রত্যেকটি দেশবাসী। তাঁর আহ্বানে সমবেত নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত দানে ভরে উঠে তাঁর প্রতিরক্ষা তহবিল। কেউ দিলেন কানের কুণ্ডল কেউ বা দিলেন হাতের কঙ্কন। নোটের বাণ্ডিলে ভরে উঠল একাধিক বস্তা।

চারণ কবি গেয়ে গেলেন :—"রামকৃষ্ণকে সন্তানোঁ কো তুমনে
ক্যো ললকারা হ্যায়,
দূর হটো চীনী বৌনে।
নেফা লদ্দাক হামারা হ্যায় ॥"
(অচেনা শহর কলকাতা—অমিতাভ চৌধুরী)

৩০।১১।৬২ তারিখের 'শ্রীরামপুর সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হল একটি জরুরী ঘোষনা :—

"হুগলী জেলার অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কণ্ট্রোলার ও অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী বি, আর, চক্রবর্ত্তী এক ঘোষনায় জানান যে, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী এবং বাঁশবেড়িয়া সহরগুলিকে 'প্রতিরক্ষা সহর' হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্যে উক্ত এলাকাগুলির অধিবাসীগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ বাসগৃহে, আফিসে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে, বিদ্যালয়ে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয় বিশিষ্ট ব্যাফেল ওয়াল কিংবা বালির বস্তার দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া রাখেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গনে পরিখা (ট্রেঞ্চ) খনন করিয়া রাখেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য চীফ্ ওয়ার্ডেনের সহিত যোগাযোগ করুন। রিষড়া পৌরসভার কমিশনার চীফ্ ওয়ার্ডেন নিযুক্ত হইয়াছেন।" শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘটক চীফ্ ওয়ার্ডেন ও পৌরপ্রধান ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী চীফ্ ওয়ার্ডেন নিযুক্ত হন।

বলা বাহুল্য, আবার সেই ব্ল্যাকআউট বা নিঃস্প্রদীপ ব্যবস্থা চালু করা হল। তখন সবেমাত্র ৫ নং ওয়ার্ডের কয়েকটা রাস্তায় আংশিক বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

"The question of street lamps in the remaining roads of ward No. V remained unimplemented" (S. C. Aon, Chairman, Adm. Report 1961-62).

সরকারী প্রতিরক্ষা তহবিলে পৌরসভা কর্তৃক ২০০০৲ টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ—

"The Commissioners at a meeting expressed their deep concern at the unprovoked Chinese aggression on the Indian territory and pledged their whole-hearted support to Govt. of India in their efforts to defend India and sanctioned a contribution of Rs. 2000/- to the National Defence Fund."

সিভিল ডিফেন্স কন্টোলার এবং অতিরিক্ত জেলাশাসকের সহায়তায় এই যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় পৌর ভবনে অত্যাবশ্যক টেলিফোন সার্ভিস প্রদত্ত হয়। এতকাল বহু লেখালিখি করেও যা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। বলা নিস্প্রয়োজন যে এই টেলিফোন চালু হওয়ায় জনসাধারণেও বিশেষ সুবিধা হয়।

(Dr. N. Banerjee, Chairman, Adm. Report 1962-63)

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী' উৎসব আয়োজন। সারা বৎসর ব্যাপী চলতে থাকে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান।

রিষড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, রিষড়া অনাথ আশ্রম, রিষড়া সেবাসদন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিশ্রুত ধর্মপ্রচারক ও দেশ প্রেমিক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শত বার্ষিকী (১৮৬২ ১৯৬২) উপলক্ষে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ও স্বামীজির জীবনী অবলম্বনে রচিত নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে শ্রোতৃমণ্ডলির মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হন।

হুগলী জেলা বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির সৌজন্যে রিষড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যে সব মনীষী স্বামীজির জীবনদর্শনের নানা দিক সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সুবক্তা অধ্যাপক হরিপদ ভারতী ও হুগলী জেলা ও সেসন জজ শ্রীঅনাথ বন্ধু শ্যাম মহোদয়।

রিষড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে জয়ন্তী উৎসবে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সুধীর কুমার নন্দী ও নাট্যকার শ্রীপরেশ ধর।

রিষড়া সেবাসদনে ৮।১০।৬৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সুবক্তা ও সাহিত্যিক শ্রী এ, কে ব্যানার্জ্জী, আই, এ, এস, (অতিরিক্ত জেলা শাসক-হুগলী)।

এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে নির্মিত বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ভবনের (বর্তমানে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার) কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে —পৃঃ ৪২১ ।

পৌরসভার পক্ষ থেকে বাঙ্গুর কলোনীর প্রধান রাস্তাটি এতদুপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ রোড নাম করণ করা হয় এবং তদনুযায়ী প্রস্তর ফলকও স্থাপিত হয়।

স্বামীজির জীবন ও বাণী প্রচারকল্পে রিষড়া সুশীল চন্দ্র আওন রোড নিবাসী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র আশ মুদ্রিত আকারে স্বামীজির কয়েকটি প্রধান প্রধান বাণী সাধারণ্যে প্রচার করেন।

॥ একই বৎসরে তুইবার তুর্গাপূজা ॥

১৩৭০ বঙ্গাব্দে (১৯৬৩)অভূতপূর্ব্ব পঞ্জিকার গণনা বিভ্রাটের ফলে জনসাধারণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। বহু বাদ প্রতিবাদ ও সভাসমিতির মাধ্যমে উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে বাংলা ১৩৭০ সালে তুর্গাপূজা (সপ্তমী) ৮ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সাল। গুপ্ত প্রেস ও পি, এম, বাগচি পঞ্জিকা মতে ২৪শে অকটোবর অর্থাৎ ৬ই কার্ত্তিক সপ্তমী, উভয় প্রকার পঞ্জিকার গণকগণ স্ব স্ব মতে অটল রইলেন কাজেই রিষড়ায় ও বাংলায় অন্যত্র আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তু'মাসেই শারদীয়া তুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

রিষড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে আশ্বিন মাসে ও গ্রামের অন্যান্য পূজামণ্ডপে কার্ত্তিক মাসে তুর্গপূজা সম্পন্ন হয়।

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত কারণে আলোচ্য বর্ষে সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি এমনকি দোলযাত্রা পর্যন্ত তুমতে তুবার ক'রে অনুষ্ঠিত হয়।

গুপ্ত প্রেসের বিধান অনুযায়ী এই বৎসর আশ্বিন ও চৈত্র মল মাস পড়ে, কাজেই ৩০শে আশ্বিন মহালয়া উপলক্ষে পার্বণ শ্রাদ্ধও নিষিদ্ধ হয়। ইতিপূর্বে এই ধরণের পঞ্জিকা বিভ্রাট ঘটেছিল কি না বলা শক্ত তবে ২৭শে কার্ত্তিক ১৩৬৯, ইং ১৩।১১।৬২ তারিখের যুগান্তরে প্রকাশিত হয় যে ১৪১ বৎসর পূর্বে একই বৎসরে অনুরূপ তু'টি মলমাস পড়েছিল।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে শাস্ত্রানুযায়ী 'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়' অর্থাৎ পাঁচ দণ্ড বৃদ্ধি ও ছয় দণ্ড পর্যন্ত ক্ষয় এই হিসাবেই তিথির গণনা করা হ'য়ে থাকেকিন্তু বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে 'বাণবৃদ্ধি দশক্ষয়' অর্থাৎ পাঁচ দণ্ড বৃদ্ধি দশদণ্ড পর্যন্ত ক্ষয় এই হিসাবে তিথি গণিত হ'য়ে থাকে এবং

তার ফলে একইমাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলেও সন্ধিপূজায় উভয় মতে প্রায় চার ঘণ্টা তফাৎ হ'য়েপড়ে- যেটি খুবইদৃষ্টিকটু ও বিভ্রান্তিকর, একথা বলাই বাহুল্য। মাস গণনাতেও একদিনের তফাৎ অনেক সময় আমন্ত্রণ পত্রাদিতে পরিলক্ষিত হয। অধিকাংশের গ্রাহ্য মতানুযায়ীই লোকে কার্য সমাধা করে চলেছেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে ঝগড়া বিসম্বাদ চলতেই থাকবে।

!! বিশেষ সুবিধার অবসান !!

স্বর্গীয় বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার পর দীর্ঘকাল পরে পৌর সদস্য শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল, শ্রীরামপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হওয়ায় এতদঅঞ্চলের অধিবাসীদের গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষর সংগ্রহের ক্লেশ ও অসুবিধা দূরীভূত হয় কিন্তু ১৬ই আগষ্ট ১৯৬৩ 'পল্লীডাকে' এবং ১০ই আগষ্ট শনিবার (বাংলা ২৪শে শ্রাবণ ১৩৭০) যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদ মারফৎ জানা যায় যে তিনি পাঁচবৎসর কাল উক্ত বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন। এই সংবাদে অনেকেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। উক্ত পদে সমাসীন থাকা কালীন তাঁকে অবশ্য বহু পরিশ্রম ও সময় নিয়োগ করতে হয়েছিল যার ফলে স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালীন তিনি হিন্দী ও বাংলার মাধমে প্রকাশিত "লোকশ্রী" পত্রিকায় রিষড়ায় ক্রমবর্দ্ধমান বৃহত্তর এলাকায় একটি পুলিশ আউট পোষ্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাঁর প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য সরকারী তৎপরতা দেখা দেবে।

প্ল্যাষ্টিক শিল্পের দ্রুত প্রসার।

প্ল্যাষ্টিকের চুড়ি পরার সখ যখন মহিলা মহলে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন বাজারে এসে গেল প্ল্যাষ্টিকের তৈরী নানাবিধ খেলনা। হাতী, ঘোড়া, উট, রেলগাড়ী, কামানওয়ালা ট্যাঙ্ক গাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি পর্যন্ত মেলা তলায় ঢেলে বিক্রি হতে লাগল, যার ফলে মাটির খেলনাগুলো অধিকাংশই অবিক্রিত রয়ে গেল। এর উপর দেখা গেল রং বেরংয়ের ও বিভিন্ন ডিজাইনের ব্যাগ। বাজার করা থেকে মেয়েদের কাপড় এবং শিশুপুত্রকন্যাদের কাঁথা তোয়ালে সব কিছুই ঐ সব ব্যাগে ভরে ট্রেনে বাসে চলাচল করতে শুরু হল। নগদ পয়সার পরিবর্ত্তে ছেড়া কাপড়ের বিনিময়ে মেয়েদের পক্ষে এই সমস্ত জিনিষ এবং প্ল্যাষ্টিকের লাল, নীল, গোলাপী রংয়ের বালতি সংগ্রহ করার অপূর্ব সুযোগ মিলে গেল। বাড়ির কর্ত্তারা যখন দুপুরে অফিস-আদালত বা কলকারখানায় বন্দী, এঁটো বাসনগুলো যখন ঝির অপেক্ষায় কলতলায় পড়ে থাকে, গিন্নীমা যখন ভাত-ঘুমের মৌজে গা এলিয়ে দেন তখন এই সব জিনিসের অবাঙালী ফেরীওয়ালারা হাঁক দিয়ে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায় আর চেনা বাড়ীর দরজায় এসে জাগিয়ে তোলেন মায়েদের আর নতুন ডিজাইনের জিনিষ দেখিয়ে তাঁদের গছিয়ে দিয়ে যায় ঝাঁকায় ভরা আর হাতে ঝোলান বিভিন্ন পণ্যসম্ভার কয়েকখানা কাপড়ের বিনিময়ে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ঢালাই লোহার বালতির দাম তখন হু'হু করে বেড়ে চলেছে। লোহার কড়ার দামও দেড়গুণ থেকে দু'গুণ বেড়ে গেল। একদিকে এ্যালুমিনিয়মের বাসন পত্র, কৌটা, ডিপে, পাকপাত্র আর তার সঙ্গে এইসব প্ল্যাষ্টিকের পণ্য দ্রব্য বাজার ছেয়ে ফেলল। পিতল, কাঁসার বাসনপত্র যা ছিল তাই রয়ে গেল। অগ্নিমূল্যের ফলে, নতুন কেনার সামর্থ্য মধ্যবিত্তদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

ভোগ্যপণ্যের, বিশেষ ক'রে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে রিক্সা

ভাড়াও তখন ধাপে ধাপে ভাড়া বাড়তে আরম্ভ ক'রে। পৌরসভা নির্দ্ধারিত ভাড়ায় তখন আর রিক্সাওয়ালারা যেতে চায় না। রিক্সা চালকরা বলে যে ভাড়া না বাড়ালে তাদের পেট চালানো ভার। দিনান্তে রোজগারই বা হয় কত? চার পাঁচ টাকার বেশী নয়। পাল পাবণে হয়তো বা দু'এক টাকা বেশী মেলে। মালিককে দিতে হয় দৈনিক পাঁচসিকে থেকে দেড় টাকা। ছোটখাট সারাই খরচ, লাইসেন্সের টাকা আছে, চা-পাঁউরুটি, খাওয়া পরা, আর ঘরভাড়া দিয়ে মাসের শেষে দেখা যায় হাতে এক নয়া পয়সাও নেই। বিড়ি দেশলাই কেনার পয়সাও ধার করতে হয়

অন্যান্য পরিবহন ক্ষেত্রেও ভাড়া বৃদ্ধি অস্বাভাবিক আকার ধারণ ক'রে – বিশেষতঃ রেলের স্বল্প দূরত্বের ভাড়া পাঁচ থেকে দশ পয়সা পর্যন্ত বেড়ে যায়।

একদিকে যখন উপরোক্ত নূতন নূতন জিনিষপত্র এবং সমাজিক পরিবর্ত্তন এসে গেল, অন্যদিকে আবার কতকগুলো সাবেকি প্রথা ও ভিখারীর অন্তর্ধান উল্লেখযোগ্য :—তার মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে পাগড়ীহীন পুলিশ ও দরয়ান বা চাপরাশি। একজন দরয়ান ১০।১২ হাত লম্বা কাপড়ের বাঁগ গুছিয়ে গাছিয়ে অপরের মাথায় পরম যত্নে বেঁধে দিচ্ছে, এ দৃশ্য এখন আর চোখে পড়ে না, সরকারী চাকুরি (নোকরি) করতে এখন আর পাগড়ী বাঁধার দরকার হয় না এই পাগড়ী পরে পরে অনেকের মাথার চুলগুলো সব উড়ে গিয়ে বেবাক টাক বেরিয়ে পড়ত। দ্বিতীয় জিনিষ হল হলদে রংয়ে পাগড়ী মাথ'য় ঝোল্পা ঝুপ্পি গাযে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিখারীর দল—সেও অদৃশ্য হয়েছে আরও অদৃশ্য হয়েছে গলায় ঝোলানো হারমোনিয়ামের সরু পর্দার উঁচু গলায় গান গাইয়ে বেদে বেদিনীর যুগল মূর্ত্তি। তার বদলে এখন ট্রেনে রকমারি ভিখারী দেখা যাচ্ছে। কেউ বা মাটির হাঁড়িতে দু'হাত চালিয়ে তবলার চাটিম্ চাটিম্ বোল তুলে মুখে কাটা কাটা গান করে, আবার দু'টুকরো কাঠের খঞ্জনিতে খটাখট আওয়াজ তুলে কপালে

ফোঁটা তিলক কাটা ভিখারীরও সাক্ষাৎ মেলে। অন্ধ খঞ্জতো আছেই। আর একটা জিনিষ লক্ষ্যনীয় হল কাবুলীওয়ালাদের অন্তর্ধান। ১০ ১৫ বছর আগেও যারা দেনাদারদে বাড়ি দরজায় লাঠি ঠুকে ঠুকে রূপিয়া লিয়াও বা সুদ দেও বলে ঘুরে বেড়াত। অনেক ভদ্র-সন্তানকেও বিভিন্ন দায়ে পড়ে অথবা রেস খেলা কিম্বা অন্যান্য বদ খেয়ালিতে টাকা উড়িয়ে দিয়ে এদের কাছে টাকা ধার নিতে হত এবং মাস মাস আসল বাদে কেবল সুদের টাকা গুণতেই হিমসিম খেতেন বা বেইজ্জত হতেন।

মোট কথা, স্বাধীনোত্তর যুগে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমরা যেমন অনেক কিছু হারিয়েছি তেমনই নূতন আমদানি হয়েছেও অনেক কিছু। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি যার মধ্যে প্রধানতম।

পূর্ণবাবুর ময়দানে বিভিন্ন সম্মেলন।

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ হুগলী জেলা দলিত বর্গের সম্মেলন ও সন্ত শিরোমণি মহর্ষি রবিদাস জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীরামপুর পৌরসভাধীশ ডাঃ গোপাল দাস নাগ। আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন হুগলী জেলা দলিতবর্গ সংঘের সভাপতি শ্রীশিবপ্রসন্ন দাস ও সম্পাদক শ্রীরামসকল দাস।

৩।৫।৬৪ তারিখে উক্ত স্থানেই অনুষ্ঠিত হয় ন্যাসানল ইউনিয়ন অফ্ জুট ওয়ার্কারদের দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন। পশ্চিবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রম মন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা।

"উক্ত সালের অর্থাৎ ২১।২।৬৪ তারিখে শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নাহার

জি, টি, রোডের পূর্ব পার্শ্বে ডাঃ সি, আর দাস পরিচালিত 'জনতা হেলথ হোমের' উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন যে ঔষধ যত কম খাওয়া যায় ততই মঙ্গল, তিনি নিজে জীবনে সামান্য শারীরিক অসুস্থতায় ঔষধ গ্রহণে বিরত আছেন। কেবলমাত্র পথ্যের পরিবর্তন বা উপবাসের দ্বারা তিনি বিশেষ সুফল লাভ করেছেন।

পৌরসভার বয়োকনিষ্ঠ সভাপতি।

১২।২ ৬৩ তারিখে পৌর প্রধান সুশীল চন্দ্র আওন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় নূতন সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সহঃ সভাপতি জনাব মহম্মদ সিদ্দিক অস্থায়ী ভাবে কার্য পরিচালনা করেন। কর দাতাগণের অবগতির জন্য তিনি ৭ ৩ ৬৩ তারিখে গৃহে গৃহে জল সরবরাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মাবলীর সংক্ষিপ্তসার মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করেন। গৃহসংযোজন বাবদ রয়ালটির পরিমান নির্ধারিত হয় ২৫০ শত টাকায় এবং প্রত্যেক কর দাতার উপর শতকরা ৪% ওয়াটার রেট স্থাপিত হয়। যাঁরা বাড়ীতে জল সরবরাহ নেন তাঁদের পক্ষে অবশ্য অতিরিক্ত ১% অর্থাৎ মোট ৫% ওয়াটার রেট ধার্য হয়। ডাঃ বানার্জ্জি পৌরপতির জন্য নির্দ্ধারিত আসন গ্রহণের পূর্বে তাঁর স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্বসুরীগণ কর্তৃক অলংকৃত এব আসনের মর্যাদা রক্ষা কল্পে তাঁদের স্মরণ করেন এবং আশীর্বাদ প্রর্থনা করেন।

৺সুশীল চন্দ্র আওনের আমলে সহঃ সভাপতি ৺রাধারমন লালের সাময়িক অনুপস্থিতির জন্যে জনাব ইব্রাহিম খাঁ ১৪ ৮।৫৪,থেকে ২৯ ৯।৫৪ এবং শ্রীপঞ্চানন দাঁ এম, এ ১।৬।৫৭ থেকে ১৬।৮ ৫৭ পর্যন্ত সহকারী সভাপতি হিসাবে কার্য (৩।১৮) পরিচালনা করেন। ১২।১।৬০ তারিখে রাধারমন লাল মহাশয় পরলোক গমন করায়

শ্রীগীতানাথ দাস পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী ভাবে সহঃ সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। মহামান্য হাই কোর্টের নির্দেশে উক্ত বোর্ডের আয়ুষ্কাল ২৩।৯ ৫৯ থেকে ২৫।১২ ৬০ পর্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়।
(Adm. Report—1959-60)

ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরপতি হিসাবে নির্বাচিত হন ২রা মার্চ্চ ১৯৬৩। ২৫।১২।৬০ তারিখের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পৌর-সদস্যপদে নির্বাচিত হন এবং ১৫।১।৬১ তারিখ থেকে জন সদস্য সমন্বিত এই নূতন বোর্ড কার্যারম্ভ করেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির রিষড়া শাখার পক্ষে ১৯।৩।৫৮ তারিখে আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় নাগরিকগণের অবগতির জন্যে প্রচারিত হয়। এই নির্বাচনেই প্রথম মহিলা সদস্য হিসাবে শ্রীমতী সুষমা গাঙ্গুলী নির্বাচিতা হন। পৌরসভার ইতিহাসে এটি একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ১৯২৩ সালে বালি মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন আমেরিকান মহিলা মিস জোসেফাইন ম্যাকলয়েড গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পৌর সদস্যা হিসাবে মনোনীতা হন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মহিলা কমিশনার।" (আনন্দবাজার, ২৩৪'২৩)

উপরোক্ত পৌর নির্বাচনে যে কৌতুকপ্রদ 'ভোটরঙ্গ' কবিতা প্রকাশিত হয় তার কয়েক পংক্তি হল নিম্নরূপ :—

"চক্রপাণি নাম তার ঔষধ-পরায়ণ।
দ্বিচক্র যানেতে ঘুরে দেখে রোগীগণ ॥"
"ডাক্তারিতে নাম করেছি আর করেছি ভুঁড়ি।
যোগ্য প্রার্থী আর এক আছে সে আমার জুড়ি ॥"
কমিশনারী ছোট কাজ চেয়ারম্যানই হব,
সময় না থাক প্রেসকিপসান লিখে দিয়ে যাব ॥"

(প্রতীক চিহ্ন ছিল সাইকেল)

এবার কাজের কথায় আসা যাক। ডাঃ ব্যানার্জির আমলে উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি হল নিম্নরূপ :—

১) ভারত ভূমির উপর চৈনিক আক্রমণের কথা আগেই বলা হয়েছে এবং যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার অজুহাতে পৌরভবনে টেলিফোন সার্ভিস স্থাপনের কথাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২) স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর মৃত্যুতে ২৮/৫/৬৪ তারিখে রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শোক সভা। পৌর সভার সদস্যগণ এই মহান নেতা ও কর্মযোগীর মৃত্যুতে ৩০/৫/৬৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শোক সভায় গভীর বেদনা প্রকাশ করেন এবং তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। "I must refer to the irreparable national loss sufferred by the country at the sudden passing away of Sri Jawaharlal Nehru, the Prime minister of India, a fighter of freedom and an appostle af peace."

(Adm. Report—1963-64)

৩) পৌর ভবনের অব্যবহিত উত্তর পার্শ্বস্থ (রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ কল্পে) ভূমিখণ্ড তাঁরই আমলে বহু প্রচেষ্টায় ক্রীত হয়।

৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মহোদয়ার অফিসে ৫/৯/৬২ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী The municipality accepted handing over of all the roads and tube-wells in the Rishra Govt. Colony and Govt. was moved for grant of suitable financial help for maintenance of these roads & drains.

৫) বহু লেখালিখি এবং সরেজমিনে তদন্তের পর ১ নং গবর্ণমেন্ট কলোনীর জলনিকাশী একটি বৃহৎ ড্রেন নির্মাণের প্রকল্প সরকার কর্তৃক

মঞ্জুর হয় এবং রিলিফ ডিভিসনের তত্ত্বাবধানে কার্য আরম্ভ হয়।

৬) তদানীন্তন ৪ নং ওয়ার্ডের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কল্পে স্বর্গীয় নিলমণি দাঁর সুবৃহৎ বাগান জমি— ডাঃ পি, টি, লাহা ষ্ট্রীটে ক্রীত হয় এবং কার্যারম্ভ হয়।

৭) রেলওয়ের পশ্চিম পার্শ্বে প্রাক্তন ৫ নং ওয়ার্ডের বিদ্যালয় ভবন ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত জমির উপর নির্মিত হয়।

৮) দু'টি নূতন পার্ক—(ক) চন্দ্রনাথ পাকড়াশী শিশু উদ্যান ও (খ) নারায়ণ রাধারাণী পার্ক তাঁর আমলেই নির্মিত হয়।

৯) ঘন বসতিপূর্ণ বস্তি এলাকার মধ্যে অবস্থিত দূষিত ও পঙ্কিল জলপূর্ণ যমুনা পুষ্করিণী ভরাট করার ব্যবস্থা হয়।

১০) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে রিষড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের বিভিন্ন উন্নয়-মূলক কার্যাবলী রূপায়িত করার দাবি দাওয়ার মধ্যে কয়েকটি কার্যকরী হয় তার মধ্যে প্রথমটি হল হাওড়াগামী প্যাসেঞ্জারদের সুবিধার্থে একটি পৃথক 'বুকিং কাউন্টার' এবং দ্বিতীয়টি হল প্ল্যাটফরমে জল জমে থাকার ফলে আরোহণ ও অবরোহণকারীদের অসুবিধা দূরীকরণ ব্যবস্থা অবলম্বন। (পৃঃ ৬৯৯ দ্রষ্টব্য)

১১) সপ্তম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী অনুযায়ী পৌর প্রতিষ্ঠানের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মিবৃন্দের চাকুরীর স্থায়িত্ব স্বীকৃত হয় এবং তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত ৩ দফা সবেতন ছুটী প্রদানের ফলে পৌর সভার ব্যয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১২) রাস্তায় জল-কলের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১ নং জোনে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৭ এবং ২নং জোনের সংখ্যা হয় ৯৪। উন্নয়নমূলক কার্যাবলী রূপায়িত করার ব্যয় নির্বাহ কল্পে গৃহ সংযোজন বাবদ রয়ালটি আরও ৫০৲ টাকা বাড়ান হয়।

১৩) পাঁচ নং ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তায় পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট ইলেক টি সিটি বোর্ড কর্তৃক বৈদ্যুতিক আলো দেবার ব্যবস্থা হয় এবং ১নং

জোনে আলোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬২তে আর দু'নং জোনে বর্দ্ধিত সংখ্যা ছিল ৬২টি। একদিকে যখন বলদেব সাহাযো প্রাচীন প্রথায় ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া হচ্ছে তখন তার পাশাপাশি দেখা যায় উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ চলাচলের জন্য স্থাপিত উচ্চ স্তম্ভ।

১৪) পরবর্ত্তী সাধারণ নির্বাচনে পৌর সভার সমগ্র এলাকা একক আসন বিশিষ্ট ১৬টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয় এবং বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়, ইহার ফলে ভোটার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় একথা বলাই বাহুল্য। পৌর নির্বাচন ক্ষেত্রে এ প্রথা হল একটি বিরাট ও অভিনব পরিবর্ত্তন এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্ত্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার অজুহাতে পৌর সদস্যদের কার্যকাল চার বৎসরের স্থলে আরও দু'বৎসর বর্দ্ধিত হয়।

১৬) ২৬/৪/৬৫ তারিখে প্রাক্তন পৌর সদস্য ও 'হেমচন্দ্র দাঁ স্মৃতি মন্দির' (বর্ত্তমান উচ্চ বিদ্যালয় ভবন) প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ নাথ দাঁর মৃত্যুতে পৌর সদস্যগণ ২৬/৬/৬৫ তারিখের সভায় একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাঁর এই অমূল্য অবদান ও পৌর সভার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সংশ্রব উল্লেখ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৬) চৈনিক আক্রমণের জের মিটতে না মিটতেই ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কচ্ছ-সিন্ধু প্রদেশে পাকিস্থানী হাঙ্গামায় জনগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উৎপীড়িত বোধ করেন। চলতে থাকে স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ভারতের কর্ণধার শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে সর্বশক্তি প্রয়োগকরার দৃঢ়তা অবলম্বন করেন। অস্ত্রের বদলে অস্ত্রধারণ করার সংকল্প ও প্রকাশ করেন।

১১ই মে ১৯৬৫ প্রধান মন্ত্রী মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে ঘোষণা করেন যে কচ্ছ-সিন্ধু সীমান্তে পূর্বাবস্থা ফিরে এলে তবেই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উভয় দেশের বিবেচনার্থ যে খসড়া প্রস্তাব রচনা করেছেন সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। আসন্ন সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর কালে

কচ্ছের রাণ অঞ্চলে পাক ভারত বিরোধের বিষয়টিও উত্থাপিত হবার আশা প্রকাশ করেন। (বসুমতী—১২.৫.৬৫)

॥ বাইশ দিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ॥

কচ্ছ সিন্ধু সীমান্তে ভারত পাকিস্তান বিরোধ মীমাংসার কয়েক মাস পরেই কাশ্মীরে পাকিস্তান পুনরায় আক্রমণ চালায়। ১৯৪৭ সাল থেকে কাশ্মীর সমস্যা লেগেই ছিল, এবং কাশ্মীরের পশ্চিমাংশ পাকিস্তান অন্যায়ভাবে গ্রাস ক'রে রেখেছিল তার উপর আবার ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত এলাকার উপর পাকিস্তানের এই অতর্কিত ও অঘোষিত আক্রমণ অত্যন্ত বিস্ময়কর। সেপ্টেম্বর মাসের ২২ দিন ধরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতের বীর জওয়ানরা শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি রোধ ক'রে রুখে দাঁড়ায়। পাক বোমারু বিমান ইতস্ততঃ বোমা নিক্ষেপ ক'রে কিছুটা ক্ষতিসাধন করলেও জনগণের মনোবল এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বারাকপুর সেনানিবাসের উপর পূর্ব পাকিস্তান থেকে উড়ে আসা বোমরু বিমান র‍্যাডারে ধরা পড়বার আগেই কয়েকটা বোমা ফেলে রিষড়া'র আকাশের খুব নীচু দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলার কয়েকটা টুকরো রিষড়ার স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮।৯।৬৫ তারিখে পৌরপতি ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন দুর্গা পূজার উদ্যোক্তাদের পৌরভবনে আহ্বান ক'রে এই জাতীয় সংকটময় অবস্থায় মাতৃপূজায় ব্যয় সংকোচ ও আবশ্যকীয় আলোক ব্যবস্থা ছাড়া অতিরিক্ত আলোক সজ্জা পরিহার করার জন্যে অনুরোধ জানান এবং পূজা তহবিল থেকে যথাসাধ্য অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করার আবেদন করেন। ২৯।৯।৬৫ তারিখে 'আনন্দবাজারে' সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয় (পূজায় কর্তব্য)– "আমরা বিশ্বাস করি, এবার চোখ-ধাঁধানো আলোক-সজ্জা করিয়া, মাইকে বর্বর কোলাহল

সৃষ্টি করিয়া, শোভাযাত্রার সমারোহ করিয়া দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির অনুপযোগী অপরুচির পরিচয় দেশের কোন দায়িত্বশীল সুসন্তান দিবে না। হিন্দুর চোখে দেশমাতৃকাই দশভূজা দুর্গা। সেই মায়ের কাছে আমরা যেন প্রার্থনা জানাই মা ... তোমার মর্যাদা রক্ষার জন্য বৃহত্তম ত্যাগ স্বীকারেও যেন আমরা কুণ্ঠিত না হই। বিশ্ব যেন জানিতে ও বুঝিতে পারে আমরা সত্যই মায়ের সুসন্তান।"

সরকার পক্ষ থেকে কেরোসিন, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ ও পেট্রোল প্রভৃতি ব্যবহার সংকোচের জন্যে বিশেষভাবে ভারতবাসীকে সচেতন ক'রে দেওয়া হয় এবং উৎসব অনুষ্ঠানে সকল প্রকার খাদ্যের অপচয় রোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়।

অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে কোরাসিনের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি তো হয়েই ছিল, তার উপর আবার হুগলী জেলার প্রায় সর্বত্র চাউলের অভাবে হাহাকার দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলেও চাউল প্রতি কিলো ১ টাকা থেকে ১ টাকা ১৫ পয়সা দরে বিক্রয় হতে থাকে। চাষের কাজ না থাকায় দিন মজুরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। স্থানে স্থানে লোকে কলাইয়ের রুটি খেয়ে কোনক্রমে জীবন ধারণ করে। উক্ত অভাব অনটনের পরিপ্রেক্ষিতে রিষড়ায় তখন চলতে থাকে ছিনতাই, ঘন ঘন বাড়িতে বাড়িতে চুরির ঘটনা, যার প্রতিরোধ কল্পে পাড়ায় পাড়ায় যুবকের দল ডিফেন্স পার্টি তৈরী ক'রে নৈশ প্রহরার ব্যবস্থা করেন। (বসুমতী — ১২।৫ ৬৫)

১৪-৯-৬৫ তারিখে রিষড়া দক্ষিণ মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসুশীল পুততুণ্ড রণক্ষেত্রে আহত জওয়ানদের প্রয়োজনে 'রক্তদান' উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী রক্তদান কেন্দ্র খোলার আয়োজন করেন এবং রিষড়ার প্রত্যেকটি সক্ষম সচেতন নাগরিকগণকে এই সংকট মুহূর্ত্তে দলে দলে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে কয়েকটি মিলে কারখানায় এবং পুলিশ ফাঁড়িতে 'সাইরেন' যন্ত্র স্থাপিত হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতি

উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও প্রতিদিন বেলা ন'টার সময় উক্ত সাইরেন ধ্বনি একদিকে যেমন সেই বিভীষিকাময় জাতীয় সংকটের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে অন্যদিকে তেমনই সজাগ ক'রে তোলে সকল শ্রেণীর মানুষকে সময়ের নির্দেশ জানিয়ে। পড়ে যায় সাজ সাজ রব।

পৌরপতি ডাঃ বন্দোপাধ্যায় জয়ন্তী সিনেমা হলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন কর্তৃক ১৭/১০/৬৫ তারিখে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আহুত সভায় যোগদানের আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী উক্ত সভায় দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে মারকিন ট্যাংক ও বিমান ব্যবহার করছে অথচ এ ব্যাপারে আমেরিকা একেবারেই নীরব। তিনি বলেন, আমেরিকার গম না পেলেও তাঁরা না খেয়ে মরবেন না। হয়তো তাঁদের কম খেয়ে থাকতে হবে। শ্রী সেন সকলকে কৃচ্ছ্রতা ও ত্যাগ স্বীকারের জন্যে আহ্বান জানান।

উক্ত সভায় নগদ ও চেকে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় (৩৯,৯১৬ ৭২)। জওয়ানদের জন্যে কিছু দেওয়ালীর উপহার প্যাকেট, বিস্কুট, চা ও কিছু স্বর্ণালঙ্কারও প্রদত্ত হয়।

(ষ্টেটস্ম্যান – ১৮।১০।৬৫ এবং আনন্দবাজার ১৯।১০।৬৫)

আবার চারণ কবি গেয়ে গেল :—

''আজ বাবি হ্যায় হিন্দুস্থানকী
কালা হোগী পাকিস্তানকী
কদম বাড়াকে চল্
হিন্দু মুসলমান।
ও দেখো দেখো
ভারতকে নওজোয়ান।।''

(অচেনা শহর কলকাতা)

২৬/১১/৬৫ শুক্রবার পূর্ণবাবুর ময়দানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্যে স্থানীয় কংগ্রেস ও ইউনিয়ন এবং

ন্যোশাল অর্গানাইজেসনে যুক্ত সভায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। জয় জোয়ান, জয় কিষাণ, জয় মজদুর, জয় হিন্দ ধ্বনির মধ্যে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। স্থানীয় প্রায় প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন-প্রতিনিধি যোগদান ক'রে প্রতিরক্ষা তহবিলে তাদের সংগৃহীত অর্থ দান করেন।

উপরোক্ত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আকস্মিক অগ্নি নির্বাপণের প্রয়োজনে অক্টোবর মাস থেকে চারবাতি পৌর বিদ্যালয় ভবনে অস্থায়ী ভাবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের (সি, ডি,) একটি স্কোয়াড অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে কার্যাবস্ত করে। কয়েক মাস পরে তিনকড়ি মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে ওয়াটার ওয়ার্কস পাম্প হাউসের পাশে প্রয়োজনীয় গ্যারেজ ও অন্যান্য গৃহাদি নির্মিত হওয়ার পর ঐ স্থানে স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়। পৌর সদস্যগণ ৩০৷১০৷৬৫ তারিখের সভায় উক্ত বিদ্যালয় গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবস্থা মঞ্জুর করেন এবং সেই সঙ্গে গান্ধী সড়ক স্কুলেও যত শীঘ্র সম্ভব বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবস্থা করণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। বলা বাহুল্য, এই দমকল সার্ভিস ছিল রিষড়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা। চারদিকে কলকারখানা, বিশেষ করে জুট মিলের পাট গুদামে আগুন লাগা প্রায়ই সংঘটিত হয়ে থাকে এবং সে আগুন নেভানোর জন্যে বাইরে থেকে দমকল আসতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। সেই অভাব পূরণে এটি একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হিবাবে পল্লীবাসী থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত সকলের কাছেই আদৃত হয়। পৌরসভাও মাসিক ১৫০্ শত টাকা হিসাবে ভাড়া পেতে থাকেন। তারপর জরুরী অবস্থায় টেলিফোন করার সুযোগও এসে যায়। পোষ্ট অফিস ও পুলিশ থানা ছাড়াও তখন অবশ্য অনেক গৃহস্থ বাড়ীতেও টেলিফোন সার্ভিস স্থাপিত হয়েছিল। এ বিষয়ে বোধহয় স্বর্গীয় বসন্ত কুবার দাঁ-ই প্রথম পথ প্রদর্শক। বর্ত্তমানে রিষড়ায় টেলিফোন সংখ্যা একবারে নগণ্য

নয়। বহু আবেদন পত্র 'প্রায়রিটি' পাবার অপেক্ষায় দীর্ঘকাল লাল ফিতার তলায় চাপা পড়ে আছে। রিষড়া পৌর ভবনে সাধারণের ব্যবহার্য টেলিফোন সার্ভিস স্থাপনের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

১৩।৪ ৭২ তারিখে আনন্দবাজারে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এই ধরণের আগুন ইতিপূর্বে বহুবার সংঘটিত হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য :—"পাট কলে আগুন। চন্দননগর, ১২ এপ্রিল—রিষড়ার একটি পাটকলে আজ বিকালে আগুন লাগলে মজুত পাট পুড়ে যায় এবং যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয় বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। দমকলের লোকেরা ৭টি ইনজিন নিয়ে দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে আনেন।"

আলোচ্য পাক-ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতি পরিসমাপ্তি ঘটানোর চেষ্টায় উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সোভিয়েট রাশিয়ায় আহূত হন এবং ভারতের পক্ষে সম্মানজনক সর্ত্তে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী স্বাক্ষর করেন কিন্তু দৈব দুর্বিপাক নিবন্ধন তিনি পরদিন রাত্রে খাদ্য গ্রহণের অব্যবহিত পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাসখন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন ১১ই জানুয়ারী ১৯৬৬। এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে ভারতীয় মাত্রেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং এই দৃঢ়চেতা সহজ সরল নাতিদীর্ঘ মহান নেতার প্রতি দলমত নির্বিশেষে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৭/১/৬৬ তারিখে পৌর সদস্যগণ ও কর্মচারীবৃন্দ গভীর বেদনা ও শোক প্রকাশক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন—"Sri Lal Bahadur Shastri who was a valiant soldier of freedom and sacrificed his life in the pursuit of peaceful co-existence and a better understanding among the people of the world. His achievement in Taskert in finding out a basis for enduring peace with Pakistan was unique and completely in accordance with the genius of the Indian people."... . ...

পৌরকর্মচারীগণ কর্তৃক পৌরভবনে শাস্ত্রীজীর একটি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

আত্মীয় স্বজনহীন দূর প্রবাসে বিনয়, নম্রতা ও সৌজন্য বোধের মূর্ত্তপ্রতীক লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসী জানাল প্রণতি, ভক্তিপ্লুত মনের শ্রদ্ধা অর্ঘ।

পূর্বোক্ত পাক-ভারত যুদ্ধের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ২২শে ও ২৩শে মে ১৯৬৫ রিষড়া যুব ছাত্র উৎসব কমিটি নিখিল বিশ্বে মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের রাখী বন্ধন উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলন জোরদার করতে—শান্তি ও মৈত্রীর মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে যুবকগণকে আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল গাঙ্গুলী, দীনেশ চন্দ্র ঘটক, যদুগোপাল সেন, ডাঃ সুধীর করগুপ্ত প্রভৃতি। সভাপতি ছিলেন শ্রীরামদয়াল মুখার্জ্জী এবং যুগ্ম-সম্পাদনায় ছিলেন সর্বশ্রী বাদল চ্যাটার্জ্জী ও পুণ্যকীর্ত্তি দাশশর্মা। এতদুপলক্ষে স্পোর্টস ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় হেটিংস মিলের খেলার ময়দানে এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় রিষড়া বয়েজ স্কুল হলে।

শ্রীরামপুর পৌর সভার শতবার্ষিকী।

শ্রীরামপুর পৌর সভার শতবর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ পর্যন্ত একপক্ষ কাল বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় এবং আর, এম, এস ময়দানে (বর্তমানে গান্ধী ময়দান) একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়; ইহার প্রধান আকর্ষণ ছিল টেলিভিসন যন্ত্র প্রদর্শন। ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ শ্রীরামপুর টাউন হলে পশ্চিমবঙ্গ পৌর সম্মেলনের ২২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সর্ব-ভারতীয় নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন

স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন কলকাতার মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ১৯/২/৬৫ তারিখে গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই সাফল্যমণ্ডিত হয় সুপরিচালনার গুণে।

(শ্রীরামপুর সমাচার—১৯/২/৬৫ ও ১২/৩/৬৫)

পূর্বেই বলা হয়েছে (পৃঃ ৪১৪) রিষড়া ছিল দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে (১৮৬৫ – ১৯১৫) উক্ত পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত এবং তৎকালীন প্রত্যেকটি উন্নতিমূলক কার্যের সহায়ক ও অংশীদার। শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে স্মরনিকা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেটি শুধু সুদৃশ্য ও সুরুচিপূর্ণ নয়, বহু তথ্য ও চিত্র শোভিত। দুঃখের বিষয়, পৌর সহ-সভাপতি-দিগের তালিকায় রিষড়ার স্বর্গীয় বামনদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বা চিত্র প্রকাশিত হয় নি। (পৃঃ ৪১৩)

যাইহোক, জন্মলগ্ন থেকে রিষড়া পৌর সভারও ৫০ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। অনেকের ভুল ধারণা হয়েছিল যে স্বতন্ত্র পৌর সভার সৃষ্টি বোধহয় ১৯৪৪ সাল কিন্তু তাঁরা তলিয়ে বোঝেন নি যে—'চ্যাটার্জি মুখার্জি কোং'এর 'মুখার্জি' যদি কোনও কারণে যয়েন্ট পার্টনারসিপ ত্যাগ করে স্বতন্ত্র কারবার খোলেন তাহলে 'চ্যাটার্জি' কোং-এর প্রাচীনত্ব ক্ষুন্ন হয় না।

১লা অক্টোবর ১৯৬৫ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলেও যুদ্ধ পারস্থিতির জন্যে সে সময় কোনও উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই শ্রীরামপুর পৌর সভার শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই রিষড়া পৌরসভা তার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকেন এবং পৌর সভাপতি ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২/২/৬৫ তারিখে আসন্ন পৌর শাসনের অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ত্তি উপলক্ষে ১৮৫৪ খৃঃ থেকে ১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত শতাধিক বৎসরের রিষডার সাংস্কৃতিক ও উন্নতিমূলক ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী সংকলনের জন্য একটি

প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেন। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত হয় ৩০শে জুন ১৯৬৫। রচনার গুণানুযায়ী ৪টি পুরস্কার ঘোষিত হয়—প্রথম, ৺বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়, ৺নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় ৺সুশীল চন্দ্র আওন ও ৪র্থ ৺বটকৃষ্ণ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার। চারজন প্রতিযোগী এই রচন সংকলনে অংশ গ্রহণ করেন, যে তিনজন বিশিষ্ট গুণী ও ঐতিহাসিক সমন্বয় বিচারক মণ্ডল গঠিত হয় তাঁর মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও প্রত্নতাত্বিক শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল এবং তৎকালিন শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক শ্রীশশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, টি। বলা বাহুল, উক্ত চারটি পুরস্কার লোকান্তরিত ভূতপূর্ব পৌর সভপতিগণের আত্মীয় স্বজন প্রদান করেন এবং এই গ্রন্থের লেখক প্রথম, সর্বশ্রী শান্তিরঞ্জন দাস দ্বিতীয়, মনীন্দ্র নাথ আশ তৃতীয়, এবং ললিত মোহন হড় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। শ্রীললিত মোহন হড় অবশ্য বিচারক মণ্ডলীর সর্বসম্মত অভিমতে সন্তুষ্ট হতে না পারায় চতুর্থ পুরস্কার গ্রহণে অসম্মতি জানান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ যে স গৃহীত রচন বলীর সারাংশ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত সংগ্রহগুলি ছিল নিঃসন্দেহে বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ এবং লেখক কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচনায় সেই সমস্ত তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে ঋণ যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৩/১/৬৬ তারিখে প্রথম প্রকাশিত 'প্রবাহ' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় উক্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতিযোগীবৃন্দকে অভিনন্দন জানানো হয়। অজ্ঞাত কারণে উক্ত পত্রিকার প্রবাহ অচিরেই শুকিয়ে যায়। অবশ্য "ফুলঝরে গেলেও তার সুরভি যে চিরন্তন স্বর্গলোক গড়ে রাখে, তার মূল্যও তো অল্প নয়।" সম্পাদনায় ছিলেন শ্রীসুজিত কুমার চন্দ এবং পরিচালনায়

ছিলেন শ্রীভূদেব গুপ্ত। ইনি ১৯৬০ সালে রিষড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষায় একাদশ স্থান লাভ করে বৃত্তি লাভ করেন। উক্ত সালেই শ্রীঅম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলা বৃত্তি লাভ করেন। (পৌরসভা সুবর্ণজয়ন্তী পত্রিকা শ্রীললিত মোহন হড়)

বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে মাসের পর মাস গড়িয়ে যায় এবং উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজন করতে এবং প্রদর্শনীর জন্য আবশ্যকীয় প্রাচীন দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করতে প্রায় একটা বছর কেটে যায়। এসে যায় ১৯৬৬ সালের শুভ পদক্ষেপ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুপরিচালনা ও সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলার অভিপ্রায়ে পৌর সদস্যবৃন্দ, রিষড়া পৌর অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে পাঁচ পাঁচটি কমিটি গঠিত হয় এবং তার উপর থাকে স্বেচ্ছাসেবক সাব কমিটি। যুগ্ম সম্পাদকের পদে বৃত হয়েছিলেন সর্বশ্রী দীনেশ চন্দ্র ঘটক ও তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি পদে ছিলেন পৌর প্রধান ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ পদে ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাঁ।

রিষড়া পৌরসভার সুবর্ণ জয়ন্তী।

শুধু রিষড়া পৌরসভার ইতিহাসে নয় সমগ্র রিষড়াবাসীর কাছে এটি একটি স্মরণীয় উৎসব অনুষ্ঠান। কাল-চক্রে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আবহাওয়া নিত্য পরিবর্তনশীল। যে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে শতবর্ষ পূর্বে পৌরশাসন ব্যবস্থা ১৯৬৫ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থ মধ্যে সংকলন করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে সেটা একটা ছায়া মাত্র; কায়ার সন্ধান করা বৃথা। যাঁরা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা রিষড়াকে একটি পরিপূর্ণ শহরের রূপ দান করে গেছেন, তাঁরা আজ সকলেই লোকান্তরিত। যে সমস্ত স্বদেশী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠির

দল বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে রিষড়াকে হুগলী জেলার একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প উপনগরী হিসাবে পরিচিত হতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শ্রমিককুলের রুজি রোজগার করার কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত করতে সাহায্য করেছেন তাঁরাও আজ সকলে রিষড়ায় উপস্থিত নেই বা ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। বর্ত্তমান নাগরিক বৃন্দের কাছে আজ তাঁরা সকলেই স্মরণীয় ও বরনীয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রস্তুতিপর্বের সংক্ষিপ্ত সমাচার বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফৎ সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। প্রস্তাবিত প্রদর্শনীর ব্লুপ্রিণ্ট তৈরী করেছিলেন যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক। বলা বাহুল্য একমাত্র তাঁর কর্মদক্ষতার ফলেই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষ ক'রে স্থানীয় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রদর্শনীতে ষ্টল খুলে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য সম্ভার দর্শকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর করেন। পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি ষ্টলে বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্র পত্রিকা সংগ্রহ দর্শকবৃন্দের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। ২৭।২।৬৬ থেকে ৩।৩।৬৬ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিন রাত্রে বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বর্ত্তমান পৌর ভবনের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর প্রদর্শনী ও তদ্দক্ষিণে মূল সভাধিবেশন মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়। গঠনমূলক কার্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যসূচী উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১) পৌর ভবন প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু মহাশয় ২৭ ২ ৬৬ তারিখে ভারতের তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সন্তান নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের আবক্ষ মর্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন এবং অনিবার্য কারণে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতির ফলে সভাধিবেশন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

(২) ২৮।২।৬৬ তারিখে বর্দ্ধমান বিভাগের ভুক্তিপতি শ্রী ভি, এস, সি, বনার্জি, আই, এ, এস কর্ত্তৃক শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ও উন্নতিমূলক রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কারীদের এবং স্থানীয় বিদ্যালয়

সমূহের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে আন্তঃবিদ্যালয় পরীক্ষা ও স্পোর্টসে অধিকৃত যোগ্যতানুযায়ী পুরস্কার বিতরিত হয়।

(৩) ১।৩।৬৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ পৌর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্বায়ত্ব শাসন বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রীফজলুর রহমান। পৌর সভাপতি তাঁব স্বাগত ভাষণে সমবেত পৌর প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পৌরসভার গত পঞ্চাশ বছরের প্রশাসনিক বিবরণ সহ শিল্প-উপনগরী রিষড়ার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট ও অভাব অভি-যোগ সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করেন। বলা নিঃপ্রয়োজন যে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আয়োজিত প্রদর্শনী দর্শন করে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। অনিবার্য কারণে, শেষ পর্যন্ত বিঘোষিত টেলিভিসন যন্ত্র প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে পৌর প্রধান সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যাভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অতিথি অভ্যাগতদের যথোপযুক্ত আপ্যায়নের ত্রুটির জন্যে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন।

৩/৩/৬৬ তারিখে শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক শ্রীঅশোক গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় তৎকালীন ৪নং ওয়ার্ডের বিদ্যালয় ভবনের শিলান্যাস ও পৌর প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকবৃন্দের জন্য নির্মিত শ্রমিক নিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

পৌর সভাপতি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ১৯৬৫/৬৬ সালের বাৎসরিক প্রশাসনিক কার্য বিবরণীতে ও স্মরণকা গ্রন্থের মাধ্যমে এই স্মরণীয় আনন্দোচ্ছল ঐতিহাসিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিভিন্ন সংস্থাকে ও রিষড়ার নাগরিকবৃন্দকে নিম্নলিখিত ভাষায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

"I acknowledge with thanks the liberal contributions received either in cash or in kind from the firms, industries, various departments of

West Bengal Government as well as from the citizens which rendered the function a grand success. I am also grateful to the co-workers, well-wishers and members of the Celeberation Committees for their help and co-operation received on this memorable occasion."

"I am also grateful to those co-workers, ... whose help and co-operation have rendered this publication both educative and attractive and my thanks are also due to the firms, industries and Govt. departments who have contributed largely for bringing out this Souvenir in its present from as also displaying their exhibits in the Golden Jubilee Exhibition .... and express my sincere appreciation for the valuable serviees rendered by the Head-clerk of the Municipality in publishing this Souvenir."

উক্ত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ও তাদের স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং এতদুপলক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

যে সমস্ত স্বনাম খ্যাত চিত্রাভিনেত্রীদের রূপালী পর্দায় লোকে দেখতে অভ্যস্ত সেইসব অভিনেত্রীদের বিশেষ ক'রে স সম্প্রদায় কানন দেবী ও মলিনা দেবীকে রক্তমাংসের শরীরে . ঘরের পাশের রঙ্গমঞ্চে দেখার জন্যে দর্শকদের ভিড় হওয়া স্বাভাবিক তার উপর আবার বিশ্ববিশ্রুত নৃত্য শিল্পী উদয় শংকরেয় নৃত্যকলা দেখার সুযোগই বা ছাড়া যায় কি করে। এর উপর আরও ছিল, অবাঙালীদের প্রিয়

পান্নালাল বসুর সম্প্রদায় কাওয়ালী গান শোনার জন্তে টিকিট বিক্রির সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

একদিকে যখন রিষড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার অধিবাসীরা আবাল বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে উপরোক্ত আনন্দ মেলায় যোগদান করতে ও প্রদর্শনী দেখতে উৎসাহিত হয়েছিল, অন্যদিকে তখন এক শ্রেণীর নাগরিক ইস্তাহার ছাপিয়ে পৌরসভার কার্যের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনায় মেতেছিলেন আবার এক শ্রেণী তৎকালীন খাদ্য পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এই ধরণের আনন্দ মেলায় যোগদানের জন্যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করেছিলেন তবে অনিবার্য কারণে মুখ্য-মন্ত্রী উপস্থিত হতে পারেন নি তাই রক্ষে।

স্মরণিকা গ্রন্থে গত পঞ্চাশ বছরের আয় ব্যয়ের যে তুলনামূলক সারণী প্রকাশিত হয় তার সংক্ষিপ্ত সার হল :—

	মোট আয়	মোট ব্যয়
১৯১৫-১৬ (সংযুক্ত রিষড়া-কোন্নগর)	১২,৯৫২ টাকা	১১,৫৭৫ টাকা
১৯৪৪-৪৫ (রিষড়া পৌরসভা একক)	৫০,০৪৫ ,,	৪৭,০৮৪ ,,
১৯৬৪-৬৫ ঐ	৬,১৭,২৩৪ ,,	৫,৫০,৩৫৬ ,,

লোক সংখ্যা :— ১৯৪৪ = ২৩,৬৯০, ১৯৫৪ = ২৭,৪৬২ ১৯৬৪ = ৫০,০০০, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি বার তের হাজারের বেশী নয় সেখানে এই শহরে মাত্র দেড় বর্গমাইল এলাকার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ত্রিশ হাজারের বেশী।

উৎসব মণ্ডপের মেরাপ খোলা হতে না হতেই ১০/৩/৬৬ তারিখে খাদ্যের দাবীতে রিষড়া ষ্টেশনের অনতি দূরে ট্রেন ও দমকল অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কথা ৫৯৮ পৃঃ বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে ১২/৩/৬৬ তারিখে রিষড়া কলোনীতে মিলিটারী সহ পুলিশী হানা ও তাদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৭/৩/৬৬ তারিখে মোড়পুকুর সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গনে জনসভায় 'মোড়পুকুর সংহতি পরিসদ' গঠিত হয় এবং পুলিশের অন্যায়

অত্যাচার বন্ধের ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করা হয়।

রিষড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী পৌর এলাকাগুলিতে এক সপ্তাহের জন্য সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ করা হয়।

২৯/১০/৬৬ তারিখে বাঙ্গুর পার্কে পৌরসভা পরিচালিত মাতৃ-সদনের শুভ উদ্বোধনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ৬০০)। ৩।১১।৬৬ তারিখে 'জনসেবক' পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং সভাপতির বক্তব্য উল্লেখ ক'রে মাতৃমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

মাতৃসদনের বহির্বিভাগে আসন্ন প্রসবাদের পালাক্রমে পরীক্ষা এবং আবশ্যকীয় উপদেশ প্রদানের জন্য স্থানীয় চিকিৎসকদের যে প্যানেল গঠিত হয় তার মধ্যে ছিলেন :—সর্বশ্রী ডাঃ করুণা কিঙ্কর সরকার, ডাঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত মিত্র এবং ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী। এঁরাই সময়ে সময়ে মিটিংএ মিলিত হয়ে মাতৃসদনের বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নতিমূলক কার্য নির্দ্ধারণ করেন। বলাবাহুল্য তাঁদের এই অবৈতনিক সেবার ফলেই মাতৃসদন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য এই মেডিকেল কমিটির সদস্য পরিবর্ত্তন ও সংযোজন হয়েছে। সেবিকা ও কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে। পৌর-সভার পক্ষ থেকে পরিদর্শক নিযুক্ত হন পৌরসদস্য শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ৩নং রেলওয়ে ফটক ঘন ঘন বন্ধ থাকার ফলে আসন্না প্রসবাদের তাড়াতাড়ি রেলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত সেবাসদনে পৌঁছান একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্যে একটি 'ফ্লাইওভার' রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় কিন্তু তার আকাশচুম্বী ব্যয় সংস্থানের কোনও উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব না হওয়ায় সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

খাদ্যাবস্থার নিদারুণ অবনতি ॥

১৯৬৫ সালে উপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায় খরার ফলে শস্যোৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় যার ফলে ১৯৬৬ খৃঃ হুগলী জেলায় চাউলের জন্যে হাহাকার পড়ে যায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্যের দাবীতে পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্থানে ট্রেন আটক পড়ে। ৮।৮।৬৭ তারিখে রিষড়ায় লাইন অবরোধের ফলে সকাল সাড়ে আটটা থেকে বৈকাল পর্যন্ত ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ৯।৮।৬৭ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় তার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়। পুলিশদের মাথায় তখন লোহার টুপি শোভা পাচ্ছে। দিকে দিকে খাদ্যের দাবীতে মিছিল বাহির হতে থাকে এবং রাজ্য সরকারের খাদ্য নীতির প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত হয়।

৮ই শ্রাবণ ১৩৭৪ (ইং ২৫।৭।৬৭) যুগান্তরের সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয়—"আর পারা যায় না, একটা কিছু করুন।" নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ যা খেয়ে মানুষ দুবেলা বেঁচে থাকবে তার অগ্নি মূল্যের ফলে সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। চাল সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা পর্যন্ত উঠেছে যা পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ও হয়নি। ডাল দু'টাকা কেজির আশেপাশে, সরষের তেল পাঁচ টাকার উপরে। এক তেলাপিয়া ছাড়া চার টাকার নীচে কোন মাছ নেই। ডিমের জোড়া ষাট পয়সা। আলু সেই এক টাকা দশ পয়সায় গ্যাঁট হয়ে বসেছে, নড়বার নামটি নেই। বেগুন এক টাকা, পটল আশি পয়সা, এমনকি ঢেঁড়শ সেও এক টাকার নীচে নামতে চাইছে না। কাঁচা পেঁপে সেও এক কেজি সত্তর কিংবা আশি পয়সা। বাঙলীর সংসার থেকে জলখাবার তো প্রায় উঠেই গেল। পাঁউরুটি অদৃশ্য কিংবা দুষ্প্রাপ্য, চিড়ে মুড়ি যা বাঙলা দেশের সাধারণ মানুষের চিরকালের খাবার সেও সাড়ে তিন টাকায় উঠে গেছে। রেশনে চিনি কমছে তো কমছেই। সঙ্গে সঙ্গে খোলা বাজারে তার দাম গিয়ে ঠেকেছে চার টাকায়।

গুড় ? সেও আড়াই থেকে তিন টাকা। মানুষ কি খেয়ে বাঁচবে ?"
"১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে চালের বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫০ গ্রাম এবং গম ১৪০০ গ্রাম। ২৫শে ফেব্রুয়ারি চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে আবার মাথাপিছু একশ গ্রাম চাল কমানো হয়।"

(পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য চিত্র ১, নিশীথ দে। আ বাঃ ৩০।১০।৭৩)

এর পরের চিত্র আরও ভয়াবহ, আরও নিদারুণ। ১৯৬৭ তারিখের যুগান্তরে প্রকাশিত হয় যে অনাহারে থাকতে না পেরে মা হয়ে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মাত্র ১০্ দশ টাকায় বিক্রী করে দিয়েছে। দু,এক বেলা ভাতের অভাবে চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে যে লোকে দিন গুজরান করবে তার দামও তখন পাঁচ টাকা কিলো। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ আইনের তাড়ায় তাদেরও আমদানী রপ্তানি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম।

কথায় বলে 'চাল চিঁড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড।' অর্থাৎ দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যেতে হলে বা গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণের প্রাক্কালে লোকে আর কিছু না হোক চাল, চিঁড়ে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। চিঁড়ের পুটুলি সামলাতেই বুড়িরা অস্থির। 'অন্নপূর্ণার ঘরে অন্নের অভাব।' সেই চিঁড়ে মুড়ির বাজার আগুন। নাগালের বাইরে বললেই হয়। এমন দিনও ছিল, যখন এক পয়সার মুড়িতে একজনের দিন চলে যেতে পারতো। বর্দ্ধমান, মেমারি প্রভৃতি স্থান থেকে মুড়ির চালান আনতে আবার লাইসেন্স ব্যবস্থাও চালু হয়ে ছিল, অর্থাৎ আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধন।

উপরোক্ত অসহনীয় পরিস্থিতিতে রিষড়া কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২রা জুলাই ১৯৬৭ পূর্ণবাবুর ময়দানে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারি, রেশনে চালের বরাদ্দের কমতি, কলে কারখানায় জুলুম, মারপিট খুন জখম অবাধে চলার ফলে জীবনের সর্বস্তরে যে প্রচণ্ড অসুবিধা ও অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয় সেই সম্বন্ধে সম্মেলন আলোচনার জন্যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জনাব রেজাউল করিম,

সর্বশ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, এম, এল, এ, ডাঃ গোপালদাস নাগ এম, এল, এ প্রভৃতি এবং ট্রেডইউনিয়ন ও জননেতাগণ যোগদান করেন।

বিহারে খরা পরিস্থিতির ফলে অনাহারক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যার্থে রিষড়া পৌরসভার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান করেন ২৪৫।৬৭ তারিখে রাত্রে। রিষড়া বিহার রিলিফ কমিটির পক্ষে সম্পাদক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক ১৪,১৭১৲ টাকা, কাপড় চোপড় এবং ভিটামিন ট্যাবলেট মুখ্যমন্ত্রীকে প্রদান করেন। (যুগান্তর ২৬৫।৬৭)

পরবর্ত্তী পৌর নির্বাচন।

উপরোক্ত রাজনৈতিক ও খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রিষড়া পৌরসভার পরবর্ত্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৮৫।৬৭ তারিখে একক আসনবিশিষ্ট ১৬টি ওয়ার্ডে। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০ হাজারেরও বেশী এবং এই নির্বাচনে মোট ৬১ জন প্রার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। (বাৎসরিক কার্যবিবরণী—১৯৬৬ ৬৭) নূতন বোর্ড কার্যভার গ্রহণ করেন ২।৭৬৭ তারিখে। পূর্ববর্ত্তী বোর্ডের কার্যারম্ভ হয় ১৫ই জানুয়ারী ১৯৬১ সালে। সাড়ে ছ'বছরের কার্যকাল এইখানেই শেষ হয়ে যায়।

ভূতপূর্ব পৌর সভাপতি ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করতে বিরত থাকেন তার কারন বোধহয়, তিনি সে সময় বহু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন,—রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক, রিষড়া বান্ধব সমিতি সাধারণ পাঠাগারের সভাপতি, শ্রীরামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির সভ্য পশ্চিমবঙ্গ পৌর সংস্থার কার্য পরিচালন সমিতির সভ্য, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েসনের শ্রীরামপুর শাখার সহ সভাপতি

শ্রীরামপুর লায়ন্স ক্লাবের সভা প্রভৃতি। এর উপর ছিল তাঁর সুবিস্তৃত চিকিৎসা ব্যবসায়। কথায় বলে জ্যাক অব্ অল ট্রেডস, মাষ্টার অব নান্।" একসঙ্গে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকলে সকলের প্রতি সমপরিমান সময় ও পরিদর্শন করা সম্ভব নয় একথা স্বতঃসিদ্ধ। ২৯.৬.৬৭ তারিখে পৌর কর্মচারীবৃন্দ তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানানো প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে স্বেচ্ছায় সুনাম ও পদমর্যাদার মোহজাল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেওয়ার মধ্যে যে দৃঢ়চিত্ততা এবং আত্মত্যাগের পরিচয় তিনি দিয়ে গেলেন তা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। বহু গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করার গৌরবই শুধু তিনি অর্জন করেন নি; মধুর ব্যবহার, সমতানুবর্তিতা, এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে তিনি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে সকলের হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছিলেন। পৌরসভার অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যেও কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দের অভাব অভিযোগ পূরণে সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে তিনি তাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। যশস্বী চিকিৎসক হিসাবে তাঁর দীর্ঘায়ু এবং অম্লান সৌভাগ্য সকলে কামনা করেন।

১৯৬৭ সালের পৌর নির্বাচন।

পৌরসভার উক্ত নির্বাচন ছিল বহু দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট নূতন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীযদুগোপাল সেন এবং শ্রীকাশীনাথ সিং। যদুগোপাল সেন পৌর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৬০ সালে।

যদু বাবুর আমলের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো বিবৃত করার আগে স্থানীয় কয়েকটি ঘটনার বিবরণ পরিবেশন করা আবশ্যক। ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট

সরকার গঠিত হয়। গত ২০ বৎসর ব্যাপী কংগ্রেস শাসনের আশা নিরাশার দিনগুলোর অবসান ঘটিয়ে লোকে একটা নূতন শাসন ব্যবস্থাকে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই ক'রে দেখতে চান। কিন্তু এর ফলে শুধু দেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে এসেছে বিরাট পরিবর্ত্তন, জটিলতা ও দ্বন্দ্ব। মানুষের আশা আকাঙ্খা পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংকটের আবর্তে দুর্নিরীক্ষ। জীবনযাত্রা হয়েছে আরও জটিল ও দুঃসহ। সে অবস্থার চাপ যে কিভাবে তার ভয়ঙ্কর মুখব্যাদন ক'রে সাধারণ মানুষকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে সে কথা আজ সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। আশাভঙ্গ জনিত মর্মপীড়ায় সকলেই ব্যথিত।

এই সালের দ্বিতীয় উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হল রিষড়া সেবাসদনে ২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৭ অনুষ্ঠিত হুগলী জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের দশম বার্ষিক অধিবেশন, নির্দিষ্ট সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক উপস্থিত হতে না পারায় অধ্যাপক কবি কৃষ্ণধর, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও শ্রীঅখিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। রিষড়া সেবাসদনের সম্পাদক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে উপস্থিত সাংবাদিক ও সমাগত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানান এবং রিষড়ার ঐতিহাসিক পটভূমি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর আলোকপাত করেন। মফঃস্বলের সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের দুরবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয় বলেন যে মফঃস্বলের সংবাদ দাতারা অবজ্ঞা উপেক্ষিত ও তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাংবাদিক সংঘ হুগলী জেলার যে চারজন কৃতি সন্তানকে সম্বর্দ্ধনা ও মানপত্র প্রদান করেন—তাঁরা হলেন সর্বশ্রী হরিপদ সেন শাস্ত্রী, তারকানাথ বিদ্যাবিনোদ, ভূপতি মজুমদার ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্য। শুভ্র কেশধারী প্রবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হরিপদ

সেন শাস্ত্রী মহাশয় অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে মনোজ্ঞ ভাষায় তাঁর অভিভাষণ প্রদান করেন। সেবাসদনের পক্ষথেকে শ্রীমারালাল গাঙ্গুলী সমবেত সাংবাদিকদের সকল প্রকার আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন। (শ্রীরামপুর সমাচার— ২০শে মাঘ, ১৩৭৩)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে রিষড়ায় অনুষ্ঠিত গন্ধবণিক মহাসম্মেলন, নিখিলবঙ্গ পৌর সম্মেলন, পশ্চিবঙ্গ উৎকল সম্মেলন প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্মেলনগুলির মধ্যে আলোচ্য হুগলী জেলার সাংবাদিক সম্মেলন—রিষড়ার পক্ষে একটি গৌরবময় অনুষ্ঠান। ১৮৮৫ খৃ প্রকাশিত হরিদাস গড়গড়ি মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারতবাসী' নামক পত্রিকা থেকে আরম্ভ ক'রে অদ্যাবধি রিষড়ায় বহু হাতে লেখা ও মুদ্রিত পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশ সম্বন্ধেই ইতিপূর্বে কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলির অস্তিত্ব আজ বজায় না থাকলেও সেই সমস্ত প্রচেষ্টা যে একেবারে নিরর্থক বা মূল্যহীন নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। আনন্দের বিষয় যে রিষড়া প্রেমমন্দির থেকে প্রকাশিত ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'প্রেমপ্রবাহ' চতুর্থ বৎসরে পদার্পন করেছে।

!! নব জাগরণের পথিকৃৎ শ্রীরামপুর কলেজ !!

৩০শে নভেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর '৬৮ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামপুর কলেজের সার্ধশতবর্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই ডিসেম্বর শনিবার 'কলেজ-ডে' উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলেন- 'ভারতের নব জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীরামপুর কলেজ। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের দান উল্লেখের দাবী রাখে। সভাপতিত্ব করেন বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেন।

১৮১৮ খৃঃ এই কলেজ স্থাপনের কথা এই গ্রন্থের ২১৪ পৃঃ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতদঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই মহাবিদ্যালয়ের অবদান বিশেষভাবেই আলোচিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এখানেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়—যুক্তফ্রন্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগে। বিক্ষোভকারীগণ "ধর্মবীর ফিরে যাও' ধ্বনি দিতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ —এই রাজ্যপাল চক্রান্ত করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে বে-আইনী ঘোষ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। প্রায় দশমাস রাজ্যপালের স্বৈরাচারী শাসনের ফলে বাংলাদেশের জনজীবন আজ বিপর্য্যস্ত। (আঃ বাঃ ৭।১২।৬৮)

উপরোক্ত উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন মিশনারী উইলিয়ম কেরীর পৌত্র শ্রীহ্যারী ব্রিনটন কেরী ও শ্রীমতী কেরী। তিনি বলেন "শ্রীরামপুর নামটি আমাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার। তাই বিলাতে সাসেকস্ মেফিল্ডের পৈতৃক বাসভিটার নাম "শ্রীরামপুর।" ৫।১২।৬৮ তারিখের আনন্দবাজারে তাঁর প্রদত্ত আকর্ষণীয় এবং বহু তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের স্মরণিকা হিসাবে কলেজভবনের চিত্রশোভিত বিভিন্ন মূল্যের ডাক টিকিট প্রকাশিত হয়। ৬।১২।৬৮ তারিখের সাপ্তাহিক 'পল্লীডাক' পত্রিকায় এই কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতেই আবার ১৬৮।৬৩ তারিখে 'শ্রীরামপুর কলেজের রেকটরের দুর্মতি, শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালীন অস্থায়ী রেকটর মহাশয় কর্তৃক হিন্দুধর্মানুষ্ঠানের উপর আঘাত হানার বেদনাদায়ক কাহিনী প্রকাশিত হয়।

ভারতের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান।

উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মাঝামাঝি হিন্দুস্থান মোটর নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয় ১৯৪৬ সালে ৭৪০ একর জমির উপর। ১৯৬৮

সালে কর্মীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজারেরও বেশী। ১৯৪৯ সাল থেকেই বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ আরম্ভ। এই কারখানায় তৈরি- হিন্দুস্থান-১০ ও ১৪এর পরে ১৯৫৪ সালে হিন্দুস্থান ল্যাণ্ডমাষ্টার তারপর ১৯৫৭ সালে হিন্দুস্থান অ্যামবাসেডর এবং ১৯৬৩ সালে নির্মিত অ্যামবাসেডর মার্ক টু মডেলের গাড়ীর মালিকের সংখ্যা এতদঞ্চলে নগণ্য নয়। কলকাতায় কুখ্যাত কালরংয়ের এ্যাম- বাসেডর গাড়ীতে করে ব্যাঙ্ক লুঠের পর থেকেই যেন এই মডেলের গাড়ীর দিকে লোকের নজর বেশি করে পড়ে। মোটর গাড়ী ছাড়াও লরীর ইনজিন তৈরীর নূতন কারখানাটির উদ্বোধন হয়—১১।১১।৬৮ তারিখে। বলাবাহুল্য, ভারতের অন্যতম এই বিরাট কারখানার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিড়লা কোম্পানী, যাঁরা ভারতের মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদিগের শীর্ষস্থানীয়।

এই কারখানা স্থাপনের ফলে রিষড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু কর্মীর অন্নসংস্থানের সুযোগ মিলে যায় এবং এই প্রতিষ্ঠানেরর নিজস্ব কর্মীদের সুবিধার্থে স্থাপিত হয় উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মধ্যবর্তী স্থানে নূতন ষ্টেশন — 'হিন্দমোটর'। প্রথমে ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের নাম ছিল 'হিন্দমোটর হল্ট''। হাজার হাজার যাত্রী এই ষ্টেশনে প্রতিদিন উঠানামা করেন তাঁদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজে যোগদান ও ছুটির সময়ে।

উক্ত নূতন ষ্টেশন স্থাপনের ফলে হাওড়া থেকে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত ষ্টেশন গুলো যে ভাবে ছড়ায় গাঁথায় ছিল তা মধ্যে হল ছন্দপতনঃ-(হাওড়া লিলুয়া, বালি, উত্তরপাডা, কোন্নগর, রিষড়া শ্রীরামপুর সেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর,) অবশ্য লিলুয়া, বেলুড়; উত্তরপাড়া প্রভৃতি ষ্টেশন গুলোও এইভাবেই বিভিন্ন সময়ে একের পর এক স্থাপিত হয়েছিল, একসঙ্গে গড়ে উঠেনি, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ডাক ও তারের মাশুল বৃদ্ধি

এক পয়সার পোষ্টকার্ড আর দু' পয়সার খাম প্রচলিত হবার পর থেকে (পৃঃ ৩৯১) ধাপে ধাপে বেড়ে এদের দাম হয়েছিল যথা ক্রমে ৬ পয়সা ও ১৫ পয়সা। সরকারী দর বৃদ্ধির প্রতিবাদ ধ্বনি উঠেছে বারে বারে কিন্তু কোনও প্রতিকার হয়নি। ১৯৬৮ সালের ১৫ই মে থেকে পোষ্ট কার্ডের দাম ৬ পয়সার জায়গায় ১০ পয়সা, ইনল্যাণ্ড লেটারের দাম ১৫ পয়সা এবং খামের দাম ২০ পয়সা ধার্য হয়। মনিঅর্ডারের কমিশনও বেড়ে যায়, প্রতি দশ টাকায় ১৫ পয়সার জায়গায় ২০ পয়সা। ফলে সরকারের বাৎসরিক রাজস্ব বেড়ে যায় ২০ কুড়ি কোটি টাকা,। কথায় বলে-গরজ বড় বালাই, লোকে দূরস্থ আত্মীয় স্বজনের কাছে চিঠি না লিখে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননা বা প্রবাসী চাকুরীয়ার দল দেশে টাকানা পাঠিয়ে বা জরুরি প্রয়োজনে তার না ক'রে স্থির থাকতে পারেন না, (আনন্দ বাজার ২৪।৪।৬৮)

উপরোক্ত ডাক ওতারের মাশুল আরও বেড়েছে ১৫ই মে ১৯৭৪ সাল থেকে, এখনও তাই চলছে, অবশ্য আবার যে বাড়বেনা তারই বা স্থিরতা কোথায় ? টেলিফোন চার্জ্জও ঐ তারিখ থেকেই বেড়ে গেছে। তিনমাসে তিনশ কল-এর অতিরিক্ত প্রতি কল-এর জন্য ২৫ পয়সা দিতে হচ্ছে। (যুগান্তর ১৪।৫।৭৪)

স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সাল থেকে মুদ্রায় কোন প্রতিকৃতি ছিলনা, প্রথম তার ব্যতিক্রম হল — ১৯৬৪ সালে জহরলাল নেহরুর আকণ্ঠ মূর্ত্তি ছাপার পর থেকে খাম পোষ্ট কার্ডে অবশ্য ভারতের বহু মনীষীর প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে। বাংলার কৃতি সন্তান, কবি ও দেশপ্রেমিকরাও বাদ যাননি। ১৯৭০ সালে গান্ধীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষেও মুদ্রায় ও খাম এবং ডাক টিকিটে তাঁর প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে।

পঞ্চাশ বছরে এমন বৃষ্টি হয়নি।

১৯৬৮ সালে জুন মাসে প্রথম ২৭ দিনে কলকাতা শহর-গুলিতে এত বৃষ্টিপাত হয় যে গত ৫০ বছরে তার তুলনা মেলা ভার। তেমনি আবার গত পঞ্চাশ বছরে জুন মাসে কম বৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬০ সালে। কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি, একটা দিনও বাদ যায়নি, লোকে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, দিনের পর দিন কাঁথাকানি শুকোয় না এমনই অবস্থা। ১৮৯৯ সালে পর বিংশ শতাব্দীর শীতলতম দিন ছিল ইং ২১।১২।৬৬ তারিখে, সেদিন কলকাতার তাপাঙ্ক নেমে গিয়েছিল '৭' ডিগ্রি সেনটিগ্রেডে। রাত্রে ঘন কুয়াশায় পথ ছিল ঢাকা/মফঃসলের তাপমাত্রা ছিল আরও কম, যার ফলে স্থানে স্থানে শীতের প্রকোপে 'দু একজন বৃদ্ধের মৃত্যুও ঘটে। (আনন্দ বাজার, ৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ১৩৭৩, ইং ২২।১২।৬৬)। রিষড়া রেল লাইনের পূর্বপার্শ্বে কলকার খানাপূর্ণ এলাকা অপেক্ষা পশ্চিমদিকে মোড়পুকুর অঞ্চলে তাপাঙ্ক যে অপেক্ষাকৃত কম সে কথা ভুক্ত ভোগী মাত্রেই জানেন তেমনই তারতম্য কলকাতা ও রিষড়ার মধ্যে। কথায় বলে-'মাঘের শীত বাঘকে লাগে' আবার-'আধা মাঘে কম্বল কাঁধে'। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা, জীবজন্তু ভেদেও শীতের তারতম্য হয়ে থাকে। 'অশীতাস্তরবো মাঘে' ফাল্গুনে পশুপক্ষিণৌ, চৈত্রে জলাচরাঃ সর্ব্বে বৈশাখে নরবানরৌ, অর্থাৎ মাঘমাসে বৃক্ষসকলের শীত যায়, ফাল্গুন মাসে পশু পক্ষীরা এবং চৈত্রমাসে জলচর জীবগণ শীতহীন হয় আর বৈশাখ মাসে মানুষ ও বানর জাতির শীত দূরীভূত হয়।

মহেশের গুটকে সন্দেশ

এতক্ষণ নীরস তথ্য পরিবেশন করার পর একটু মুখমিষ্টির কথায় আসা যাক। বল্লভপুরের মহেশ ময়রার গুটকে সন্দেশের

নাম শোনেননি বা তাঁর রসাস্বাদনে তৃপ্তি লাভ করেননি এমন কেউ এদঞ্চলে আছেন কিনা সন্দেহ। শতাধিক বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১২৬২ সালে এই সন্দেশের জন্ম, জন্মদাতা ৺ মহেশ চন্দ্র দত্ত। তিনি প্রথমে কলকাতা মিষ্টির দোকানে সামান্য কারিগর ছিলেন, ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আশায় বল্লভপুরে তেলেভাজা, চিঁড়ে মুড়কির দোকান খোলেন, পরে তিনি শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তাঁর ভোগের জন্যে 'গুটকে' সন্দেশ তৈরী সুরু করেন, তখন থেকেই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না হন। বহু নামী ও দামী সন্দেশ বাজারে প্রচলিত হলেও 'গুট্‌কে' সন্দেশের আদর একটুও কমেনি। স্থানে স্থানে শাখা দোকান স্থাপনের মধ্যেই তার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে, কিংবদন্তী, মাহেশের জগন্নাথদেব একবার বালকের বেশ ধরে মহেশের দোকান থেকে হাতের সোনার বালা বন্ধক দিয়ে এই গুটকে সন্দেশ খেয়ে যান। সেই থেকে জগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদে এই সন্দেশ দেব-দেবীর পূজায় যেমন অনুমোদিত মিষ্টি তেমনি মানুষের রসনাপরিতৃপ্তি-রও সুমিষ্ট খোরাক, বলা বাহুল্য, বিশেষ আকৃতির এই জোড়-সন্দেশের নকলও হয়েছে কিন্তু আসলের ধার ঘেঁসেও যায়নি, (বসুমতী—২।৬।৬৮ রবিবার)

পৌষ পার্ব্বণ

বর্ত্তমান যুগে অবস্থা বিপাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হয়েছি, প্রাচীন পৌষ পার্বণ বা পিঠে পার্বণ তারই মধ্যে একটি, কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের আমলের- "সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা, এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥ .... ঘোর জাঁক বাজে শাঁখ যত সব রামা, কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামাধামা,, চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে, বল দেখি কি হইবে নয় রেক চেলে?" এই সব কাহিনী ছেড়ে দিলেও মাত্র তিন চার দশক

আগেও ক্ষীরপুলি রসপুলি, সরুচাকলি, মোহনবাঁশী, পাটাসাপটা নামের কত রকমের পিঠেই তখন তৈরী হত, কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয় কিন্তু সে যুগে পিঠে খেলেও পেটে সইত। তখন অবশ্য বাঙ্গালীরা ছিল ভোজনরসিক, ভোজন-বিলাসী, রেসনের যুগে চেনির অভাবে গমভঙ্গা কলে চাল গুঁড়িয়ে লোকে যৎসামান্য পিঠে তৈরী ক'রে প্রথাটা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন কিন্তু একদিকে রেসনে বরাদ্দের কমতি আর নারকেলের এবং নলেন গুড়ের অগ্নিমূল্য বাঙ্গালীর জীবনে যেমন, তেমনি প্রাচীন বঙ্গ সংস্কৃতির এক অনাদৃত দিক এই পিষ্টক শিল্পেরও নাভিশ্বাস উঠেছে। কেউ কেউ চালের গুঁড়োর বদলে ময়দা, নারকেলের সন্দেশের বদলে দোকানে কেনা সন্দেশের পুর দিয়ে পিঠের ক্ষীয়মান ঐতিহ্যকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাই পিঠেসরা এখনও কিছু কিছু বিক্রী হচ্ছে। এখন যেমন "প্রবাসী পুরুষ কত পোষড়ার রবে, ছুটি নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী আসে সবে,, এর দিন ফুরিয়েছে তেমনি- "কর্তাদের গাল গল্প গুড়ুক টানিয়া, কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়িএলাইয়া,, দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া বসে, চিটে গুড় ছিটেদিয়ে পিঠে খান কোসে,, এদৃশ্যও অন্তর্হিত হয়েছে, এখন আর নূতন নলেন গুড়ের গন্ধে বাতাস 'ম-ম' করেনা বা পিঠে খাবার জন্য নিমন্ত্রণও কেউ করে না।

পৌর সভায় নব নব অবদান

এবার পৌর সভাপতি যদুগোপাল সেনের আমলের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা যাক কারণ, সে সব কথা আজকে সকলের স্মরণে থাকলেও এক যুগ পরে হয়তো বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যাবে।

২৭।৬৭ তারিখে শ্রীযদু গোপাল সেন পৌরসভাপতিরূপে কার্যারম্ভ করেন। ২৮।৯।৬৮ তারিখে যে পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

হাতে সংযুক্ত নাগরিক ফ্রণ্টের জয় উপলক্ষে ৩রা জুন ১৯৬৭ তারিখে বিজয় মিছিল ও পোড়ামাঠে সভা সমাবেশে নাগরিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৭ সালের বিধান সভা নির্বাচনেও যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, এবারকার পৌর নির্বাচনের বিশেষত্ব হল—একটি সর্বদলীয় পৌর উপদেষ্টা কমিটি গঠন। নাম দেওয়া হয় – সংযুক্ত প্রগতিশীল নাগরিক ফ্রন্ট।

(১) শ্রীযুক্ত সেন পূর্ববর্তী পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৬ সন পর্যন্ত পৌর সদস্য হিসাবে কার্য করেন।

(২) ১৯৬৭ সালের মে মাসে হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্টে অনুষ্ঠিত রাসায়নিক শিল্প শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি এ, আই, টি, ইউ, সি-র প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, লড়াই-য়ের ময়দানে শ্রমিকদের পাশে তাঁর দীর্ঘদিন কেটেছে এবং বহু ধর্মঘটের সফল অধিনায়ক হিসাবে দীর্ঘতম সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন এবং বারংবার কারাবাসও করেছেন- এ পরিচয় তাঁর সর্বজন বিদিত।

(৩) শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি ২৫।১১।৬৭ তারিখ থেকে কয়েক মাসের ছুটি নিতে বাধ্য হন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক অস্থায়ী পৌর সভাপতি হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঘটক কয়েকটি উন্নতিমূলক কার্যরূপায়নে যত্নবান হন তার মধ্যে স্বর্গীয় সাধন চন্দ্র পাকড়াশী প্রদত্ত (পাকড়াশী চিলড্রেন পার্ক স্থাপন উদ্দেশ্যে) ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী পুষ্করিণীটির ভরাট করা অন্যতম।

(৪) ইতিপূর্বে রেললাইনের পশ্চিম পার্শ্ববর্তী যে সুদীর্ঘ এলাকা পৌর এলাকা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল তার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে আরও কিছু সংশ্লিষ্ট এলাকা ২৮।৬।৬৮ তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় যার ফলে পৌর আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে দেড় বর্গমাইলের পরিবর্তে প্রায় দুই বর্গমাইলে পরিণত হয়। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই কলেবর বৃদ্ধির ফলে পৌর

সভার দায়দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং পৌরশাসনের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের দাবিতে অবশ্যম্ভাবী ব্যয়বাহুল্য ঘটতে থাকে।

(৫) ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে যে অভূতপূর্ব ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তার ফলে বহু নরনারী প্রাণ হারান এবং প্রায় এক লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। এই আকস্মিক বন্যা বিক্ষুব্ধ অগণিত আর্তের সেবার জন্য পৌরসভা ১৮।১০।৬৮ তারিখের সভায় সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে ২০০১ টাকা সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং 'পৌরসভা উত্তরবঙ্গ ত্রাণ তহবিল' গঠন ক'রে জনসাধারণ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য বস্ত্রাদি সাহায্য হিসাবে সংগ্রহ ক'রে উত্তর বঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

রিষড়া টাউন কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকেও ২০।১০।৬৮ রবিবার কংগ্রেস কর্মীগণ দ্বারে দ্বারে ঘুরে বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে বস্ত্র, চাউল ও অর্থ সংগ্রহ করেন।

প্রদেশপালের অস্থায়ী শাসন কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এই নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে পৌর সদস্য শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘটক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেন। "দল অপেক্ষা দেশ বড" এই আদর্শগত নীতি অবলম্বন করে তিনি কংগ্রেস বা বাংলা কংগ্রেসের অনুমোদিত প্রার্থী হিসবে নির্বাচিত হবার পথ থেকে সরে আসেন। ৬।১২।৬৮ তারিখের সাপ্তাহিক পল্লীডাকে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং জনকল্যাণমূলক কাজের তালিকা প্রকাশিত হয়। 'পল্লীডাক' লেখেন যে দলাদলিতে দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে কাজেই এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের কর্তব্য ভাবাবেগ বর্জিত হয়ে প্রকৃত জনকল্যাণব্রতী মানুষদের জয়যুক্ত ক'রে তোলা।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে হুগলী জেলায় মোট ১৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭টি আসনের অধিকারী হয়েছিলেন এবং ডাঃ গোপাল

দাস নাগ এম, এল, এ নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি পেয়েছিলেন ১০টি আসন আর এম, এল, এ নির্বাচিত হয়েছিলেন সি, পি, আই নেতা শ্রীপাঁচু গোপাল ভাদুড়ী।

(৬) নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগীয় মন্ত্রী নির্বাচিত হন শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী মহাশয়। তাঁর বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে বঙ্গীয় পৌর-শাসন আইনের কয়েকটি ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। শতাধিক বর্ষব্যাপী পৌর আইনে কল কারখানার যন্ত্রপাতি বা আসবাবপত্রের উপর কোনও মূল্যায়ন করার বিধি লিপিবদ্ধ ছিল না- "The value of any machinery or furniture...... shall not be taken into consideration in estimating the annual value of such holding under this section."

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ও বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিবর্গ মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে তিন লক্ষ টাকার মূল্যের শিল্প সম্পদের উপর বর্দ্ধিত কর চালু করা সম্পর্কীয় সংশোধিত আইন রহিত করার জন্যে অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে বিভিন্ন পৌরসভার আয় বাড়ানোর জন্যেই রাজ্য সরকার ঐ সমস্ত সংশোধন বিধিবদ্ধ করেছেন, এতে কংগ্রেস সহ সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতি ছিল। কাজেই উক্ত বিধান বদল করা হবে না।

(আনন্দবাজার—৩১/৮/৬৯)

বলাবাহুল্য, রিষড়ার ন্যায় কল-কারখানা-বহুল পৌরসভার আয় উক্ত সংশোধিত আইনের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে বর্দ্ধিত হয়। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত কর দাতাদিগের মোট সম্পত্তির কর-ধার্যোপযোগী মূল্যায়ন ৬৲ ছয় টাকা ছিল তার উপরও কোনও ট্যাক্স এতাবৎ ছিল না; এই সংশোধিত পৌর আইনে ছয় টাকার স্থলে ঐ মূল্যায়ন পঞ্চাশ টাকা ধার্য হয়। (১২৪ (৩) ধারার সংশোধন।)

(৭) উপরোক্ত সংশোধিত পৌর আইন ছাড়াও পৌরসভার আয় বৃদ্ধির আরও দুটি সুযোগ এসে গেল এই সময়। প্রথমটি হল— সি, এম, ডি-এ কর্তৃক রাস্তার সংস্কার সাধন ও উন্নতি কল্পে অর্থ সাহায্য এবং দ্বিতীয়টি হল— চুঙ্গী করের (Entry Tax) কিছু অংশ পৌর সংস্থাগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে। ১৯৭০-৭১ সালে এই করের অংশ হিসাবে রিষড়া পৌরসভা পেয়েছিলেন আটষট্টি হাজারের কিছু বেশী।

সি, এম, ডি-এর সৃষ্টি হয় ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং পৌর সদস্য শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক এই সংস্থার (কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভালপমেণ্ট অথরিটি) সভ্য নির্বাচিত হন। ৬।১০।৭১ তারিখে বুধবার রিষড়ায় প্রেসিডেন্সি মিলের সম্মুখে জি, টি, রোডের পূর্ব পার্শ্বে উক্ত সংস্থার আঞ্চলিক অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন সি, এম, ডি-এর চেয়ারম্যান ও রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবিনয় ভূষণ ঘোষ। তিনি হুগলী জেলা কর্তৃপক্ষ এবং পৌরসভার সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(আঃ বাঃ ৮।৯।৭০, যুগান্তর ৭।১০।৭১ এবং বসুমতী ৮।১০।৭১)

(৮) ১৯৬৯ সালের জুন মাসে শ্রীযুক্ত সেন পশ্চিমবঙ্গ পৌর সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং কলকাতা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এণ্ড স্যানিটেসন অথরিটির সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন সংশোধন পরামর্শ দাতা কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করেন, তাঁর আমলে রাতারাতি কয়েকটা ছোটখাট মন্দির গজিয়ে ওঠে রাস্তার ধারে কাছে, তিনি চেষ্টা করেও তা সরাতে পারেন নি, আজও তারা বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে।

আবার কারফু/১৪৪ ধারা

২৯শে মার্চ্চ ১৯৬৯ মহরম উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে গান্ধী সড়কে

যে অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল তার ফলে রিষড়া পৌরাঞ্চলের অধিকাংশে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফু এবং ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। জেলাশাসক পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পৌরপ্রধান ও পৌর সদস্যবৃন্দের প্রচেষ্টায় উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরিয়ে আনেন। (বসুমতী- ৩১'৩ ৬৯) মহরম উৎসব আজও হয় কিন্তু সেদিন যে তাজিয়া বের করা বন্ধ হয়েছিল তার আর পুনরাবির্ভাব ঘটেনি আজও বা জি, টি, রোডে যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়না (পৃঃ ৪৮৭) বাজনা বাদ্যি সহকারে শোভাযাত্রার দৃশ্যও আর চোখে পড়েনা।

চাঁদের পিঠে মানুষের পদচিহ্ন

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৯ সালের ২১জুলাই সাফল্যের সঙ্গে চাঁদে মানুষ নামিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। দীর্ঘ আটবছর ব্যাপী সাধনার ফলে বিজ্ঞানীদের এ এক বিস্ময়কর সার্থক প্রয়াস। সারা বিশ্বে এই কৃতিত্বকে কেন্দ্র ক'রে বিপুল আনন্দ উৎসবের ঢেউ পড়ে যায়,। প্রথম মহাকাশচারীর গৌরব অর্জন করেন অবশ্য রুশ মহাকাশচারী য়ুরি গাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি মহাকাশ প্রদক্ষিণ করেন ১০৮ মিনিট ধরে। দিল্লীর ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামে তাঁকে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিল। পূর্বোক্ত অভিযানে যে তিনজন মার্কিন নভোচারী অংশ গ্রহণ করেন (অ্যাপোলো ১১) নীল আর্মষ্ট্রং, এডউইন এলড্রেন এবং মাইকেল কলিনসকে ২৬:শও ২৭শে অক্টোবর বোম্বাইয়ে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় এবং বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরনিকা হিসাবে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল

ভারতও বাদ যায়নি (আঃ রিপোর্টার) ২৪শে জুলাই মার্কিন নভোচারী বৃন্দের নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে রিষড়া পৌরসভার কর্মীবৃন্দ ২৫শে জুলাই ১৯৬৯ তারিখে আনন্দ প্রকাশ উপলক্ষে ছুটি উপভোগ করেন। এই চাঁদকে ঘিরে কতনা পৌরাণিক কাহিনী কত রূপকথা কত ছড়া, গানও কবিতা ছড়িয়ে আছে সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যে তার ইয়ত্তা নেই। চাঁদের মা-বুড়ি গাছ তলায় বসে সুতো কাটছেন এগল্প শোনেনি বা শৈশবে চাঁদামামা কপালে টিপ দিয়ে যায় নি এমন মানুষ বাঙালা দেশে কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। এই চাঁদকে নিয়েই আমাদের কত পার্বণ, কত নামের বাহার কত উপমা কিন্তু হায় চন্দ্রাভিযানকারীরা সেই বুড়ি মাকে দেখতে পাননি বা 'শশাঙ্ক' নামের সার্থকতাও খুঁজে পাননি, তাঁরা দেখেছেন চাঁদের দেশে জল নেই, প্রাণ নেই আছে শুধু বালি আর পাথর, তাই তারা কুড়িয়ে এনেছেন চাড্ডি পৃথিবীর মানুষকে দেখাবেন বলে।

লেনিন ক্রীড়া প্রাঙ্গনের উদ্বোধন

পৌর প্রধান শ্রীযদুগোপাল সেন ১৯৬৭ সালে কার্যভার গ্রহণ করার পরই ১৯৬০ সাল থেকে রযভায় একটি পূর্ণাঙ্গ খেলার মাঠ স্থাপনের যে প্রচেষ্টা চলছিল তার পরিপূর্ণতা সম্পাদন করার গৌরব অর্জন। করেন, পৌর তহবিল থেকে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রায় সাড়ে সাত বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে নাবালক পর্যন্ত প্রায় ৩২ জন মালিককে একত্রিত করে দ্রুত রেজিষ্ট্রেসন কার্য সমাপ্ত হয়। এই দ্রুত কার্য সম্পন্ন করার পিছনে ছিল কয়েকজন স্থানীয় যুবক ও কিশোরদের অদম্য উৎসাহ ও অভিব্যক্তি। ২রা মে ১৯৭০ এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়, এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসোম নাথ লাহিড়ী কর্তৃক মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ অনুদান হিসাবে এক

লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার কথা ৫০৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে। বলাবাহুল্য (১৮৭০-১৯৭০) মহান বিপ্লবী লেনিনের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে এই ক্রীড়াভূমি তাঁর নামাঙ্কিত করা হয়। (উদ্বোধনের আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য) লেনিন ময়দান স্থাপিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন ফুটবল খেলার পরিপূর্ণ সুযোগ এসে যায় অপর দিকে তেমনি ক্রীকেট ও হকি টুর্ণামেন্টেরও ধুম পড়ে যায়। ৮।১০।৭৩ তারিখের যুগান্তরে রিষড়া হকি টুর্ণামেন্ট কমিটি পরিচালিত লেনিন টফির খেলার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়।

রিষড়া নববর্ষ উৎসবের রজত জয়ন্তী

নিখিলবঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতির অনুমোদিত রিষড়া নববর্ষ উৎসব সমিতির ২৫ বছর পূর্ণ হয় জন্ম লগ্ন ১৩৫২ সাল থেকে ১৩৭৭ সালের শুভ ১লা বৈশাখ.। (ইং ১৯৭০) বিলীয়মান পুরাতন বৎসরের দুঃখ-দৈন্যকে বিদায় দিয়ে নববর্ষের আশা ও আলোর দ্যোতনা নিয়ে এই 'পহেলা বৈশাখ' জাতির জীবনে সুখ শান্তি ও প্রীতিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলুক এই কামনাই নিবেদিত হয় নববর্ষের রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতে বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রভাত ফেরি, বিগতাত্মা দেশ-প্রেমিকদের স্মরণে বাণী পাঠ, বিচিত্রানুষ্ঠান, সমষ্টি ব্যায়াম প্রভৃতি তার মধ্যে অন্যতম।

"বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রহ,
ক্ষমা কর আজিকার মত
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত"

বাঙলা ও বাঙালার জীবনে এই শুভ দিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পূজা

পাঠ, মিষ্টান্ন বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে, তার পরিচয় ২০৩ পৃঃ উল্লেখিত হয়েছে।

মহাত্মাগান্ধী জন্মশত বার্ষিকী উৎসব।

যদিও ১৯৬৯ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধী-মহাজীবনের শতবর্ষ পূর্তি কিন্তু মহাত্মাজীর জীবন সঙ্গিনী, বিশ্বময়ী কস্তুরবা ছিলেন প্রায় তাঁর সমবয়সী। তাঁর জন্মদিন খুঁজে বার করা যায়নি, তাই ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁর লোকান্তর গমনের দিনটিকে গান্ধী- শতবর্ষের সঙ্গে একই সূত্রে বেঁধে দিয়ে শতবার্ষিকীর কার্যক্রমকে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। তাই ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (রিষড়া) উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র মহোদয়। সভাপতিত্ব করেন বাণীপুর জনতা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র হোড় রায় মহাশয়। সুদৃশ্য, সুশোভিত মঞ্চের সৌষ্ঠব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাতির জনক মহাত্মাজীর জীবনের অমর অবদান সম্বন্ধে মনোজ্ঞ অভিভাষণে বিচারপতি মিত্র সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক স্বাগত ভাষণে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাপুজীর কর্মময় জীবনের অমূল্য অবদান স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে গান্ধীজিই প্রথম জননায়ক যিনি ভারতের অহিংসা ও প্রেমধর্মকে মুষ্টিমেয় সাধক শ্রেণীর বাইরে এনে কোটি কোটি নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে রূপদান করেন। সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তারই

বৈপ্লবিক রূপ। এই জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতসরকার কর্তৃক গান্ধীজীর প্রতিকৃতি সম্বলিত ১০ টাকার মুদ্রা ও ৫০ পয়সা ও কুড়ি পয়সার মুদ্রা প্রচারিত হয়।

নকসাল আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া।

১৯৭০ সালে কলকাতার বুকে যখন চলছে নিত্য রাজনৈতিক খুনো-খুনি, গুপ্তহত্যা দেশবরেণ্য নেতাদের মর্মর ও ব্রোঞ্জ মূর্তির বিলোপ বা বিকৃতি সাধন তখন রিষড়াতেও ছাত্রসমাজের একাংশের মধ্যে একটা অশান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। অভিনব দেওয়াল লিখন, বিচিত্র শ্লোগান প্রভৃতি হল তার বহিঃপ্রকাশ। রিষড়া উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গীয় নরেন্দ্র কুমারের আবক্ষ মূর্তির বিনষ্টি সাধনের কথা ইতিপূর্বে ৬০৫ পৃঃ উল্লিখিত হয়েছে। ৩০।১১।৭০ তারিখের আনন্দবাজারে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি মারফৎ উচ্চবিদ্যালয়ের সম্পাদক (প্রধান শিক্ষক) শ্রীশ্রীশ কিশোর গোস্বামী জানান যে-বর্তমান প্রতিকূল অবস্থায় স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রহিল। টেষ্ট পরীক্ষা ৮ই ডিসেম্বর হইতে যথারীতি চলিবে" বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলেও কোন্নগরের পশ্চিমে নবগ্রামে ন'টা খুনের খবরে লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

বলাবাহুল্য এই আন্দোলনের জের চলে বেশ কিছুদিন ধরে। চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি, ছিনতাইএর সুরু এইখান থেকেই যার জের-আজও চলেছে। ১৯৭১ সালে রিষড়ার দেওয়ানজী ষ্ট্রীটে যে দুটো খুন হয়ে গেল একমাসের আড়াআড়ি তার ফলে একটা বিভীষিকাময় ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল মানুষের মনে। প্রথমটা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল অন্নপূর্ণা পূজার পূর্বদিন রাত্রি আঃ ৭॥ টার সময়

দেওয়ানী ষ্ট্রিট ও শ্রীমানি লেনের সংযোগস্থলে। ১৩।৪।৭১ তারিখে আনন্দ বাজার উক্ত সংবাদ সম্বন্ধে লেখেন -"শুক্রবার রাত্রে রিষড়ার দেওয়ানজী ষ্ট্রিটে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে শ্রীরামপুর থানার একজন হেড কনস্টেবল শ্রীবিষ্ণু দে (৫০) নিহত হয়" এইদিনই বেলা ১ টায় সময় নব কোয়ালিশন সরকার শপথ গ্রহণ করেন। ঠিক একমাস পরে পুনরায় ২১।৫।৭১ তারিখে আনন্দবাজার লেখেনঃ—"রিষড়ার হেষ্টিংস জুট মিলের মেশিন সপের ইনচারজ শ্রীদেবেন্দ্র জীবন সাহা (৪০) বৃহস্পতিবার (সকালে) ডিউটিতে যাওয়ার সময় দেওয়ানজী ষ্ট্রিটে আততায়ীর পাইপ গানের গুলিতে নিহত হন। এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার এবং আরও 'দু' জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।" বলাবাহুল্য, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পি, ডি, এ্যাক্টে অনেককেই গ্রেফতার করা হয়।

এই খানেই এর শেষ নয়, আরও আছে। এর আগেই ২৭।৪।৭১ আনন্দবাজার পত্রিকা মারফৎ নিম্নলিখিত সংবাদটি ছড়িয়ে পড়েঃ— 'নকসাল অভিহিত শ্রীকানাই পাল (২২) শুক্রবার রাত্রে রিষড়া রেল ষ্টেশনের কাছে কয়েকজন আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত হন। হাসপাতালে ভরতির পর তিনি মারা যান। পুলিশের খবর, তিনি শেওড়াফুলির বাসিন্দা ছিলেন। এ সম্পর্কে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঐ কাগজেই ২।১০।৭১ তারিখে খবর বের হয়ঃ— "পুজো প্যানডেল থেকে বৈদ্যুতিক তার চুরি করেছে সন্দেহে রিষড়ার একটি সর্বজনীন পূজা কমিটির কয়েকজন সদস্য লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল কোয়ারটার থেকে শ্রীকানাই দাস নামে একজনকে বুধবার রাত্রে টেনে এনে মারধোর করে বলে পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু ঘটে। এসম্পর্কে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে"। এরপরও রিষড়ায় ঘটে চলেছে একাধিক খুন, ছিনতাই, লুঠতরাজ, ডাকাতি কিন্তু খুনের খতিয়ান বাড়িয়ে লাভ নেই, উপরোক্ত ঘটনাগুলো থেকেই বোঝা

যাবে যে সে সময় আইন-শৃঙ্খলা কিভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল। আতঙ্কে লোকে দিশেহারা। অনেকের আশঙ্কা হয়েছিল যে রাজ্য জুড়ে যখন খুনোখুনি আর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে তখন হয়তো এবার মহা-পূজায় তেমন আনন্দ কোলাহল বা আলোর রোশনাই হবেনা। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছিল। দৃকসিদ্ধান্ত ও অন্যান্য পঞ্জিকায় ষষ্ঠী সপ্তমীর গরমিল থাকলেও দু'মতেই রিষড়ায় শারদীয়া পূজা যথারীতি সম্পন্ন হয়। পূর্ব বৎসরে পূজার পর ১২/১০/৭০ তারিখে বৃহস্পতিবার রাত ৩টা থেকে শুক্রবার বেলা দুটো—এগারো ঘণ্টা ধরে একটানা বৃষ্টি আর ঘণ্টায় ৬৬ মাইল বেগে ঝড়ের তাণ্ডবে শহর ও শহরতলির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪২ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে এরকম ঘূর্ণিঝড় আর হয়নি।

(আঃ বাঃ ১৪/১০/৭০)

অবিরাম বর্ষণে দুর্গতি।

উক্ত ঘটনার একমাস আগে অর্থাৎ ১।৯।৭০ (১৫ই ভাদ্র ১৩৭৭) মঙ্গলবার থেকে প্রায় ৭১ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণে রিষড়ার অধিবাসীরা বিশেষ ক'রে নবগঠিত কলোনী এলাকার পরিবারবর্গ যে দুর্গতির সম্মুখীন হন সে সম্বন্ধে ৭।৯।৭০ আনন্দবাজারে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়:— 'রিষড়া-কোন্নগরে এখনও হাঁটুজল।'

আর পাঁচটা অঞ্চলের মত হুগলী জেলার রিষড়া-কোন্নগর এলাকা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শনিবার রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত সমানে চারটে পাম্প চলছে তবু অনেক জায়গায় এখনও বেশ জল। বহু লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে স্কুলে, কলেজে কোথাও স্থান না পেয়ে রিষড়ায় বাঙুর পার্ক অঞ্চলের পূর্বদিকে বহু একতলা বাড়ির বাসিন্দাকে নৌকায়

করে শুক্রবারেই প্রতিবেশীদের দোতলা, ৩ তলা বাড়িতে [illegible] পাওয়া হয়েছিল, রবিবার রাত্রে অনেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান।

প্রবল বর্ষণে বাজারে জিনিষপত্রের দাম চড়ে যাওয়া দূরের কথা, পাওয়াই যায় নি, একখানা পাঁউরুটি কিংবা এক লিটার কেরোসিনের জন্য এক কোমর জল ভাঙতে হয়েছে। সুভাষ কলোনী একনম্বর এবং তিন নম্বর কলোনী মিলিয়ে অন্তত সত্তরটি পরিবার বিপন্ন হয়েছেন। তাঁদের অনেককে ব্রহ্মানন্দ স্কুলে, পৌরসভার স্কুলে আশ্রয় দেওয়া হয়। শনিবার দুপুর পর্যন্ত রেল লাইনের দুই পারে হাঁটুজল। পৌরপ্রধান শ্রীযদুগোপাল সেন দলবল নিয়ে তিনটি পাম্প চালু করেন, তার সঙ্গে চলে এ, সি, সি, আই এর একটি ট্রেলার পাম্প, রবিবার বিকাল থেকে বিপর্যস্ত জনজীবনে কিছুটা আশার সঞ্চার করে।"

এই বর্ষণের ফলেই ৩নং রেলওয়ে ফট.কের সন্নিহিত বটগাছটি পড়ে যায় যার ফলে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে একজন বিদ্যুতাহত হয়ে প্রাণ হারায় এবং একজন রিক্সাচালকও মৃত্যু বরণ করে। উক্ত পরিস্থিতির কয়েকদিন পরে ভবিষ্যৎ বিপদ নিবারণ কল্পে চারবাতির মোড়ে শ্রীমান্নালাল গাঙ্গুলির বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বের দুটি গাছও পৌরসভা কর্তৃক কাটিয়ে ফেলা হয়, যার ফলে উপরোক্ত জায়গা দুটো একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়।

১৯৭১ সালের লোকগণনা।

১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী রিষড়া পৌর এলাকার লোক সংখ্যা ছিল যেখানে ৩৮,৫৮০ অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ হাজার, ১৯৭১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩,৫৮২, প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার। পথিকের সংখ্যা বাড়লেও পথের সংখ্যা বাড়েনি কাজেই পথে পথে

ভীড় বাড়তেই থাকে। সেই অনুপাতে রিক্সা ও সাইকেলের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। ঘন ঘন লোডশেডিং এর ফলে বৈদ্যুতিক আলোকহীন রাস্তায় বাতিহীন সাইকেল রিক্সা ও সাইকেলের অবিরাম গতির ফলে পথিকদের পক্ষে নির্বিঘ্নে চলা ফেরা করা দুর্ঘট হয়ে পড়ে। ১৯৬১ সালের মত ১৯৭১ সালে লোকগণনা কার্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে মহকুমা শাসক শ্রীনলিনী কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ২৬।১১।৭১ তারিখে পুরস্কার বিতরণ সভায় যে সাত জনকে রৌপ্য পদক প্রদান করেন তার মধ্যে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত রৌপ্য পদক লাভ করেন পৌর কর্মচারী শ্রীমন্মথ নাথ আশ। উক্ত আদম সুমারি অনুযায়ী পশ্চিম-বঙ্গে বসবাসকারী বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ এবং ভারতে বাঙ্গালীরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাসম্বন্ধীয় গোষ্ঠী বলে নির্দ্ধারিত হয়।

পাক্ষিক সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমা শাসক যে দুটি দীর্ঘ নূতন রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আশ্বাস দেন সে দুটি হল (১) রিষড়া ৪নং গেট থেকে দিল্লী রোড পর্যন্ত এবং (২) কোন্নগর নৈটি থেকে দিল্লী রোড পর্যন্ত। এই পাকা রাস্তা দুটি তৈরী হলে জি, টি, রোডের উপর যান বাহনের চাপ অনেক কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

আকাশ পথে প্রধান মন্ত্রী

২।২।৭১ মঙ্গলবার প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে হেলিকোপ্টার ক'রে শ্রীরামপুর জাননগর ময়দানে বিকাল চারটায় অবতরণ করেন। এই ময়দানেই একদিন তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় জহরলাল নেহরু জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমতী গান্ধীকে আকাশপথে আসতে দেখে দর্শনাকুল বিপুল জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে, হাত নেড়ে তাঁরা প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে

থাকেন। শ্লোগান ওঠে—'ইন্দিরা গান্ধী আয়ী হ্যায়, নয়ী রোশনি আয়ী হ্যায়'। একটি লোকাল ট্রেনও সেই সময় থেমে যায়। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, পশ্চিমবাংলায় আজ যে বিধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে তা উন্নতির সহায়ক নয়। অনেকে বাইরের মতবাদের কথা বলছেন। কিন্তু সে পথও পরিহার করতে হবে। আমরা ভারতীয়, ভারতের রাস্তাতেই চলতে চাই। সে পথেই সুখী ভারত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর হাত শক্তিশালী করার জন্যে জনতার কাছে আবেদন করেন। সভার শেষে বাংলা দেশের জননায়ক মুজিবর রহমানের নাম জড়িয়ে শ্লোগান উঠে, সর্বত্র সেই আওয়াজ — ইন্দিরা মুজিবর জিন্দাবাদ। এশিয়ার মুক্তি সূর্য ইন্দিরা গান্ধী গৈরিক সেলাম।

চোদ্দ দিনের লড়াই

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ১৪ দিন পরেই তার অবসান ঘটে। খান সাহেব ভারতের প্রধান মন্ত্রীর একতরফা যুদ্ধ বিরতি মেনে নিতে বাধ্য হন। মার্শাল ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলায় যে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন তার ফলে প্রায় এক কোটি শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। তাদের আশ্রয় দেওয়া এবং ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ভারতের পক্ষে একটা দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই উদ্বাস্তুদের চাপ পশ্চিমবাংলার বুকেই বেশী আঘাত হানে। নয় মাস যাবৎ শরনার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের জন্যে ভারত সরকারের যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় তার আংশিক পূরণের জন্যে পাঁচ পয়সার রিলিফ ষ্ট্যাম্প এবং রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প ১০ পয়সার স্থলে ২০ পয়সা ধার্য করতে বাধ্য হন। (যুগান্তর—২০।১২।৭১)

সৌভাগ্যের কথা ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ড দুটি

ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যে স্বতন্ত্র দেশরূপে আত্ম প্রকাশ করেছিল তার অন্যতম পূর্বপাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বাধীন বাংলা দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করে। ২৫ বছর পরে সে তার মিতালীর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ঘরেও ফিরিয়ে নিচ্ছে তার চলে আসা লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে।

ভোট ভাবনা দিকে দিকে।

আবার এসে গেল মধ্যবর্ত্তী বিধান সভা ও লোকসভার নির্বাচন। পৌর প্রধান শ্রীযদুগোপাল সেন সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মনোনীত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে শ্রীরামপুর লোক-সভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে ছিলেন শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১০।৩।৭১ তারিখে।

এবারকার ভোট নিয়ে উৎসাহের চেয়ে আশঙ্কাই ছিল বেশি, ভোট দেব কি দেবনা— এ দ্বিধা অনেকেরই ছিল। গত দুটো নির্বাচনে খাদ্য, শিল্প, বেকার এবং সরকারের স্থায়িত্বের সমস্যা যতটা আলোচনার বিষয় হয়েছিল এবার মূল প্রশ্ন ছিল আইন-শৃঙ্খলা কে ফিরিয়ে দিতে পারে! একটা আস্থা ফিরে পাওয়াই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে আলোচনায় রিষড়ার তারক চ্যাটার্জি বলেন, ভোটারদের বলা হোক ভোট দেওয়ার সময় রেশন কার্ড দেখাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে যুক্তি খণ্ডন করেন

সুকুমার বা.নি.া.তি। তাতে কি হবে (ব. . . . কার্ড ত আছে, আরও কি. . . রেশন কারড তৈ. . . . . . এই ভাবের বিভিন্ন মতামত দিকে দিকে প্রকাশিত হতে থাকে। (আঃ বাঃ ১।৩।৭১ সোমবার) উক্ত নির্বাচনে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় তার শ্রমদফতের মন্ত্রী নির্বাচিত হন ডাঃ গোপাল দাস নাগ। (কলকাতা গেজেট— ১৯৭১)

জয় বাংলা রোগ।

উক্ত নির্বাচনের জের কাটতে না কাটতেই জুন মাসে দেখা দেয় সংক্রামক চক্ষু রোগ-লোকে নাম দিল 'জয় বাংলা'। সকলের মুখেত একথা—"চোখ গেল, চোখ গেল, কেন ডাকিস রে . . . কিন্তু কেন? সর্বনাশা ভয়াবহ ভাইরাস চোখের মহামারী সুদূর মক্কা থেকে আমদানি হলো, সবাকার লাল ফুলো ফুলো চোখ কাল চশমায় ঢাকা, এত কালো চশমাই বা পাওয়া যায় কোথা থেকে? কালোবাজারি ও কৃত্রিমতা আরম্ভ হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৭০ সালের একটা দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে বিষয়ান্তরের আলোচনায় আসা-যাক। গান্ধীসড়কের বিদ্যালয়ে আকস্মিক বিস্ফোরণে ৫টি ছেলেমেয়ে আহত হয়। তিনজন ছেলে ও দুটি মেয়ে মাঠে খেলা করছিল, বল ভেবে একটি গোলাকার জিনিষ তুলতেই ওটা ফেটে যায় এবং বালক বালিকা আহত হয় উক্ত বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৭ই নভেম্বর ১৯৭০। বলাবাহুল্য, শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে চিকিৎসার ফলে অধিক-তর আহত ছাত্রীটী দ্রুত আরোগ্যলাভ করে। (আঃ বাঃ ১৮।১১।৭০)

১৯শে জুলাই ১৯৬৮ তারিখের বসুমতী

পত্রিকায় নিম্নলিখিত মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়:— "হুগলী, ১৭ই জুলাই: — সড়া পঞ্চাননতলার আট বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এই অঞ্চলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগে প্রকাশ যে, দুষ্টুমীর জন্য চাদুনাম্নী বালিকাটিকে তাঁর মা নাকি একটা শিকদিয়ে আঘাত করে। প্রথমতঃ এই আঘাত আদৌ গুরুতর বলে মনে হয়নি পরে রাত্রে বালিকাটি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে এবং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মা এখন পুলিশী হেফাজতে, মৃতদেহ মর্গে পাঠান হইয়াছে। (শ্রীমণীন্দ্র আশের সৌজন্যে)

দূর পাল্লার সাইকেল ভ্রমণ।

(দ্বিতীয় স্তবক)

এই গ্রন্থের ৪৯৫/৯৬ পৃষ্ঠায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাইকেল ভ্রমণের তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। তার পর স্বাধীনোত্তর যুগে রাস্তা ঘাটের হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, উন্নতি সাধন এবং সরলীকরণ। নদ-নদীর উপর হয়েছে সেতু নির্মাণ; যার ফলে সাইকেল ভ্রমণের সুখ সুবিধা গিয়েছে বেড়ে। কাঁচা রাস্তার দুর্ভোগ হয়েছে অন্তর্হিত।

তারিখ	গন্তব্যস্থান	অংশ গ্রহণকারী
১৯৫১/১৯৫৪	নবদ্বীপ ও গঙ্গাসাগর।	সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী ও বিজয় ভূষণ হড়।
১৯।১২।৬৪	কচুবেড়িয়া থেকে কপিলমুনি আশ্রম পর্যন্ত ১৯ মাইল পাকা সড়কের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন। (বসুমতী-৬ই পৌষ ১৩৭১ ইং ২১।১২।৬৪)	
১৯৬০	দীঘা (ভায়া তমলুক)	সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবীর কুমার বাগচী (H. & G.-গোবরা, কলকাতা)
২৫।১১।৬৩	বেড়াচঁপা, চন্দ্রকেতুগড়।	সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণ-

গোপাল পাকড়াশী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও
আদিত্য পাঠক (S. I. Rishra Mupty)

১৯৬৪ দ্বারবাসিনী, মহানাদ (চন্দ্রকেতুর গড়) — সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী ও অলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬৪ কামার পুকুর, জয়রাম বাটী—সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত ভট্টাচার্য, শর্বরী দত্ত, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিনাকর বেহারা।

১৯৬৬ আঁটপুর, রাজবল হাট। (ভায়া শিয়াখালা) — সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মালেক (খড়দহ) ও প্রবোধ কুমার আদক।

২৮।১১।৬৬ বিষ্ণুপুর (ভায়া আরামবাগ) — সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২।২।৬৭ টাকী, হাসনাবাদ………সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মালেক ও দেবু মুখোপাধ্যায় (কোন্নগর)।

১৬।১১।৬৭ বোলপুর শান্তিনিকেতন— সর্বশ্রী অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য।

২৫।১২।৬৭ আঁটপুর, রাজবল হাট। (ভায়া হরিপাল) — সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী ও ললিত মোহন হড়।

৩।১১।৬৮ ও ২০।১২।৬৮ কামার পুকুর, জয়রাম বাটী ও মুর্শিদাবাদ — শ্রী অমর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬।১।১৯৭০ মুর্শিদাবাদ (ভায়া সাহাগঞ্জ কাটোয়া) — সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মালেক, প্রবোধ কুমার আদক, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি দাস ও রঞ্জিত দত্ত।

২০।১২।৭০ দীঘা — সর্বশ্রী অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও কুণাল চট্টোপাধ্যায় (নৈহাটী)।

১০।১।১৯৭১ দীঘা (ভায়া তমলুক) — সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়,

অলক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ দাস।

২১।১২।৭১	যশোহর, খুলনা। (ভায়া বনগ্রাম)	সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়। (মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, বোমার আঘাতের ক্ষতচিহ্ন তখনও মেলায় নি)।
১২ই জুন ১৯৭১ প্রত্যাবর্তন ৫।৮।৭১	কাশ্মীর	সর্বশ্রী দারা বাটলিওয়ালা ও প্রদীপ গাঙ্গুলী। (পৌর প্রধান শ্রী যদু গোপাল সেনের প্রদত্ত পরিচয় পত্র তাং ২১/৫/৭১)

উপরোক্ত ভ্রমণ সম্বন্ধে ১১।৬।৭১ তারিখের যুগান্তরে অংশগ্রহণ কারীদ্বয়ের আলোকচিত্রসহ সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের 'মিলন চক্র স্মরণিকায়' সুবেশ সাত্বক লেখেন:—'দারাবাটালওয়ালা বাংলার রামনাথ বিশ্বাসের ভাবশিষ্য, ১৯৭১ সালে ইনি সাইকেলে ১৭০০ মাইল অতিক্রম করে একমাসে কাশ্মীর ভ্রমণ করে......... আবার ফিরে এসেছেন। এনার সহযাত্রী ছিলেন শ্রীপ্রদীপ গাঙ্গুলী। ইনি আঠার বছর বয়স্ক একজন তরুণ ছাত্র। কিন্তু কি সুদূর উচ্চাকাঙখা, কি প্রশংসনীয় দুঃসাহস, কি দুর্দমনীয় প্রাণাবেগ! শুনে দুঃখ হয়, এমন অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেও ইনি কোন সমাদর পেলেন না, স্বাকৃতি পেলেন না। (ইত্যাদি)
২২।১।৭৩ (মুর্শিদাবাদ, ভায়া নবদ্বীপ, মায়াপুর প্রভৃতি) ....
সর্বশ্রী শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাত বন্দোপাধ্যায় দীঃ (তালিকা:— শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোঃ সৌজন্যে)

॥ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসান ॥

১। চিত্রপ্রদর্শকের লোকান্তর। উদয়ন (শেওড়াফুলি) সিনেমার একমাত্র স্বত্বাধিকারী চিত্রজগতের সর্বজনপ্রিয় দেব প্রসাদ দাঁ ২০শে মার্চ অপরাহ্নে হৃদরোগে তাঁর রিষড়াস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২। .... ১৯৪৬ সালে শেওড়াফুলিতে উদয়ণ

সিনেমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে "ভগিনী নিবেদিতার" পরিচালক ও প্রযোজকদের সঙ্গে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিনের জন্যে তিনি ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

(বসুমতী—৪/৪/৬৯)

২। বিশিষ্ট বীমা বিশষজ্ঞ বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান। হুগলী জেলার রিষড়া নিবাসী বিশিষ্ট বীমা বিশেষজ্ঞ কর্মযোগী শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সোনাবাবু) ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭০ শনিবার রাত্রে তাঁর ৮১তম জন্মদিবসে অমরধামে গমন করেছেন। ১৮৮৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতার দর্জ্জি পাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তাঁর পিতা ৺শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্ডন্যান্স বিভাগে ৩০ বছর চাকুরী পূর্ণ হওয়ায় স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করায় বিভূতিবাবু চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য হন। নরউচ্‌ ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে সাধারণ এজেন্ট হিসাবে কার্য করার পর নিজের প্রতিভা বলে 'গ্রেট ইষ্টার্ণ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী'র বাংলা শাখার ম্যানেজার হিসাবে দীর্ঘ বারো বৎসর সুনাম ও দক্ষতার সাথে কাজ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। তিনি রিষড়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে এলাকার শিক্ষা প্রসারের কাজে সহায়তা করেন। তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও হোমিওপ্যাথীতে এম, ডি, ডিগ্রী ছিল। তিনি স্ত্রী, ছয় পুত্র, তিন কন্যা, ও বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। (পল্লীডাক :—১৭ই পৌষ ১৩৭৬, ইং ২/১৭০) তাঁর সময়ানুবর্তিতাও ছিল একটি বিশেষ গুণ।

৩। সমাজ সেবীর স্মৃতি তর্পণ :—"শ্রীরামপুর, ২৪শে সেপ্টেম্বর—রিষড়ার বিশিষ্ট সমাজ সেবী চন্দ্রনাথ শিশুভারতী বিদ্যালয়, সুখদাময়ী নারী শিল্প মন্দির, চতুষ্পাঠী ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা সাধন চন্দ্র পাকড়াশীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রিষড়া নবীন চন্দ্র পাকড়াশী লেনস্থ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক সভা হয়। সভায় সভাপতি প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ

তাঁর ভাষণে বলেন যে সাধনবাবু সারা জীবন সত্যিকারের মানবধর্ম পালন করে গেছেন। নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ তাঁর ছিল না। তার মত কর্মযোগীর আজ দেশে একান্ত প্রয়োজন। সুখদাময়ী নারী শিল্পমন্দিরের পরামর্শদাতা শ্রী অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন... তাঁর আত্মজ কোন সন্তানাদি ছিল না কিন্তু সকলের সন্তান সন্ততিকে তিনি নিজের বলে মনে করতেন, তাই বিষয় সম্পত্তি তিনি পরার্থে দান করে শিশু ও দুঃস্থা নারীদের প্রকৃত উপকার করেছেন।" (বসুমতী—২রা ও ৯ই আশ্বিন ১৩৭৮) উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের অনেকেই অকৃতদার সাধন বাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ করেন।

৪। পরলোকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী—লক্ষ্মণ চন্দ্র সাধুখাঁ। "হুগলী জেলার রিষড়া নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষ্মণ চন্দ্র সাধুখাঁ গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১, শুক্রবার বেলা ২-৫০ মিনিটে কলিকাতাস্থ নার্সিং হোমে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে হৃদরোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ...... তিনি শ্রীরামপুর রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক এবং বেঙ্গল অয়েল মিলস অ্যাসোসিয়েশন ও মাষ্টার্ড অয়েল মিলস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর কার্যকরী সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। .... মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, চারপুত্র, পাঁচ কন্যা, চার ভ্রাতা ও বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল প্রয়াণে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রভূত ক্ষতি হইল।" (আনন্দবাজার-২।৯।৭১) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে তাঁর পিতা শ্রীবটকৃষ্ণ সাধুখাঁ (এতদঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী) ১৩৭০ সালের ৪ঠা পৌষ (ইং ২০।১২।৬৩) তারিখে পরলোক গমন করেন। হেষ্টিংস মিলের বড় ফটকের সম্মুখে সুবৃহৎ বিপনী বলতে 'বটুবাবুর দোকান' সর্বজন পরিচিত। (পৃঃ ৩৯৯)

গঙ্গায় আজব জীব।

হঠাৎ গুজব রটে গেল গঙ্গায় কী এক আজবজীব এসেছে—কারও হাত কেটে নিয়েছে, কারও পা কেটে নিয়েছে, কারও বুকের রক্ত শুষে নিয়েছে। কত লোকের মুখে কত রকমের বর্ণনা, কেউ বললেন, মাগুর

মাছের বড় সংস্করণ, মুখটা শুধু ছুঁচালো, আবার কেউ বললেন, দেখতে মাছের মত কিন্তু দুপাশে লম্বা লম্বা দাঁড়া— এমনি আরও কত কি।

নিত্য যাঁরা গঙ্গাস্নান করেন তাঁরা আতঙ্কে জলে নামতে ভয় পেতে লাগলেন, শিশু ও বালকরা গঙ্গার ধারে কাছেও ঘেঁসে না। কেউ কেউ পাড়ে বসে ঘটিতে করে মাথায় জল ঢেলে নিত্যকার মত স্নান কার্য ও পুণ্যসঞ্চয় করতে লাগলেন। আতঙ্ক হবারই কথা—প্রত্যক্ষ দর্শীরও অভাব হল না; একপাশে সেওড়াফুলি আর অপর পাশে উত্তরপাড়া, বরাহনগর, ব্যারাকপুর পর্যন্ত এই আজব জীবের দংশনে রহস্য জনক ভাবে পাঁচজন মারা গেছেন। মৃত ব্যক্তির দেহে সর্প দংশনের অনুরূপ লক্ষণ দেখা গেছে। একে আষাঢ় মাস, গঙ্গায় জল এমনিতেই ঘোলা তার উপর এই আতঙ্কজনক গুজবে অনেকেই গঙ্গাকে দূর থেকে শুধু প্রনাম জানিয়ে ক্ষান্ত রইলেন, জলে আর নামলেন না। কথায় বলে 'মনচাঙ্গা তো কুঠারীমে গঙ্গা'। সুখের বিষয় রিষড়ায় কেউ এই আজব জীবের দংশনে আহত বা মৃত্যুমুখে পতিত হননি। (যুগান্তর ১।৭।৭২, ১৭ই আষাঢ়—১৩৭৯)

স্বয়ং সম্পূর্ণতার পথে রিষড়া।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে রিষড়ার বহু অভাব পূরণের কথাই বর্ণিত হয়েছে, এখন অবশিষ্ট কয়েকটির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাক:—পোষ্ট অফিস, রেলষ্টেশন, স্কুল, কলেজ এমনকি খেলার পূর্ণাঙ্গ মাঠ সবই হয়েছে, এখানে ছিল না কোন পেট্রোল পাম্প বা প্রেস, যার জন্যে ছুটতে হত—হয় শ্রীরামপুর, না হয় মাহেশ। আনুমানিক ১৯২৮/৩০ সালে দাস এণ্ড ব্রাদার্সের উদ্যোগে হেষ্টিংস মিলের কাছে (বর্তমান বাটা সু কোম্পানীর বিপনী) একটি পেট্রোল পাম্প স্থাপিত হয়েছিল। তাঁরা বার্মা শেল কোম্পানীর এজেন্সি নিয়েছিলেন। দাস এণ্ড ব্রাদার্সের অপরাপর ভ্রাতারা হেষ্টিংস মিলে চাকুরী করায়, কনিষ্ঠ মোহিনী মোহন দাস উক্ত কারবার দেখা শোনা করতেন। পেট্রোল ছাড়াও অন্যান্য মোটর এ্যকসেসরিজ বিক্রী হত। শোনা যায়, রিষড়ায় তাঁরাই প্রথম নূতন

মোটরগাড়ী কেনেন। (শ্রীগীতানাথ দাসের সৌজন্যে) বিবিধ কারণে উক্ত কারবার খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এর পর, প্রেসিডেন্সি মিলের পূর্ব পার্শ্বে ৺ নীহার মুখোপাধ্যায়ের জমির লীজ নিয়ে ১৯৬৩ সালে স্থাপিত হয় অবাঙালী মালিকানায় 'হাইওয়ে মোটরস্'।

(২) শ্রীরামপুরের প্রাচীন প্রেস, গাঙ্গুলী প্রেস আর গোঁসাই প্রেসই ছিল এতদঞ্চলের একমাত্র সম্বল। ১৯৬৫ সালে রিষড়া পৌরভবনের বিপরীত দিকে ঈশ্বরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ স্থাপিত হওয়ায় প্রেসের অভাব আংশিক পূরণ হয়। তারপর প্রেসিডেন্সি মিলের ভিতরে স্থাপিত হয়েছে 'আইরিস্ প্রিন্টার্স' (১৯৭১)। ১৯৭৫ সালে আবার টি,সি, মুখার্জি ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়েছে 'উজ্জ্বল প্রিন্টার্স'। কাজে কাজেই মোটামুটি প্রেসের অভাব মিটেছে বলা চলে। হ্যাণ্ডবিল, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পত্র, পূজাপার্বনের পত্র পত্রিকা, অসংখ্য রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র, ঘোষনাপত্র সবই এখন ছাপা হচ্ছে রিষড়ায়। দিন দিন তার সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

(৩) ডাকঘরের কথা বলতে গেলে একমাত্র সাবেক রিষড়া সাব—পোষ্টঅফিসের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক কিন্তু বর্ত্তমানে রিষড়ায় চালু হয়েছে আরও চারটে পোষ্টঅফিস। জয়শ্রী টেক্সটাইলের উদ্যোগ আয়োজনে ১৯৫৯ সালে স্থাপিত পোষ্টঅফিসের কথা আগেই বলা হয়েছে, তারপর হল বিদ্যাপীঠের পরিবর্ত্তে ১৯৬৮/৬৯ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রদত্ত ভবনে নূতন পোষ্টঅফিস। এরপরেও ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সংযুক্ত হয়েছে আবুল কালাম আজাদ রোডে তৃতীয় ডাকঘর, (বর্ত্তমান পৌর সহঃ সভাপতি শ্রীকাশীনাথ সিংয়ের ভাড়াটে বাড়ীতে) চতুর্থটি রেল ষ্টেশনে যাতায়াতের পথে চোখে পড়ে বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে। শাখা যত বেড়েছে মূল পোষ্টঅফিসের শ্রীবৃদ্ধিও হয়েছে তার চেয়েও বেশী। বারবার ঠাঁইনাড়া হবার পর ভাড়াটে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে নিজস্ব সুরম্য অট্টালিকায় স্থানান্তরিত হয়েছে রিষড়া ডাকঘর ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে। আধুনিক সাজসজ্জা বিশিষ্ট এতবড় দ্বিতল ডাকঘর এতদঞ্চলে বিরল। টানাপাখা আর হ্যারিকেন ল্যাম্পের পরিবর্ত্তে আজ শোভা পাচ্ছে ১ ডজন ইলেট্রিক ফ্যান, সুদৃশ্য কাঁচের আবরণ বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক আলো। ট্রাংকমও বাদ যায়নি।

এই উল্লেখযোগ্য উন্নতি আজ সকলেরই চোখে পড়ে।

তাম্রপত্র ও সরকারী পেন্সন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিশেষ বিশেষ যোদ্ধা ও কারাবরণ কারীদের ত্যাগ ও দেশ প্রেমের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭২ সালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে তাম্রপত্র ও মাসিক ২০০ টাকা পেন্সন দানের ব্যবস্থা হয় তার অংশীদার হিসাবে রিষড়ায় প্রাচীন বংশ সম্ভূত শ্রীললিত মোহন হড়ের নাম ইতিপূর্বেই ৪৮০ পৃঃ উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর আলোক চিত্রও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন স্বর্গীয় কাশীনাথ হড় (ভগুল) তার অবর্ত্তমানে তার বিধবা পত্নী ও নাবালিকা কন্যাদের ভরণপোষনের জন্যে সরকার 'দু শত টাকা ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। বহিরাগত আরও অনেকেই সন্মানিত হয়েছেন উক্ত স্বীকৃতি সূচক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে। বলাবাহুল্য তাঁরা সকলেই এখন রিষড়ার অধিবাসী।

ব্যাঙ্কের প্রাচুর্য।

ব্যাঙ্ক বলতে যখন রিষড়ায় কিছুই ছিল না তখন দেখতে দেখতে কয়েক বছরের ব্যবধানে পাঁচ পাঁচটা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে এখানকার আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৬/৩৭ সালে রিষড়া আউট পোষ্টের বিপরীত দিকে স্বর্গীয় প্রমথ নাথ দাঁর একতালা ভড়াটে বাড়ীতে কয়েক মাসের জন্যে চালু হয়েছিল 'এশিয়া ব্যাঙ্ক'। তারপর এ ব্যাপারে আর কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। ১৯৬৪ সালের ২৭শে জুলাই সোমবার রিষড়ার শ্রীসত্যেন ব্যানার্জ্জির উদ্যোগ আয়োজনে সাধুখাঁ ব্রাদার্সের দ্বিতল ভাড়াটে বাড়ীতে স্থাপিত হয়েছিল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার শাখা। এই ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিল ১৯৫০ সালে চার চারটে ব্যাঙ্কের একত্র সংযুক্তির ফলে যার মধ্যে শ্রীরামপুরে রেল লাইনের পার্শ্বে ১৯৪১ সালে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হুগলী ব্যাঙ্ক হল অন্যতম এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কও বটে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ১৯৭৪ সালে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে ডাকঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে। ১৯৭৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্

ইণ্ডিয়ার শাখার উদ্বোধন সকলকে চমকে দেওয়ার মত ঘটনা। এরপর আবার সংযুক্ত হয়েছে রিষড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্বপার্শ্বে ঋষি বঙ্কিম রোডে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে এবং সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার শাখা স্থাপিত হয়েছে ১২।৯।৭৫ এবং সর্বশেষ সংযোজন হয়েছে ১৯৭৫ সালের শেষ দিনে পৌর ভবনের সন্নিকটে 'এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখা'। অর্থনীতির ছাত্ররাই বলতে পারবেন এতগুলো ব্যাঙ্ক স্থাপনের মর্মকথা। একি শুধু গ্রাম বাংলার দিকে দিকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার প্রসার না আর কিছুর লক্ষণ। এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে যে ব্যবসায়ী মহল থেকে রিক্সা চালকরা পর্যন্ত উপকৃত হয়েছে এ সত্য ত' সকলেরই চোখে পড়ে। রিষড়ার এই বাড়-বাড়ান্ত হয়তো কারও কারও হিংসারও কারন হতে পারে।

জগদ্ধাত্রী পূজায় রিষড়ার বৈশিষ্ট্য।

সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মত জগদ্ধাত্রী পূজাতেও রিষড়া একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে কেননা স্বল্লায়তন পৌর এলাকার তুলনায় উক্ত পূজার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। হড় মহাশয়দের বাড়ীতে একক প্রাচীন জগদ্ধাত্রী পূজার কথা ৪৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে। ঐ পূজা আজও শ্রী অনিল কুমার হড়ের উদ্যোগ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে রিষড়ায় অনুষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী পূজার সংখ্যা ২২টি বলে উল্লেখ করেছেন যুগান্তর ১৩।১১।৭৫ তারিখে, শ্রীরামপুরে সেই তুলনায় মাত্র ৩১টি। এর মধ্যে অধিকাংশই বয়সে নবীন হলেও দেওয়ানজী ষ্ট্রীট সার্বজনীন (ভট্টাচার্যপাড়া) পূজার বয়স ৪৫।৪৬, ডাঃ পি, টি, লাহা ষ্ট্রীট সার্বজনীন পূজাও রজত জয়ন্তী বর্ষ স্পর্শ করেছে, আর ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটে 'আমরা' পরিচালিত পূজাও দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিমা শিল্পী অনন্ত মালাকার সোলার সাজে সাজিয়ে তোলেন এই পূজায় মায়ের অপূর্ব মূর্ত্তি; প্রতিমার উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। (আঃ বাঃ ৫।১১।৭৩) এই পত্রিকায় ৭।১১।৭৩ তারিখে লেখা হয়:—"শ্রীরামপুর-রিষড়া এবং হাওড়ায় এ বছর খুব ধুমধামের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। এর মধ্যে

রিষড়া পারক তরুন দল ও হাওড়ার কাসুন্দিয়া আঞ্চলিক যুবকদের পূজা উল্লেখযোগ্য।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম প্রচলন করেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, সে অনেক কাহিনী, যাইহোক "১৯৭৩ সালে তাঁর প্রবর্ত্তিত পূজা ২০৫ বৎসর অতিক্রম করেছে। তারপর অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী নবদ্বীপাধিপতি মহারাজার। অধিকার 'চৌরাশি পরগণার' কেন্দ্র স্বরূপ কৃষ্ণনগরে ও চন্দননগর প্রভৃতি ভাগীরথী তটবর্ত্তী অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে এই জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ঘটে।" যুগোপযোগী ঘটনা ও বহু তথ্য সম্বলিত সুলিখিত রচনা সম্ভারে পুষ্ট এই পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন স্মরণিকা পত্রিকাগুলিও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের স্বাক্ষর বহন করছে।

সন্তরণে রিষড়ার স্থান।

সন্তরণ পটু কয়েকজন যুবক ও তরুনদের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে পূর্ণচন্দ্র দাঁ স্মৃতি সন্তরণ প্রতিযোগিতার' কথাও ৭৪/৭৫ পৃঃ উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জুনিয়র সন্তরণ বিভাগে শ্রীরজনী-কান্ত ভূঁইয়াও সে যুগে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। এতদ্‌সত্বেও এখানে ১৯৭২ সালের আগে সন্তরণ শিক্ষা দেবার মত বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না বা তার উপযুক্ত পুষ্করিনী বা জলাশয় ছিল না। ১৯৭২ সালে স্থাপিত 'রিষড়া সুইমিং ক্লাব' সে অভাব মোচনে যত্নবান হন। এই সমিতি গড়ার পিছনে ছিল স্বর্গত বসন্ত কুমার দাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সাহায্য। শুধু সন্তরণই নয়, রিষড়ার খেলাধুলার জগতে তার দান বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য। শিক্ষক হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্ব্বশ্রী বিবেকানন্দ পাল ও অমিতাভ পাল এবং সাঁতারের কল কৌশলের শিক্ষাদাতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বহু প্রথম শ্রেনীর সন্তরণ প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগী ও ন্যাশানাল সুমিইং ক্লাবের বর্ষীয়ান সন্তরণ শিক্ষক শ্রীমোহিত মোহন দে, যাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪০০ পৃঃ উল্লিখিত হয়েছে। সুইমিং ক্লাবের সম্পাদক হিসাবে প্রণবানন্দ শ্রীমানী তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জানিয়েছেন ১৯৭৫ সালে এই সংঘের তিন জন সভ্য-সভ্যা শ্রীগণেশ পাল, শ্রীহিমাদ্রি পাল এবং কুমারী মহুয়া পাল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের

প্রতিনিধিত্ব ক'রে সাফল্য অর্জন করেছে। এই গণেশ পালের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ৩১।৮।৭৪ তারিখের 'যুগান্তর' লেখেনঃ— "শুক্রবার সেনট্রালের জল—ক্রীড়ায় রিষড়ার গণেশ পাল (৪৪ ০৮) ও ক্যাঃ স্পোর্টসের স্বদেশ সরকার (৪৪ ৪ সে) ৫০ মিটার বুক সাঁতারে (দশের নীচে) জাতীয় রেকর্ড অতিক্রম করেছে।" আশা করা যায় আগামী বছরে এই সংঘ আরো অধিক সংখ্যক সাঁতারু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পাঠাতে পারবেন।

রামমোহন ও শরৎ জন্ম-জয়ন্তী।

সারা বাংলা রামমোহন ও শরৎ জন্ম-জয়ন্তী কমিটির রিষড়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ই থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ৯ই তারিখে গোপাল জীউর মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দিরে। উভয় মনীষীর বিরাট অবদান ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচিত হয়। রাজা রামমোহন সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ২৩০ পৃঃ আলোচিত হয়েছে। অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের রিষড়ার সঙ্গে নাড়ীর টানের কথাও ৩৬১ পৃঃ উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের অনাদৃতদের কোলে টেনে নিতে শরৎ চন্দ্রের মত অপর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা কে না জানে?

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভের পর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয় ১৯৭২ সালে। এ বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এপার বাংলা

ও ওপার বাংলার মিলনে সারা দেশ জুড়ে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। এসময়ে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের রচিত বাংলা ভাষায় কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। "বহু ত্যাগ ও দুঃখবরণ, বহু শ্রম ও সাধনার মূল্যে ভারতবাসী তার বিনষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, আর ১৯৫০ সালে স্বরচিত সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র রূপে শাসিত হতে থাকে ; তাই এই দুটি দিনই জাতীয় ইতিহাসে লাল হরফের দিন।" (যুগান্তর ২৬।১।১৯৭২) মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রমে ৩রা মার্চ্চ থেকে চার দিন ব্যাপী বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে উক্ত জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হয়। বহু বিশিষ্ট বক্তা এই অনুষ্ঠানে অভিভাষণ প্রদান করেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির রেকর্ড সৃষ্টি।

একথা সর্বজনবিদিত যে পশ্চিম বাংলা তেল, ডাল, মশলা, চিনি প্রভৃতির জন্যে সর্বদাই অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ীদের মর্জ্জির উপরই ভরসা। তাই অভাব-অনটনের নামে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ১৯৭৩ সালে যে জঘন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে তার নজির বিরল। এক বছরের মধ্যে সরষের তেল, নারকোল তেলের দর একশো ভাগের বেশী বাড়বে অথবা আলু বেগুনের দর ৭৫ ভাগ বাড়বে একথা ১৯৭২ সালে কেউ ভাবতেও পারে নি। মোকামে মোকামে, গুদামে গুদামে, মাল জমিয়ে রেখে সুতোর অভাব, কয়লার অভাব ও বেবি ফুডের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বছরটি তাই অভূতপূর্ব মূল্য-বৃদ্ধির ফলে জীবন যন্ত্রণার বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ৩১।১২।৭৩ (সোমবার) যুগান্তরে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে মূল্য বৃদ্ধির যে তুলনামূলক দীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে কয়েকটা মাত্র লিপিবদ্ধ করা হল :—

দ্রব্য	ডিসেম্বর ১৯৭২	ডিসেম্বর ১৯৭৩
গম (সরকারী)	·৯০	১·০৩
চিনি (রেশনে)	১·৯৭	২·১৫
খোলা বাজারে চিনি	৩·৭৫	৪·৫০
নুন (সাদা)	·২৫	·৩০ থেকে ·৪০
সরষের তেল (কিলো)	৫·৭৫	১০ থেকে ১০·৫০
নারকেল তেল	১০·০০	১৮ থেকে ২২ টাকা
ঘি (ডালডা নয়)	১৬·৭৫	২২·০০ থেকে ২৪·০০
কেরোসিন	·৬৫	৮৫
সাবান	·৬৪	·৯০
দিয়াশালাই	·০৭	৮/১০
শুকনা লংকা	৫·৩০	৮·৫০
হলুদ	৩.৪২	৬.৫০
আলু	.৬৫	১.০০ থেকে ১.২০
বেগুন	.৬১	১.২৫ „ ১.৫০
ডিম (জোড়া)	.৭০	.৮০ — .৯০

রেশনে চালের দর জানুয়ারী থেকে গড়ে বেড়েছে ২৭— ৫০ পয়সা।

সোনার দর:— পাকা সোনা (২৪ ক্যা: ১০ গ্রাম) ৩৩১৲

সোনার গহনা (২২ ক্যা: ১০ গ্রাম) ৩১৬৲

রূপার বাট (১ কেজী) ৬২৭৲

ঐ খুচরা (১ কেজী) ৬০২৲

(আঃ বাঃ — ২৮/৪/৭৩)

॥ সাধু-মহাত্মা সমাগম ॥

এই গ্রন্থের ৪৮২/৮৩ পৃষ্ঠায় রিষড়ায় স্বর্গীয় মটুকধারী লালের বাগানে ১৯২১/২২ সালে নাঙ্গাবাবার আগমন ও অবস্থিতির কথা

উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর অলৌকিক যোগ বিভূতির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

১৯৩৬ খৃ: (১৩৪২) ৺বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে স্বামী নিগমানন্দ মহারাজ আগমন করেন এবং ২/১ দিন ঐ বাড়ীতে অবস্থান কালে কয়েক জনকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন, তার মধ্যে ৺বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী এবং সস্ত্রীক ৺নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺মাণিকলাল দে অন্যতম, শ্রীপঞ্চানন লাহাও ইতিপূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রিষড়ায় তাঁর অন্যান্য মন্ত্রশিষ্যও থাকা সম্ভব। তাঁর অলৌকিক যোগ বিভূতির কথা তাঁর জীবনীতেই উল্লিখিত আছে। তাঁর স্বরচিত কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক ধর্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট বিশেষ ভাবেই আদরনীয়।

১৯৩৩ খৃঃ (বাং ১৩৪৭) শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীর রিষড়ায় আগমন ও প্রেম-মন্দির নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা এই গ্রন্থের ৫১২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে।

১৯৫২/৫৩ খৃঃ শ্রীশ্রী১০৮ মাধবানন্দগিরি মহারাজ (মৌনীবাবা) তাঁর মন্ত্রশিষ্য সর্ব্বশ্রী ইন্দুভূষণ ও অহীভূষণ বন্দ্যোর বাড়ীতে পদার্পণ করেন এবং সপার্ষদ শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করেন। এর পরেও তিনি রিষড়ার অন্যান্য শিষ্যবর্গের বাড়ীতে শুভাগমন ও প্রধান শিষ্যদের দ্বারা ধর্মশাস্ত্র থেকে বিভিন্ন শ্লোকের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন, সর্বশ্রী ডাঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও জয়দেব দাঁ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে রিষড়ায় তাঁর বহু মন্ত্রশিষ্য বর্ত্তমান। ৺প্রবোধ মণ্ডলের মাতা স্বর্গীয়া নলিনী বালা মণ্ডলই নাকি তাঁর প্রথম মন্ত্রশিষ্যা।

রিষড়ার অদূরে কোন্নগরে অরবিন্দ রোডের পূর্বপার্শ্বে গঙ্গাতটে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আশ্রমে মন্দির নির্মাণ ও 'শ্রীশ্রীনাগেশ্বর' শিবমূর্তি

প্রতিষ্ঠা এতদঞ্চলে বিশেষভাবেই পরিচিত। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর তিরোভাবের পর উক্ত আশ্রমে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় এবং ১০।২।৭৪ রবিবার (২৭শে মাঘ ১৩৮০) তাঁর সমাধিবেদীতলে ষোড়শী সংস্কার অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই উপলক্ষে সাধুসন্ত ও দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থাও করা হয়। বর্তমান গ্রন্থের উপসংহার করবার পূর্বে পৌরসভাপতি শ্রীযদুগোপাল সেনের আমলের আরও কয়েকটি উন্নতিমূলক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য তাঁর নেতৃত্বে গঠিত বোর্ডের পৌর সদস্যগণের কার্যকাল আজও চলছে যার আরম্ভ হয়েছিল ২।৭।৬৭ তারিখে, অর্থাৎ দীর্ঘ ৮ বৎসর পূর্বে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল ১৯৭২ সালে ৬ই আগষ্ট রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌরমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ মহাশয় কর্তৃক পৌরভবনের উত্তরপার্শ্বে রবীন্দ্র ভবনের (টাউন হলে) শিলান্যাস উৎসব। এই অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। পৌর প্রধান শ্রী যদুগোপাল সেন বলেন যে আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় এক হাজার লোক বসবার মত এই ভবনের ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই রবীন্দ্রভবন (টাউন হল) নির্মাণের পরিকল্পনার অঙ্কুরোদগম হয় ১৯৬১ সালে কবিগুরুর জন্ম শতবার্ষিকীর অব্যবহিত পরে। তখন অবশ্য বাঙ্গুর পার্কের একাংশ মুক্তাঙ্গন মঞ্চ নির্মাণের কথাবার্তা হয়, তারপর ৺ সুশীল চন্দ্র আগুনের আমলে ১৮।৭।৬১ তারিখের সভায় পৌরসদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে পৌর ভবনের দ্বিতলে ঐ 'হল' নির্মিত হবে। কিন্তু অর্থ সমস্যাই হয়ে দাঁড়ায় উক্ত প্রকল্প রূপায়নের অন্তরায়। ইতিমধ্যে ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে পূর্ব পাঞ্জাব (রহটক) নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে বহু লেখালিখি ও ব্যক্তিগত অনুরোধের ফলে পৌরভবনের উত্তর সংলগ্ন তাঁর জমিটি ১৯৬৪।৬৫ সালে বিক্রয় করতে

সম্পন্ন হওয়ার বর্তমানে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের উপযুক্ত জমির অভাব দূরীভূত হয় কিন্তু অর্থ সমস্যার কোন সমাধান তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বেশ কয়েক বছর গড়িয়ে যায় কালের ঘূর্ণায়মান চক্রে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে পৌর ভবনের উত্তরাংশে (সমস্ত পৌর এলাকার প্রায় মধ্যমণি) এক হাজার লোকের আসন বিশিষ্ট আধুনিক স্থাপত্যশিল্প অনুযায়ী প্রেক্ষাগৃহাদি নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়। এবং সেই সঙ্গে সি,এম,ডি এর অর্থসাহায্যে বস্তি এলাকায় একটি কমিউনিটি হল তৈরির পরিকল্পনাও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালে শিলান্যাসের পর থেকেই এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ সঞ্চার হয়। একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র ভবনের (টাউন হল) স্বপ্ন দেখার পর থেকে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মূলে ছিলেন পৌর সদস্য শ্রী দীনেশ চন্দ্র ঘটক।

উক্ত শিলান্যাস অনুষ্ঠানে 'বলাকার' পক্ষ থেকে শ্রী ভূদেব চক্রবর্তী আবেদন করেন যেন ১৯৭৩ সালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অভিনয় উপযোগী অন্ততঃ একটি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে পৌর প্রধান বহু অর্থ ব্যয়ে ঐ স্থানে অবস্থিত পৌরসভার গুদাম ঘরটি স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করেন। এই সুযোগে পৌর কর্মচারী 'রিক্রিয়েশন ক্লাব' তাঁদের দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্খা পূরণ করে দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেন। তাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন পৌর সদস্য (বহু অভিনয়কারী) শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ মল্লিক এবং কলা কৌশলে উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন প্রখ্যাত নট ও নাট্য পরিচালক শ্রী হেমন্ত কুমার মল্লিক। ১৭ই ও ১৮ই মার্চ ১৯৭৩ তারিখে যুগ্ম সম্পাদক সর্বশ্রী অমরেশ ভট্টাচার্য ও মন্মথ নাথ আশের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উক্ত রিক্রিয়েশন ক্লাব বহু অভিনীত নাটক 'কর্ণার্জুন' ও 'বদল বাদল' মঞ্চস্থ ক'রে সুনাম অর্জন করে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে উক্ত 'বলাকা' নাট্য সংস্থার জন্ম হয় ২০শে জুলাই ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং 'সংলাপের' সৃষ্টি হয় ১৯৭২

মাসের শেষের দিকে এই দুটি নাট্য সংস্থা ত্রিবড়া এবং ত্রিবড়ার বাহিরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। বলাকা ত্রিবড়ায় প্রথম একাংক নাটক প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। বাংলা ও বহির্বাংলায় বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করেই বলাকা নিজেদের প্রগতিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মাসিক অনুদান, খেলাধূলা, 'নির্মাল্য' পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে সাহিত্য সেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া কৃতি মনীষীদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনে তাঁরা সচেষ্ট। প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাট্য সাধনার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানায় ২৮। ৫। ৭১ তারিখে। ত্রিবড়ায় বিশিষ্ট ব্যায়ামবিদ একুল দাস এবং পদব্রজে বহু তীর্থ ও বারাণসী ধাম ভ্রমণের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রী অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় (৭০) কে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। ১৬।৬।১৯৭৩ তারিখে ত্রিবড় ত্রিবড়া সংগঠনীর সভ্যরা বাংলার প্রখ্যাত বর্ষীয়ান চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী সান্যালকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি এক আশীর্বাণী পত্র দিয়ে 'বলাকার' সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন। 'সংলাপের' প্রচেষ্টায় ত্রিবড়ায় প্রথম সপ্তাহব্যাপী নাট্য মহাসম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ ১৯৭৪ সালে লক্ষ্ণৌ ও পাটনায় সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজক সংস্থা হিসাবে নির্বাচিত হয়। ১৪।৩,৭৪ আনন্দবাজারে লেখেন :—"দূরের মধ্যে —লক্ষনউ। লক্ষনউ ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন ও বেঙ্গলী ক্লাব আয়োজিত সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতায় সংলাপ নাট্যদল শ্রেষ্ঠ প্রযোজক সংস্থা হিসাবে নির্বাচিত। দলটি জোড়া বাংলার বহু অভিনীত নাটক 'ক্যান্সার' অভিনয় করে এই সম্মান অর্জন করেছেন। ... . সংলাপ গোষ্ঠীর ভূদেব চ্যাটারজি (চক্রবর্তী) শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মর্যাদায় ভূষিত।......সংলাপের নমিতা মণ্ডল দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ...... সংলাপ ত্রিবড়ার দল।" ২৭। ১২। ৭৪ তারিখে পাটনা রবীন্দ্র ভবনে 'শিল্পী সমিতি' আয়োজিত সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় 'সংলাপ' কর্তৃক 'ইলিশমারির চর' নাটক

অভিনীত হয় এবং শ্রী ভূদেব চক্রবর্তী দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রীমতী সঞ্চিতা মুখার্জী দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন এবং তদুপলক্ষে ৯।১।৭৫ তারিখে শ্রীমতী দীপান্বিতা রায় প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। (পাটনা শিল্পী সমিতির স্মরণিকা)।

বলাবাহুল্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই রিষড়ায় বহু নাট্যসংস্থা (থিয়েটার ও যাত্রা) নাট্য প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখেছেন। তার মধ্যে সবগুলি অত প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল না থাকলেও তাদের নাম আজও লোকের স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে যায় নি। খেয়ালী নাট্য সংঘ, দি রিষড়া ক্লাব, হট্ট মন্দির ক্লাব, হলিডে ক্লাব, সানডে ক্লাব, সার্বভৌম শিল্পী সংস্থা, রিষড়া টাউন ক্লাব, প্রগতি সংঘ, ফ্রেণ্ডস্ টাক্, শিল্পশ্রী, কিশোর সংঘ, শ্রী সংঘ, নবরূপা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে যাত্রাভিনয়েও অনেকগুলি সংস্থা স্বল্প মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে একাধিক রাত্রি অভিনয় ব্যবস্থা ক'রে চলেছেন। এখন যেমন পুরাতন টেকনিকের বহু পরিবর্তন হয়েছে তেমনি আবার 'বিনামূল্যে প্রবেশ নিষেধ'ও হয়েছে। আপামর জনসাধারণের যুগপৎ শিক্ষালাভ ও আনন্দের খোরাক যোগানোর দিন হয়েছে অপসারিত। চারদিকে হাজার হাজার মানুষ অভিনয় দেখছেন সত্যরঞ্চি, চেয়ার এবং বেঞ্চে বসে কিন্তু সবরকম আসনই টাকার অঙ্কে বাঁধা। বদলেছে অভিনয়ের ধারা, বদলাচ্ছে আঙ্গিক এবং তার সঙ্গে দর্শকদের রুচি। উঠে গেছে জুড়িদের গান। পৌরাণিক পালাও আর তেমন ভাল লাগে না; দূর ইতিহাসকে বর্তমান পারিপার্শ্বিকের ছাঁচে ফেলে পালা অভিনয় করলে তা দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অবশ্য এক শ্রেণীর যাত্রারসিক আছেন যাঁরা সেকালের অন্ধ ভাবক না হলেও তাঁরা চান পুরানোর মধ্যে নূতনের প্রাণ সঞ্চার। ওটা হয়তো আসবে ট্রাডিশনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। দাগ কেটে যাবে জনমানসে।"

(যুগান্তর ১২ই আশ্বিন ১৩৮২-এর ছায়া অবলম্বনে)।

পৌর বিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন।

পৌর সভার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৬৬ সালে ৪নং ওয়ার্ডের যে নূতন বিদ্যালয় ভবনের শিলান্যাসপর্ব সমাপ্ত হয়েছিল সেটি পরি-পূর্ণতা লাভ করে যদুবাবুর আমলে এবং সে বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী-২৮।৯।৭৩ তারিখে। নাম হয় 'প্যারীমোহন দাশ মিউনিসিপ্যাল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়', তার কারণ এই বিদ্যালয় ভবন নির্মাণকার্যে ১০০০০৲সাহায্য করেন স্বর্গীয় দাশের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী রমা সেনগুপ্তা। তিনি বলেন স্বর্গীয় দাশের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় সেই অভাব পূরণ করে এবং পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর শিক্ষয়িত্রী জীবনে উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই তিনি এই বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পৌর সভার হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছেন।

যদুবাবুর আমলে আরও কয়েকটি সংস্থা পৌর সভার অনুমোদন ও অনুদান লাভ করে। তার মধ্যে মোড়পুকুর বকুলতলা এ্যাথলেটিক ক্লাব, ছুটির আসর ও শিশুমৈত্রী মণিমেলা অন্যতম। বকুলতলা এ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫০ সালে এবং ১৯৭৫ সালে তার রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মোড়পুকুরে অবিনাশ চন্দ্র সেন রোডে অবস্থিত এই রেজিষ্টার্ড ক্লাবটি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তার কর্ম্মময় অবদানের জন্যে এতদঞ্চলে বিশেষ পরিচিত।

অরাজনৈতিক এবং ধর্ম, দল-মত নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক ও আমোদ প্রমোদ মূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'ছুটির আসরের' জন্ম হয় ১৯৬৪ সালে। শ্রী দীনেশ চন্দ্র ঘটক মহাশয়ের প্রভাবের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ৭ কাঠা পতিত জমি এই সংস্থাকে লিজ প্রদান করেন এবং সেই জমি সংস্কার করার পর সাধারণ সম্পাদক শ্রীশান্তি রঞ্জন দাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় জনকল্যাণকামী জনসাধারণের সহযোগিতা ও পৌর সভার অর্থানুকূল্যে ওখানে গড়ে উঠেছে একটি

স্থায়ী পাব্লিক হল—মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তীর স্মরণে। রেজিষ্টার্ড ক্লাব হিসাবে এটি একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বর্ষে বর্ষে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেও সভ্যারা দর্শকবৃন্দের অভিনন্দন লাভ ক'রে আসছেন। নানাবিধ আকর্ষনীয় খেলাধুলার মাধ্যমে সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগকে দেহ-মনে সুস্থ সবল ক'রে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গত এক যুগ ধরে রিষড়ায় কয়েকটি মনিমেলার সৃষ্টি হয়; তাদের সব-কটির অস্তিত্ব আজ বজায় না থাকলেও একথা সর্বজন স্বীকৃত যে শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, কাজেই শৈশব থেকেই তাদের খেলাধুলা এবং চরিত্রবান উপদেষ্টার মাধ্যমে সৎউপদেশাবলী দ্বারা সুস্থ, সবল, চরিত্রবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় শিশু মৈত্রী মনিমেলা — ১৯৭০ সালের মে মাসে। সর্ব্বভারতীয় শিশুকল্যাণ মণিমেলা সংগঠনের শাখা হিসাবে এই মণিমেলা কার্য করে চলেছেন। এটি একটি রেজিষ্টার্ড সংস্থা। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭২ স্বাধীনতার শুভ রজত জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে সভ্যারা মিলিত হন দাঁ বাড়ীর পূজামণ্ডপে।

রিষড়ায় প্রথম পি, এইচ, ডি।

উনবিংশ শতাব্দীতে রিষড়ায় রায়বাহাদুর বা রায়সাহেব খেতাব প্রাপ্ত সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অভাব না থাকলেও বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত রিষড়ার কোনো শিক্ষাবিদ্‌কে পি, আর, এস বা পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করতে দেখা যায় নি। এ বিষয়ে প্রথম গৌরব অর্জ্জন করেন রিষড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল। ১৯৫৩ সালে স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি বি, এস, সি। রসায়নে অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর থেকে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউসনে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এম,

এস, সি কোর্সে পাঠ্যবস্থায় মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, বালীবঙ্গ শিশু বিদ্যালয় প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার পর বর্তমানে তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যামন্দিরের (ডিগ্রী কলেজ) অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত আছেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যামন্দিরে পার্ট-টাইম (খণ্ডকাল) শিক্ষকতা করেন। রিষড়া বিধান চন্দ্র কলেজেও তিনি পার্ট-টাইম (খণ্ডকাল) লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

১৯৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে ডঃ এস, সেনগুপ্তর (রিডার ইন্ কেমেষ্ট্রি) সঙ্গে তিনি গবেষণা করেন এবং এই গবেষণার ফল দেশী ও বিদেশী (ইউ, কে) জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং তদনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি, এইচ, ডি ডিগ্রী প্রদত্ত হয়। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল - "ষ্টাডিজ্ অন আওন এক্সচেঞ্জ ইকুইলিব্রিয়া।" তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার পাল। এনারা বংশানুক্রমে রিষড়া শ্যামনগর লেনের অধিবাসী। বর্তমানে ঐ রাস্তাটী শরৎচন্দ্র বসু লেন নামে অভিহিত।

১৯৭৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী পৌরসভা কর্তৃক রিষড়া ৮নং রেলওয়ে গেটের পশ্চিমপার্শ্বস্থ রাস্তাটি (গুরুগার্ডেন রোড) 'পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী সরণী' নামে পরিবর্তিত হয়। শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগের অনুপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সোমানন্দ উক্ত রাস্তার উদ্বোধন কার্য সমাধা করেন। শ্রমিক ও কৃষক নেতা হিসাবে পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী ছিলেন এতদঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। ১৯৪৫ সালে কমিউনিষ্টরা কংগ্রেস ত্যাগ করে আলাদা দল গঠন করেন। সেই সময় প্রকাশিত হয় "স্বাধীনতা" পত্রিকা। তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৯৪৮ সালে এই কমিউনিষ্ট পার্টি বে আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং তিনি কারারুদ্ধ হন। জেলের মধ্যে থাকাকালীন সরকারী নির্যাতনের ফলে তিনি

ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে পড়েন। দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেলেও একমাত্র মুখমণ্ডলের অঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত সচল ছিল এবং তারই সাহায্যে তিনি সি, পি আই নেতা এবং বিধান সভার সদস্যের গুরু দায়িত্ব পূর্ণ কার্য (বিশেষ ধরণের যানে উপবিষ্ট অবস্থায়) সম্পন্ন করতেন। তিনি কয়েকখানি রাজনৈতিক গ্রন্থ রচনা করেন। মার্কসীয় অর্থনীতির উপর লেখা গ্রন্থখানি তার মধ্যে অন্যতম।

(পল্লীডাক— ৯।২।৭৩)

যে যমুনা পুষ্করিণীর কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে সেটি ভরাট করার পর পাশে পাশে গড়ে উঠে গৃহাদি ও খাটাল। মাঝের ফাঁকা জমিটুকু (প্রায় ১৯ কাঠা) ২৭ ১২।৭৩ পৌরসভা কমিউনিটী হল তৈরির জন্যে কিনে নেন এবং পৌরসদস্য শ্রীমদনলাল কেডিয়ার উদ্যোগে প্রভূত অর্থব্যয়ে বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে ১৯৭৫ সালে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দূরের ও কাছের হাজার হাজার মানুষ এই প্রতিমা ও আলোকসজ্জা দর্শন করে প্রশংসামুখর হয়ে উঠে।

সর্বভারতীয় মেডিকেল এ্যাসোসিয়েসনের রজত জয়ন্তী।

উক্ত ভিষক্-সংস্থার রিষড়া-শ্রীরামপুর শাখার পক্ষ থেকে ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী' ১৯৭৫ তারিখে প্রেসিডেন্সি জুটমিল ম্যানেজমেণ্ট বাংলোতে এই উৎবব সম্মেলন আয়োজিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন ডাঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায় এবং সংগঠন সম্পাদকের (organising secy) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ডঃ তারক ব্যানার্জি। অভ্যর্থনা সমিতির সহসভাপতি হিসাবে ছিলেন ডাঃ পঞ্চানন মুখার্জি।

এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ এম, এন, সরকার এবং সভাপতির আসনে ছিলেন

প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ এইচ, কে, বোস।

চিকিৎসকদিগের এই ধরণের দুইদিবস ব্যাপী সম্মেলন রিষড়ায় এই প্রথম এবং বলাবাহুল্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রিষড়ার গৌরব বৃদ্ধি পায়। এতদুপলক্ষে যে 'স্মরনিকা গ্রন্থ' প্রকাশিত হয় তার মধ্যে চিকিৎসা জগতের গবেষণামূলক বহু মূল্যবান তথ্য এবং বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানের উপর আলোকপাত করা হয়। ইহার মধ্যে ১৯৭৪ সালের ২৮শে অক্টোবর পরলোকগত আই, এম, এ শ্রীরামপুর মহকুমা শাখার সভাপতি ডাঃ প্রফুল্ল কুমার বসুর স্মৃতি তর্পণ করা হয়।

রিষড়ায় রবীন্দ্র ভবনের উদ্বোধন।

২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ (ইং ৯।৫।৭৫) তারিখে কবিগুরুর জন্মদিবসে রিষড়া পৌরভবন সংলগ্ন 'রবীন্দ্র ভবনের' উদ্বোধন করেন রাজ্য পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন। শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ-শিল্পী শ্রীপশুপতি কুণ্ডুর আঁকা রবীন্দ্র নাথের বিরাট তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। পৌরসভাপতি শ্রীযদুগোপাল সেন তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ কার্যে সি, এম, ডি, এ কর্তৃপক্ষ প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান করেছেন এবং বাকি টাকা পৌরসভা সংগ্রহ করেছে। প্রায় তিন বছর আগে (৬।৮।৭২) এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কান্তি ঘোষ। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বহু মাননীয় অতিথি ও পৌরসদস্যাবৃন্দ এবং বিধান সভার স্থানীয় সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন উপলক্ষে পৌরপ্রধান স্থানীয় মৈত্রী সংসদের সভ্যসভ্যাদের অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করার কথাও উল্লেখ করেন।

রিষড়ার সাংস্কৃতিক জীবনে নিঃসন্দেহে এটি একটি স্মরণীয় দিন। চিরইপ্সিত, বহু আকাঙ্খিত এই রবীন্দ্র ভবন রিষড়ার

একটি স্থায়ী সম্পদ এবং এই সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের রূপকার থেকে আরম্ভ করে পৌরসদস্যবৃন্দ, সি, এম, ডি-এ, এবং বে-সরকারী সদস্য শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক সকলেই ধন্যবাদার্হ। তাঁদের সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় রিষড়ায় বহুদিনের অভাব দূরীভূত হল। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীসংঘ, ২৫শে বৈশাখ "ক্ষুধিত পাষাণ," ২৬শে রিষড়া পৌরকর্মী রিক্রেয়েশন ক্লাব কর্তৃক 'অদল বাদল', ছন্দম্ প্রযোজিত (মহিলা শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক) 'কবি জয়দেব' এবং ২৭শে বৈশাখ সংলাপ কর্তৃক 'ইলিশ মারির চর' নাটকগুলি সুঅভিনীত হয়। ১৯৭৫ সালটি ছিল রিষড়া পৌরসভার হীরকজয়ন্তী বর্ষ।

রিষড়ার তিনশতকের ইতিহাস পরিক্রমার এই কাহিনী আদ্যন্তহীন। এর তো শেষ নেই কাজেই গল্পের শেষে নটে গাছটি মুড়িয়ে যাবার কথাও ভাবা যায় না।

বিংশ শতাব্দী আজ অস্তাচলে। লেখকের অবস্থাও তথৈবচ। বর্তমান ও ভাবী নাগরিকদের কাছে নত মস্তকে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করি। অলমিতি বিস্তরেন।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে॥
যাচি হে তোমার চরম শান্তি পরাণে তোমার পরমকান্তি—
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥"

— রবীন্দ্রনাথ।

—:※:—

!! পরিশিষ্ট !!

(সংশোধন ও সংযোজন)

১। ৫৩ পৃষ্ঠায় ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বরের পরিবর্তে ভুলক্রমে ১৬৪৮ খৃঃ ছাপা হয়েছে।

২। ১০৩ পৃষ্ঠায় স্নান যাত্রা সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা ছিল সে সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন শ্রীমন্টু পাল (শ্রীগোবর্দ্ধন পালের পুত্র)। তিনি লিখেছেন চণ্ডী চরণ পালের পুর্ব পুরুষগণের আদি বাস স্থান ছিল মাহেশের জগন্নাথ ঘাটলেনে এবং ঐ স্থানে বসবাস কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্নান-জল দেওয়া আরম্ভ হয়। কালক্রমে উক্ত পালবংশ রিষড়ায় এসে বসবাস স্থাপন করেন কিন্তু চণ্ডীচরণ পালের উত্তর পুরুষগণ বংশানুক্রমে একক পুত্রবান হওয়ায় তাঁরা রিষড়ার মাখন পালদেব সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হন তার কারণ ঐ স্নানজল বহন কার্যে ৫ জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। তিন ব্যক্তি তিন কলস জল বহন করেন এবং তাঁদের অগ্র পশ্চাতে দুই ব্যক্তি রক্ষী হিসাবে গমন করেন। বলাবাহুল্য, স্নানজল বহণকারী ৫ ব্যক্তি উপবাসী অবস্থায় শুদ্ধাচারে গমন করেন এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে তাঁরা পরিতোষ সহকারে প্রসাদ পেয়ে থাকেন। উক্ত প্রথা অদ্যাবধি ঐভাবেই চলে আসছে।

৩। আশুতোষ লাহা :—

৩৫১ পৃষ্ঠায় তাঁর পুত্র কন্যাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাব দ্বারা কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্যে ৺ জ্যোতিষ চন্দ্র লাহার পুত্র শ্রীদুর্গাপদ লাহা জানিয়েছেন যে তার পিতামহ ৺ আশুতোষ লাহার প্রথম বিবাহ হয় ডোমজুড়ে হিন্দু মহিলার সঙ্গে। গ্রন্থোক্ত দুই পুত্র ও দুই কন্যা এই হিন্দুপত্নীর গর্ভজাত সন্তান, ইউরোপীয় মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বনের পরে।

৪। অবিরাম সাইকেল চালনা :—

৪৯৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণ সম্বন্ধে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন যে তিনি উক্ত প্রতিযোগিতায় ৬৪ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড করেন

এবং তদনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হন। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাঁ ৫৪ ঘণ্টা সাইকেল চালনা করেন।

৫। পৃঃ ৫৫১ 'শিল্প সংস্থার সম্প্রসারণ' হেডিং এর পরিবর্তে 'এ্যালুমিনিয়মের যুগ' পাঠ করতে হবে এবং পরিচ্ছেদ আরম্ভে নিম্নোক্ত লাইনটি সংযুক্ত হবেঃ— 'এতাবদ্‌কাল তৈজসপত্র বা বাসনকোসন বলতে লোকে তামা কাঁসা ও পিতলের তৈরি জিনিষপত্রই ব্যবহার করে আসছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে"............

৬। পৃঃ ৫৫৩ শেষ পংক্তির পর সংযুক্ত হবে "দানা বাঁধতে আরম্ভ করে," ৫৫৪ পৃষ্ঠার হেডলাইন হবে— "শিল্প সংস্থার সম্প্রসারণ" ও প্রথম লাইন হবেঃ— "স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একটা বছর যেতে না যেতেই রিষড়ার'—

৭। পৃঃ ৪৯০। "বিধান চন্দ্র কলেজে ১০।১২।৭৪ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আবক্ষ মর্মর মূর্তির উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন—আজকের দিনটা আপনাদের কলেজের একটা স্মরণীয় দিন, কারণ আজ থেকে যত ছাত্রছাত্রী কলেজে আসবে তারা প্রবেশ মুখে ডাঃ রায়ের এই মর্মর মূর্তিটি দেখতে পাবে আর আমার কাছে এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই কারণে যে আপনাদের কলেজে আসতে পেরে একজন মহান কর্মযোগী পুরুষের আবরণ উন্মোচন করতে পারলাম।" (কলেজ পত্রিকা—১৯৭৩/৭৪)

এই প্রসঙ্গে 'সংহতি' নামক পত্রিকায় (শ্রীরামপুর) ১৩।১।৭৪ তারিখে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা হলঃ—মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল! পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় রিষড়া বিধান কলেজে উপস্থিত হয়ে কলেজের উন্নতির জন্য একলক্ষ টাকা সাহায্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়নি এবং সরকারী মহল এ ব্যাপারে কোন উচ্চ-বাচ্য করছেন না। বিধান কলেজের ছাত্র ফেডারেশন এই প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য সরকারের কাছে দাবী করছেন।"

৮। পৃঃ ৫৫৬ বন্ধ 'লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিল' সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের ফলে, সেটি পুনরায় খোলা সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় (দুর্গাবতী) ১৯৭৯ তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ—

"ছুটি বন্ধ কাপড়ের কল খুলল—(নিজস্ব সংবাদ দাতা) চন্দননগর, ১৩ অক্টোবর—মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় আজ শ্রীরামপুর এলাকার ছুটি বন্ধ কাপড়ের কল লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামপুরিয়ার পুনরুদ্বোধন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, এই ছুটি মিলের যন্ত্রপাতি এখন পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং আগামী মাসে উৎপাদন শুরু হবে। ইতিমধ্যে প্রত্যেক শ্রমিক কর্মচারী ১০০ টাকা করে পূজা সাহায্য পাবেন।

শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মিল দুটির যন্ত্রপাতি আধুনিকিকরণ করা হবে।"

৯। পৃঃ ৬৬০। রিষড়া পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত সেকেলে খাটা পাইখানা অপসারণ করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গোড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সি, এম, ডি, এ কর্তৃক মাত্র এক চতুর্থাংশ খরচায় (৪০০ টাকা) বিশেষ ধরণের কংক্রিটের তৈরী পায়খানা (প্রিক্যাব্রিকেটেড ল্যাটরিণ) বসিয়ে দেবার কাজ শুরু করে দেন। ১৯৭১ সালের কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী রিষড়ার বস্তি উন্নয়ন পরিকল্প অনুযায়ী প্রত্যেক হোল্ডিংএ বিনামূল্যে খাটা পাইখানার পরিবর্তে উক্ত ধরণের পাইখানা নির্মাণ, কলের জল সরবরাহ, রাস্তার সংস্কার ও উন্নতি সাধন এবং অধিক সংখক বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবস্থার কাজ গৃহীত হয়। জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষ রোডে একটি নূতন পাম্প হাউসও স্থাপিত হয়।

১০। পৃঃ ৬৯৫। ১৯৭৫ সালের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল

[ক] আগষ্ট মাসে কলকাতায় টেলিভিসন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই রিষড়ার কয়েলটি বিশিষ্ট পরিবারে টি, ভি, সেট স্থাপিত হয়, যার ফলে শিশু ছাত্র ও তরুণ মহলে আনন্দ কোলাহল পড়ে যায়।

[খ] ২নং বসরুট (চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর) মাহেশ স্নানপিড়ি মাঠের পরিবর্তে রিষড়া বাগখাল পর্যন্ত আগাইয়া দেওয়ার ফলে রিষড়ার অধিবাসীদের বিশেষ ভাবে এ্যালকালির কর্মচারীদের সুবিধার কারণ রূপে দেখা দেয়। তার পূর্বেই অবশ্য শ্রীরামপুর-বালীখাল মিনিবাস সার্ভিস প্রচলিত হয়॥ ক্রমবর্দ্ধমান লোক সংখ্যার পরিবহন ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে উক্ত দুটি বাস সার্ভিস [illegible] আদৃত হয়।

[গ] ২৬শে জুন ১৯৭৫ তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুদ্ধ হয় এবং ফলে— কারখানায়, অফিস আদালতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বৃদ্ধি পায় বলে দাবি করা হয়। অশান্তি ও উত্তেজনারও উপশম ঘটেছে বলা চলে।

[ঘ] অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোরতা বহু উৎসব অনুষ্ঠানে ভোজন বিলাসীদের পক্ষে নিদারুণ নিরানন্দের কারণরূপে দেখা দেয়।

[ঙ] ১৯৭৫ সালটি নারীবর্ষ রূপে চিহ্নিত ৭ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুর গান্ধী ময়দানে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষে হুগলী জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য মহিলা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। (যুগান্তর ৮.১২।৭৫)

রিষড়া থেকে প্রকাশিত
= পুস্তকাবলী =

পুস্তকের নাম।	লেখকের নাম।	প্রকাশ কাল।
১। অনুভূতি বিবরণাদর্শ (বঙ্গানুবাদ)	শ্রী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (রায় সাহেব)	... ১৮৯৫
২। Arithmetic for Biginners.	শ্রীশ চন্দ্র লাহা, বি, এ।	... ১৯০১
৩। ছত্রপতি শিবাজী। (দ্বিতীয় সংস্করণ)	শ্রী সত্যচরণ শাস্ত্রী	... ১৩৩১
৪। হারদ্বারে কুম্ভমেলা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের অন্তরায়।	শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী	.. ১৩৫৮
৫। স্তোত্রাবলী।	ঐ ঐ	... ১৩৭০
৬। নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি।	ঐ ঐ	... ১৩৭২
৭। সুহৃৎ।	ঐ ঐ	... ১৩৮০
৮। শ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্তনম্।	ঐ ঐ	... ১৩৮০
৯। প্রেমের ঠাকুর (প্রথম খণ্ড)	শ্রী বটকৃষ্ণ ঘোষ	... ১৩৬৩
ঐ ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)	ঐ ঐ	... ১৩৬৮
১০। বেদান্ত বোধ।	শ্রী রাধারমণ লাল	... ১৯৫৬
১১। ধনুর্বান চালনা ও নির্মাণ শিক্ষা।	শ্রী ললিত মোহন হড়	... ১৯৩৫

১২।	ছায়ালোকের শ্রীমতীরা।	শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ	১৯৫০
১৩।	রূপলোকের নরনারী।	ঐ ঐ	১৯৫২
১৪।	রণ সজ্জায় জার্ম্মেণী।	ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য পি, এইচ, ডি।	১৯৩১
১৫।	বিপ্লবের কাহিনী।	ঐ ঐ	১৯৫৮
১৬।	বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস।	ঐ ঐ	১৯৬২
১৭।	পঞ্চভূত।	শ্রী নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯৬৩
১৮।	সত্যের সন্ধান।	শ্রী শিবদাস মান্না	১৩৭৮
১৯।	সত্য অনুসন্ধানের পথনির্দ্দেশ।	ঐ ঐ	১৩৮০
২০।	স্কুল পাঠ্য পুস্তক : (ক) ভূগোল	শ্রী[illegible] নাথ পাল, বি, এ।	[illegible]
	(খ) সহজ জ্যামিতি।	ঐ ঐ	১৯৫৪
	(গ) সরল গণিত।	ঐ ঐ	১৯৬৩
২১।	কবিয়াল কৈলাস বারুই।	শ্রী মণীন্দ্র নাথ আশ	১৯৬৭
২২।	মনের ব্যায়াম।	স্বামী প্রেমঘনানন্দ	১৩৫৫
২৩।	পিউপিয়া।	ঐ	১৩৪৫
২৪।	শিকাগোয় বিবেকানন্দ।	ঐ	১৩৬৯
২৫।	ইংলিশে বাংলায় লড়াই।	ঐ	১৩৫১
২৬।	ঠাকুর-মা-স্বামীজী।	স্বামী সোমানন্দ	১৩৬৯
২৭।	শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প।	ঐ	১৩৭০
২৮।	বিবেকানন্দের গল্প	ঐ	১৩৭১
২৯।	সারদা মায়ের কথা।	ঐ	১৩৭২
৩০।	ছোটদের ধর্ম ও নীতিকথা।	ঐ	১৩৭৪
৩১।	পৌরাণিকী	ঐ	১৩৮২
৩২।	শেফালি।	শ্রী হরিহর আশ	১৩৭৬
৩৩।	শ্রীশ্রী৺অর্দ্ধনারীশ্বরো বিজয়তে	শ্রী দেবানন্দ ব্রহ্মচারী	১৩৭৬
৩৪।	দার্জ্জিলিংয়ে ঘুম নেই।	শ্রী নীলমণি ঘোষ	১৩৭৭
৩৫।	কুমারী কলকাতা।	ঐ ঐ	১৩৭৮
৩৬।	তিনশতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র।	শ্রী কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী	১৩৮২

সংবাদ পত্রে রিষড়ার ঘটনা ও দুর্ঘটনা

(বহুর মধ্যে কয়েকটি)

১। মেয়ে কামরায় মেয়ে চোর—

(নিজস্ব প্রতিনিধি) শ্রীরামপুর ৯ই জুন :— শনিবার রাত্রে একটি লোকাল ট্রেনে মহিলা কামরার মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে দুজন ইরাণীর পোষাকপরা মেয়ে যাচ্ছিল হাওড়া থেকে। রিষড়া ষ্টেশনে আসার সময় একটি মেয়ে চীৎকার করে উঠে তার গলায় হার ছিঁড়ে নিয়েছে। চোর তখন কামরার মধ্যেই আছে। এবার সার্চ করা সুরু হবে। রিষড়া ষ্টেশনে ট্রেনটি থামতেই একটি ইরাণী মেয়ে কামরা থেকে একটা জিনিষ ফেলে দিয়ে ট্রেন থেকে নামবার চেষ্টা করতেই যাত্রীরা আটক করে ফেললো। অপর মেয়েটি তাকে ছাড়াবার জন্যে একজনের হাতে কামড়ও দিয়েছিলো। খণ্ডযুদ্ধ চললো কিছুক্ষণ, ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। এই দু'জন মেয়ে চোরকে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে। ১২।৬।৬৯ বসুমতী (শ্রীমণীন্দ্র আশের সৌজন্যে)।

২। বাস-ট্রাকে সংঘর্ষ, নিহত ৭ আহত ৩০ জন

কটক ১৬ এপরিল- আজ সকালে ভদ্রক-পুরী রোডে পুরীগামী একটি বিশেষ টুরিষ্ট বাস এবং একটি ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে ৭ জন ঘটনা স্থলেই মারা যান। আহত হয়েছেন ৩০ জন। বাসটি যাচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোন্নগর থেকে। .... যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের নাম হচ্ছে কুমারী প্রতিমা সাউ (১০) শ্রীমতী নন্দিনী পরামানিক, শ্রীশৈলেন দত্ত, শ্রীমতী স্নেহলতা ভট্টাচার্য, শ্রীবিষ্ণু পদ ঘোষ, শ্রীক্ষুদিরাম মল্লিক ও শ্রীমতী শৈলবালা দেবী, — ইউ, এন, আই।

আঃ বাঃ ১৭।৪।৭২

৩। রিষড়া ষ্টেশনে ছিনতাই, খুন—

(সংবাদ দাতা প্রেরিত) শ্রীরামপুর ৫ই মার্চ- রিষড়া রেল ষ্টেশনকে খুনী ও ছিনতাই ষ্টেশন বলে বর্ণিত করলে ভুল হবে না, ... দুপুর বেলা ও রাত আটটার পর সমাজ বিরোধীদের আশ্রয়স্থল হলো রিষড়া ষ্টেশন ও তার আশে পাশে। .... যুগান্তর ৭।৩।৭৩

৪। রিষড়ার গঙ্গায় ২ কিশোরীর মৃত্যু —

শুক্রবার রিষড়ার কাছে গঙ্গায় ২ জন কিশোরী নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আনন্দবাজার :— ৪।৬।৭২

ক্রোড় পত্র

আরও কয়েকটি অভিমত ও অভিনন্দন।

শ্রীরামঃ শরণম্। আমাদের জাতীয় জীবনকে উন্নততর করিতে হইলে পূর্বপুরুষদিগের আচরিত কর্মাবলী জানা আবশ্যক। অনেক সময়ে আমরা আত্মবিস্মৃত হই এবং আমাদের পূর্বজগণের অবদানও ভুলি'া যাই। 'তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র' — এই গ্রন্থখানি রিষড়া-বাসী শুধু নহে পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহের জনগণও উপকৃত হইবেন এই গ্রন্থপাঠে।

আমি বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম যে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী মহাশয় অশেষ যত্ন সহকারে রিষড়ার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে যেন বহু ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের এই গৌরবময় কার্যের অনুকরণ করেন। ইহার বহুল প্রচার আমি কামনা করি।

ইতি—

১২ই চৈত্র
১৩৮২

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
ভট্টপল্লী নিবাসী।

১। "এই সৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।"

গোপালদাস নাগ। ২৫শে বৈশাখ, ৯।৫।৭৫
(শ্রমমন্ত্রী—পশ্চিমবঙ্গ)

২। "আমারও অভিনন্দন রইল।"

ভোলানাথ সেন। ২৫শে বৈশাখ ১৩৮২
(পূর্তমন্ত্রী—পশ্চিমবঙ্গ।)

৩। "সব অঞ্চলেই এই রকম প্রচেষ্টা দেখা গেলে দেশ সত্যই লাভবান হবে"

গিরিজা মুখার্জি। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮২
(পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সদস্য।)

৪। "প্রত্যেক অঞ্চলে এই রকম সত্য ও তত্ত্ব ভিত্তিক ইতিহাস, দেশের

এবং দশের জ্ঞানের পথ-প্রদর্শক হইবে বলিয়া মনে আশা রাখি।

শ্রী দেবদাস ব্রহ্মচারী

১১।৫।৭৫

New Delhi—110057

16-11-75

৫। "একটি সামান্য গণ্ডগ্রাম, তার পুরাতন ইতিবৃত্ত, অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া তুমি যে বস্তু পরিবেশন করিলে তাহাতে তোমায় প্রত্নতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অতি সূক্ষ্মতম ঘটনাগুলির সমাবেশ, তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক, পারিপার্শিক, নৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার আভাষ, শুধু আভাষ নহে, বিশদ বর্ণনা, এমন কি গ্রাম্য ভাষা, ছড়া, কবিগানের ব্যবহার — উপযুক্ত স্থানে, পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।...... সুদূর ভবিষ্যতে সবই ধ্বংস হইবে। তবে যে পরিশ্রম তুমি করিলে তাহা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। রিষড়ার কৃতী সন্তানদিগের মধ্যে তুমি অন্যতম। ই'তি—

শ্রী বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

!! সংবাদপত্রে রিষড়ার বিভিন্ন চিত্র !!

১। রিষড়ায় দশ হাজার টাকা লুঠ। (সংবাদদাতা প্রেরিত) শ্রীরামপুর ১৫শে সেপ্টেম্বর—গত শনিবার সন্ধ্যায় জনবহুল রিষড়া জয়ন্তী সিনেমার নিকট জি, টি, রোডের উপর একটি বিস্কুট কোম্পানীর গাড়ী হতে দশ হাজার টাকা লুঠ হয়। সংবাদ পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে, তদন্ত চলছে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়নি। (যুগান্তর ২৬।৯।৭২)

২। আলোর অদ্ভুত রেশন। (ষ্টাফ রিপোর্টার) শিল্পাঞ্চল রিষড়ার একাংশে রাস্তার আলোগুলি রাত্রে নেভানো থাকে। কিন্তু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাতের নেভানো আলোগুলি ঠিক মতই জ্বলে অন্তত একমাস ধরে এই নয়া বিদ্যুৎ নীতিই চালু হয়েছে। ...... আঃ বাঃ ২৯।৪।৭৩

৩। রিষড়ায় পানীয় জলের সংকট। গরম পড়তে না পড়তেই রিষড়ায় সমস্ত পৌর এলাকায় পানীয় জলের সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। .... জল চাই, জল দাও- এই দাবি নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কয়েকবার বিক্ষোভও হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ...... আঃ বাঃ ২৬।৩।৭৩

৪। রিষড়ার শিল্পাঞ্চলে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ। (নিজস্ব সংবাদ দাতা) হুগলী, ২৩ সেপটেমবর ...... শিল্পসমৃদ্ধ উপনগরী রিষড়ায় ডাকঘর ছাড়া কোথাও পাবলিক টেলিফোন নেই। তাও শ্রীরামপুর একসচেনজ থেকে দিনের বেলায় কলকাতায় প্রায় লাইন পাওয়া দুঃসাধ্য। টেলিফোন অবশ্য মাসের মধ্যে ১৫ দিনই মৃত। আঃ বাঃ ২৪।৯।৭৩

৫। ট্রেনের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু :— অজ্ঞাতনামা এক যুবতী (৩৩) রিষড়া ষ্টেশনে লাইন অতিক্রমের সময় ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায়। জানা যায় যে, উক্ত স্ত্রীলোক তারকেশ্বর মন্দিরে জল দিয়ে যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন এই দুর্ঘটনা হয়। (যুগান্তর- ৫.৫।৭৪)
(শ্রী মণীন্দ্র আশের সৌজন্যে)

৬। রিষড়ায় পোষ্টম্যান ছুরিকাহত। চন্দননগর, ১৭ই এপ্রিল (ইউ, এন, আই) - আজ রিষড়ায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর ভাবে আহত এক পোষ্টম্যানকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কা-জনক বলে জানা গেছে। বিভিন্ন ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস থেকে মোট ৩০০৯ টাকা সংগ্রহ করে একটি সাব পোষ্ট অফিসে যাওয়ার পথে তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হন। তবে তাঁর ব্যাগের টাকা খোয়া যায়নি। এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। (যুগান্তর- ১৮।৪।৭৪)

৭। অগ্রদূত ব্যায়াম সমিতি (রিষড়া) গত ২১ ও ২২ জানুয়ারী আসরের বাৎসরিক উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে অরুণ বরুণ কিরণমালা নাটক অভিনীত হয়। এছাড়া হবেলা রবীন ভট্টাচার্য বিভিন্ন পশুপক্ষীর ডাকে ছোটদের প্রচুর আনন্দ দান করেন।
যুগান্তর- ২৭।২ ৭৩

সংযোজন।

পৃঃ ৩৬২ঃ রায়বাহাদুর কালীচরণ পাবড়াশীর বিবাহ হয়েছিল মাহেশ

নিবাসী ৺ জ্ঞানেন্দ্রলাল অধিকারীর মধ্যমা কন্যার সঙ্গে। সম্পর্কে তিনি ছিলেন সত্যচরণ শাস্ত্রী ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর (৮৮) মামাতো ভগ্নীপতি। রামদাস গড়গড়ী মহাশয় ছিলেন নৃপেন বাবুর মেসোমহাশয়। এই চক্রবর্ত্তী বংশের আদি নিবাস ছিল চাতরায়। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺ রাধ রমণ চক্রবর্ত্তী ছিলেন ডেনিশ গভর্ণমেণ্টের দাওয়ান। চাতরায় আনন্দময়ী ঘাটের পাশে (অনাথ আশ্রমের নিকট) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গঙ্গার ঘাট বর্ত্তমানে দাওয়ানজি ঘাট নামে পরিচিত।

পৃ. ৪৫২ মরুতীর্থ হিংলাজ, বশীকরণ, উদ্ধারণ পুরের ঘাট প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ সৃষ্টিকারী অবধূত মহাশয় (পূর্বনাম:— স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রযুক্ত দুলাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়) হলেন রিষড়ার জামাতা। তার বিবাহ হয়েছিল ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীট নিবাসী ডাঃ কিশোরী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুখময়ীর সঙ্গে। একটি মাত্র পুত্র সন্তান প্রসবান্তে সুখময়ীর মৃত্যুর পরেই তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন খিদির-পুর নিবাসী এবং কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারী, (শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোর সৌজন্যে)

পৃঃ ৪৫৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনা বিভাগে চাকুরী গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীট নিবাসী সর্বশ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। (অধুনা মৃত)

পৃঃ ৫২৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৈন্য বিভাগে চাকুরী গ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :— সর্বশ্রী বীরেন্দ্র নাথ দাঁ, দ্বিজপদ ঘোষ (এয়ার ফোর্স টেকনিক্যাল), দুর্গাপ্রসাদ লাহা ট্যাঙ্ক ব্রিগেড), গৌরীনাথ হালদার (এয়ার ফোর্স টেকনিক্যাল), ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরুদ্দেশ), নীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায, রাজারাম সিং (এয়ার ফোর্স- ওয়ারলেস বিভগ) রতন চন্দ্র মুন্সী প্রভৃতি।

পৃঃ ৬১৫ রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নওজোয়ান সংঘ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, দেয়ানজী ষ্ট্রীটস্থ শ্রী জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের মাঠে কবিগুরুর 'রক্তকরবী' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

তিনশতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র।

(অতিরিক্ত সংযোজন)

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকবৃন্দেব নিকট থেকে প্রাপ্ত কতকগুলি অভিমত এবং কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাব মধ্যে চিকিৎসক ও সঙ্গীত শিল্পী-দের তালিকাই সমধিক। বিংশ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ গবেষণা-কাবীদেব সুবিধাব জন্যে এই সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'বে রাখা ভাল, যদিও জানি আলোচ্য তালিকা বা বিবরণ অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে কারণ ইতিহাস নিয়তই চলমান এবং তাব গতি পরিবর্ত্তনশীল।

সংযোজন :- পৃঃ ৪২৪ঃ জার্মান সরকারেব সহযোগিতায় ২খানি অস্ত্র শস্ত্র ভর্ত্তি জাহাজ সংগ্রহেব মূলে ছিলেন শ্রীবামপুরের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী অগ্নীশ্বর জিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ী।

পৃঃ ৭২৩ঃ হায়দারাবাদ সেনা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সৈনিক মার্ত্তাজা সাহেবের আখড়ায় যাঁবা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, অসি চালনা প্রভৃতি শিক্ষালাভেব জন্যে যোগদান করেন যুবক জিতেন্দ্র নাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

পৃঃ ৪৩৮ঃ কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ ১৯৩৬।৩৭ সালে তাঁর চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং ১৯৩৯ সালে রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভার অনুদান লাভ করেন। উক্ত চতুষ্পাঠির ছাত্র সর্ব্বশ্রী- বিজয় ভূষণ হড় ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ও ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে।

পৃঃ ৪৩২ঃ রিষড়া উচ্চ ইংরাজী বিদালয় স্থাপন উপলক্ষে উৎসাহী ছাত্রদলের মধ্যে ৺অমর নাথ লাহার (কচি ডাক্তার) নামও উল্লেখযোগ্য।

পৃঃ ৪৬৪ঃ শ্রীগুরুদাস বন্দোপাধ্যায় বচিত "দুই স্বামী" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন রিষড়ার তদানীন্তন সকল নাট্য প্রতিষ্ঠানের

উদীয়মান অভিনেতাদের সহযোগে গঠিত "সার্ব্বভৌম" শিল্পী সংঘ (হলিডে ক্লাব নহে)। শ্রীরামপুর একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় "থানা থেকে আসছি" ও "শুধু ছায়া" নাটক অভিনয় করে এই সংঘের সভ্য শ্রীবাদল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরামপ্রসাদ পাত্র যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও সহ-অভিনেতার সম্মান লাভ করেন। ৩।৬।৭০ তারিখে উক্ত নাট্ট সংস্থা কর্ত্তৃক রিষড়ার শ্রীঅজিত বন্দোপাধ্যায় রচিত 'টাকা চাই' নাটকটী অভিনীত হয় এবং এই প্রসঙ্গে উক্ত নাট্ট সংস্থার তদানীন্তন সম্পাদক শ্রী জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বলাকা' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের রিষড়ায় প্রথম নাট্ট প্রতিযোগিতা সুরু করার জন্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

পৃঃ ৬০০ঃ উক্ত সার্ব্বভৌম শিল্পী সংঘের সভ্যবৃন্দ ১১।৬।৫৫ তারিখে রিষড়া মাতৃসদনের সাহায্যার্থে হেমাচন্দ্র দাঁ স্মৃতি মন্দিরে "আলমগীর" নাটক অভিনয় ক'রে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী স্মরণে "ছন্দম্" কর্ত্তৃক ১৯৭৩ (বাং ১৩৬৭) সালের ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর শ্রীরবীন্দ্র নাথ দাঁ মহাশয়ের উদ্যানে প্রবীন ও নবীন শিল্পী সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত নাট্ট উৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত নাট্ট শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ -

১। শ্রীহরেন্দ্রকুমার দত্ত ৭৫), ১৯১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্র হিসাবে 'আহেরিয়া' নাটক থেকে অভিনয় সুরু করে বহু অভিনয়ই তিনি করে এসেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। খেয়ালী নাট্য সংঘের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক।

২) শ্রীহেমন্তকুমার মল্লিক (৬৮) ইনি নাট্য শিক্ষক, পরিচালক, সু-অভিনেতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য রিষড়ার অভিনয় জগতে সুপরিচিত।

৩) শ্রীতিনকড়ি লাহা (৬৯) ইনি পেশাদার যাত্রাপার্টির

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করেন। প্রথম নাটক 'বভ্রুবাহন' অভিনয় করেন ১৯২২ সালে।

৪) শ্রীকাশীনাথ হালদার [৬১] ইঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। নাট্য জগতে প্রথম আবির্ভাব ১৯৩২ সালে-খেয়ালীনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'রাঙা রাখি'ও সাবিত্রী নাটকাভিনয়ে।

৫) শ্রীঅজিত বন্দোপাধ্যায়। তিনি বহু অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন নাটক, লিখেছেন গান। পরিচালনা করেছেন কয়েকখানি নাটক। নাট্য জগতে প্রথম আবির্ভাব ১৯৩৭ সাল।

৬) শ্রীবাদল চট্টোপাধ্যায়। সুদর্শন নট হিসাবে তিনি রিষড়ায় বহুদিন নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাট্য প্রতিযোগিতায় কয়েক বার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্ব্বে রিষড়ার বিশিষ্ট শিল্পীগণ কর্ত্তৃক ২০।৪।৬৩ তারিখে নাট্য শিল্পী শ্রীসুধীর কুমার দত্তের (অধুনা মৃত) সম্মানার্থে ডি. এল. রায়ের "মেবার গৌরব" নাটকটি অভিনীত হয়।

পৃঃ ৪৭৫ঃ জলপথে মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে শ্রীসুশীল কুমার চক্রবর্ত্তীর (ভ্রান্তি) নামও উল্লেখযোগ্য। [শ্রীঅভয় পদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট রক্ষিত আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য]

পৃঃ ৬৭৫ঃ দূর পাল্লার সাইকেল ভ্রমণে অংশ গ্রহণকারীদের তালিকায় নিম্নলিখিত ভ্রমণকারীদের নামও উল্লেখনীয়ঃ—

ডিসেম্বর- ১৯৭৩ঃ মুর্শিদাবাদ- সর্বশ্রী সমর বন্দোপাধ্যায়, কমলাকান্ত ঘোষাল ও সন্দীপ দত্ত।

৫।১২।৭৬ঃ ভারত-নেপাল মৈত্রী সফর—

শ্রীঅমর বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্ব্বশ্রী নিমাই দাস, কাশীনাথ পাল, ননী দত্ত, অনিল দাস এবং জিতেন সেনগুপ্ত সাইকেল যোগে প্রায় ১২০০ মাইল পরিভ্রমণ করে ২৩।১২।৭৬ তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাঠমুণ্ডস্থ ভারতীয় রাষ্ট্র দূতের পক্ষ থেকে এই দলকে

যথেষ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদত্ত হয় এবং এই দুঃসাহিসক কার্যের জন্য প্রত্যেককে প্রশংসা পত্রও দান করা হয়। এই সফরের বিবরণ ২৬।১২।৭৬ তারিখের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ৫২৩- সঙ্গীত সমাজ। প্রাক্তন পৌরসভাপতি ৺সুশীল চন্দ্র আওন, ৺শম্ভু চরণ মান্না, সুরশিল্পী শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল, শ্রীহৃষিকেশ দত্ত ও কতিপয় সঙ্গীত-পিপাসু ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় এবং ৺শম্ভু দাস মান্না ও সর্বশ্রী সুধীর কুমার মণ্ডল ও প্রমোদ কুমার দত্তের পরিচালনায় 'রিষড়া বাণী মন্দিরের" প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৪৪ সালে। পরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে ১৩৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রিষড়া সঙ্গীত সমাজ', উচ্চাঙ্গ ও ধর্ম সঙ্গীত অনুশীলনই হল এই সঙ্গীত সমাজের লক্ষ্য।

৺সুশীল চন্দ্র আওন, সর্ব্বশ্রী প্রসাদ বসু, শরৎ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বিখ্যাত তবলিয়া শ্রীহীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী (হীরু বাবু) ও সঙ্গীতজ্ঞ সন্তোষ কুমার রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পর পর পাঁচটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীগণ অধিবেশনগুলি অলঙ্কৃত করেন সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

সঙ্গীত সমাজের সভ্যরা 'কালী—কীর্ত্তন, 'দশমহাবিদ্যা' 'একাদশ মাতৃকা' ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী গীতি কাব্য বিভিন্ন স্থানে অর্দ্ধশতাধিকবার পরিবেশন ক'রে সুনাম অর্জন এবং রিষড়ার মুখোজ্বল করেন। প্রেম মন্দিরের অধ্যক্ষ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ১৩৪৫ সালে তাঁর মাতার নামাঙ্কিত 'শৈলনন্দিনী' পদক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উপহার দেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সরস্বতী-প্রতিমা, গানও তুবড়ী প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়।

॥ ন বিদ্যা গীত-বিদ্যাচ ॥

কোলাহলও কণ্ঠস্বর, সঙ্গীত ও কণ্ঠস্বর। কোলাহলের মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, নেই কোন ছন্দঃ বা একতানতা; সঙ্গীতে এর সবগুলিই

বর্ত্তমান। সঙ্গীত বলতে আমরা বুঝি লয়-যতি-ছন্দ যুক্ত একটি বিশিষ্ট সুরের সমাবেশ ও শৃঙ্খলার রূপায়ন। সঙ্গীত বিদ্যার সঙ্গে পূর্বে ছিল আধ্যাত্মিকতার সংযোগ এবং সঙ্গীত চর্চ্চার মাধ্যমে খানিকটা প্রাণায়াম ক্রিয়াও সম্পন্ন হত। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে গীত, বাদ্যও নৃত্য এই ত্রয়ীকে সঙ্গীতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পূর্বের ন্যায় বর্ত্তমানেও রিষড়াতে সঙ্গীত চর্চ্চার ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিতই হচ্ছে। অনেকে অবশ্য বলেন যে আধুনিক বাংলা গানে সুরের খেলা আছে সত্যি কিন্তু তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ আছে কতটুকু তা বলা শক্ত।

এই প্রসঙ্গে রিষড়ার কয়েকজন সঙ্গীত শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল।

১। শ্রী সুধীর কুমার মণ্ডল :- ইনি ওস্তাদ দৌলত রামের প্রধান ছাত্র ওস্তাদ সতীশ চন্দ্র ঘোষ (শোথ্না), মালিহাটী নিবাসী ওস্তাদ তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও ৺তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-গণের ছাত্র। ইনি বহু গানের সুর ও স্বর-লিপিকার। সঙ্গীত ছাড়াও ইনি ফুটবল খেলা ও দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

২। সর্ব্বশ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন বসু ও ধনঞ্জয় লাহা (সংগীত বিশারদ)। এঁরা তিন জনেই ৺সত্যেন ঘোষালের শিষ্য শ্রীউপেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের ছাত্র এবং এঁদের প্রত্যেকেই সঙ্গীত বিষয়ে বিশেষ সুনামে অধিষ্ঠিত। শ্রীধনঞ্জয় লাহা অধুনা সঙ্গীত শিল্পী শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শিক্ষা লাভ করে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন।

(সঙ্গীত সমাজের সৌজন্যে)

৩। শ্রীভবেশ চট্টোপাধ্যায়- ইনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এই দুই বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। এঁর সঙ্গীত জীবনের প্রথম গুরুদেব হলেন শ্রীকৃষ্ণ কুমার ঘোষ। বর্ত্তমানে ইনি সর্ব্বশ্রী উপেন্দ্র নাথ ঘোষ, সুবিনয় রায় ও অজয় কুমার মৈত্র মহাশয়গণের

শিক্ষাধীন আছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ইনি প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞান-পত্র লাভ করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে রিষড়ায় "গীত ও ছন্দ" নামে একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতাধিক।

৪। শ্রীগোপী কিশোর দাঁ। সংগীত শিক্ষার হাতে খড়ি হয় তাঁর পিতা ৺শশীভূষণ দাঁর নিকটে। এঁদের বাড়ীতে বহু খ্যাতিমান সংগীত শিল্পীর শুভাগমন ঘটে এবং সংগীত আসরও অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইনি বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ কুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট রবীন্দ্র সংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা লাভ করেন এবং কিছু দিন স্বনামখ্যাত শ্রীপঙ্কজ মল্লিক মহাশয়ের নিকটও রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষা করেন। পরে ইনি সংগীতাচার্য সত্যেন ঘোষালের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীউপেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট (কোতবং) খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার. ঠুম্‌রী, ভজন, ইত্যাদি শিক্ষালাভ কবেন।

ইনি উত্তরপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ গীটার বাদক ও বেতার শিল্পী শ্রীনীল রতন চন্দ্রের বাটীতে 'ছন্দ বিতান' নামক সংগীত প্রতিষ্ঠানে সংগীত শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ইনি কয়েকটি গীতি নাট্য ও নৃত্য-নাট্যে সুর সংযোগ ও সংগীত পরিচালনা ক'রে সুনাম অর্জন করেন। রিষড়া নিবাসী তাঁর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ও রবীন্দ্র সংগীতে কলকাতা রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "এম, এ, ইন মিউজিক' উপাধি লাভ করে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং অনেকে 'সংগীত প্রভাকর' ডিগ্রীও লাভ করেছে। শ্রীরাম-পুরের প্রসিদ্ধ দে বংশ ও বালীর সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীতারাপদ সাউয়ের বাড়ীর কন্যারা তাঁর ছাত্রীদের অন্যতম। বালী জুট মিলের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসুধীর কুমার দত্তের পুত্র শ্রীমান অরুণাভ দত্ত তাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করে কলকাতা টেলিভিসনের (দূর দর্শন) শিশু বিভাগে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে।

নিজ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীতা' নামে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহু ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদান করে থাকেন এবং স্থানে স্থানে ছাত্রছাত্রী সমন্বয়ে শ্যামা-সঙ্গীতও পবিবেশন করে থাকেন। তাঁর কৃতী ছাত্রছাত্রীব সংখ্যা শতাধিক।

৫। শ্রীসুকুমার সেন (মোড় পুকুব)। ইনি প্রথমে গিবীজা ভূষণ চক্রবর্ত্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নাগেশ্বব বাও, রবিশঙ্কর, পণ্ডিত বতন ঝঙ্কাব প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীত (ধ্রুপদ, ধামাব, খেয়াল) এবং জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবেব নিকট ঠুমবি শিক্ষা কবেন। ইহা ছাড়াও কিছুদিন শ্রীহরিদাস কর মহাশয়ের নিকট কীর্তন শিক্ষা কবেন। লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ থেকে ইনি সঙ্গীত বিশাবদ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৬৫।৬৬ খৃঃ রিষড়ায় 'সুব-ঝঙ্কাব' নামক মিউজিক কলেজ (ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও তাঁহাদেব প্রবর্ত্তিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী) স্থাপন কবেন। এই কলেজ কর্ত্তৃক বাৎসবিক পবীক্ষাব ফলাফল অনুয়ায়ী 'সঙ্গীত বিশারদ' পর্যন্ত উপাধি প্রদত্ত হয়ে থাকে। বর্ত্তমানে সেন মহাশয় উক্ত কলেজেব অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

মাহেশের 'ছন্দশ্রী' নামক সঙ্গীত কলেজেরও তিনি অধ্যক্ষ। এই কলেজটি এলাহাবাদের 'প্রয়াগ সমিতি' কর্ত্তৃক অনুমোদিত। শ্রীরামপুর 'সুর-ঝঙ্কার' মিউজিক কলেজেরও (লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডের অনুমোদিত। অধ্যক্ষ পদে তিনি অধিষ্টিত আছেন। মধ্যে মধ্যে কলকাতা বেতাবেও সংগীত পরিবেশন কবে থাকেন। ১৯৭৬ খৃঃ তিনি উক্ত ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠ কর্ত্তৃক কলকাতা ও মেদিনীপুব মহিষা গোটের সংগীত কলেজের বাৎসরিক সংগীত পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। রিষড়া 'সুর-স্মরণীর' শিক্ষক হিসাবে তাঁর নাম ৫২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে।

উপরোক্ত কয়েকজন সংগীত শিল্পী ছাড়াও রিষড়ায় আরও

দু' একজন সঙ্গীত শিল্পী আছেন যাঁরা সাধারণতঃ যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যানুষ্ঠানে 'বিবেক' বা 'চারণের' ভূমিকায় বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করে থাকেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী বলাই দত্ত, কাশীনাথ দত্ত ও হেমন্ত দত্ত প্রভৃতি।

তবলা ও সেতার শিল্পী।

কণ্ঠ সঙ্গীতের মত যন্ত্র সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভও বহু আয়াস ও সাধন-সাপেক্ষ। সেতার শিল্পী হিসাবে শ্রীমহাদেব সিংহ বর্মন ও শ্রীমতী গঙ্গামাটি দত্ত সাধু) একই গুরুর কাছে অর্থাৎ ওস্তাদ অপরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং সুনামে প্রতিষ্ঠিত হন। দু-জনেই বেতার শিল্পী। গঙ্গামাটি দত্ত মহিলা বেতার শিল্পী হিসাবে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন, মহাদেব বাবু বর্ত্তমানে পাটনা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং শিক্ষকতাও করেন। তিনিও বিশেষ সুনামে প্রতিষ্ঠিত। (সঙ্গীত সমাজের সৌজন্যে)।

সেতারি হিসাবে শ্রীহেমন্ত কুমার চক্রবর্ত্তীর নামও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এ ছাড়া অন্যান্য তারের যন্ত্রে অনুশীলনকারী রয়েছেন কয়েকজন। তাঁদের সাধনাও প্রশংসাযোগ্য।

সঙ্গীতকে (নৃত্য ও গীত) তালে ও লয়ে প্রতিষ্ঠিত করা সঙ্গতের প্রধান কার্য। অভিজ্ঞবাদকের সহযোগিতায় সংগীত মাত্রই উৎকর্ষতা লাভ করে এবং শ্রুতিসুখকর হয়ে উঠে একথা সর্বজন বিদিত।

গত ৫০ বৎসর ব্যাপী তবলা সঙ্গতে নিবিষ্ট আছেন রিষড়া নবীন চন্দ্র পাকড়াশী লেন নিবাসী ৺গিরীশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী পাঁচুগোপাল পাল। তাঁর পূর্বে রিষড়ায় ৺মনিকেশ দত্ত ও ৺নন্দ কিশোর লাহা তবলায় লব্ধ প্রতিষ্ঠা

ছিলেন। পাঁচু বাবু উক্ত দুজনের কাছেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তারপর ভুঁদি মিশ্র ও লক্ষ্ণৌএর আবেদ হোসেন খাঁর সুযোগ্য শিষ্য খড়দহ নিবাসী শ্রীশরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করেন এবং পারদর্শিতা লাভ করেন।

তাঁর তালিমের প্রথম গুরু হলেন কলকাতা জোড়াসাঁকো নিবাসী ৺নগেন্দ্র নাথ দত্ত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হলেন যথাক্রমে কোন্নগর নিবাসী ৺সত্যেন ঘোষাল ও হাওড়ার বিখ্যাত টপ্পা গায়ক ৺কালীপদ পাঠক মহাশয়গণ।

পেশাদার তবলা-বাদক হিসাবে তিনি কোন্নগর ওয়েল মিলের সত্বাধিকারী শ্রীফুলচাঁদ ভকতের গায়ক পাটনার বিখ্যাত ওস্তাদ গোপীনাথ মিশ্রের সঙ্গে সঙ্গত করেন দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল। স্থানীয় ও বহিরাগত সঙ্গীত শিল্পীদেব সঙ্গে সঙ্গত করতে তাঁর সহযোগিতা ছিল এক প্রকার অপরিহার্য।

রিষড়ার প্রায় প্রত্যেকটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন এবং যাত্রা ও থিয়েটার ক্লাবেও তিনি তবলা সঙ্গতে অংশ গ্রহণ করেন। রিষড়া প্রেম মন্দিরে অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি সঙ্গীতানুষ্ঠানেও তিনি দীর্ঘকাল তবলা সংগত করে আসছেন। রিষড়া শ্রীরামপুর, মাহেশ, কোন্নগর ও জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁর বহু ছাত্র বিদ্যমান। এঁদের মধ্যে রিষড়ার শ্রীপ্রমোদ কুমার দত্ত ও নিজ পুত্র শ্রীপান্নালাল পালের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রমোদ বাবু পাঁচু বাবুর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর বেনারসের বিখ্যাত ওস্তাদ ঠাকুর শঙ্কর সিংহ মহাশয়ের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ইনিও বহু সংগীত শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গতে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীপান্নালাল পালও দীর্ঘদিন পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করে তবলা ও 'বঙ্গ-বাজনায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীআজিজের নামও

উল্লেখযোগ্য। ইনিও দীর্ঘকাল বহু সংগীত শিক্ষার্থী ও সংগীত শিল্পীর সঙ্গে তবলা সঙ্গতে সহযোগিতা করে আসছেন।

শ্রীকল্যার্ণ দত্ত ১৯৬৬ সালে তবলায় সঙ্গীত বিশারদ ও ১৯৬৮ সালে সঙ্গীত প্রভাকর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইনি শ্রীশরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র। শ্রীদিলীপ কুমার মণ্ডল ১৯৬৮ সালে তবলায় প্রথম বিভাগে সঙ্গীত প্রভাকর পরীক্ষা খুবই সুনামের সঙ্গে পাশ করে অধুনা কলকাতা ও মফঃসলে সরকার অনুমোদিত স্কুলে, বহু প্রতিষ্ঠানে এবং রেডিও ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠীতে নিয়নিত অনুষ্ঠান করে থাকেন। ইনি ওস্তাদ কেরামত খান, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ডক্টরেট যামিণী ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মুবারি মোহন দাস মহাশয়গণের ছাত্র।

গোবরডাঙ্গা নিবাসী, অধুনা রিষড়ার স্থায়ী বাসিন্দা শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন কৃতি পাখোয়াজ ও তবলা শিল্পী। তাঁর শিক্ষা গুরু হলেন কলকাতা ঝামা পুকুর নিবাসী ৺দুর্লভ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইনি সাধক প্রকৃতির লোক ছিলেন।

॥ সঙ্গীত বিদ্যালয় ॥

পৃঃ ৪৯১ঃ বাঙ্গুর পার্কে বন্দনা দেবী শুধুমাত্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার অর্থানুকূল্যে এবং পরিচালনায় বন্দনা আশ্রমে একটি সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টীর নাম দেওয়া হয় রজনী ব্রহ্ম বিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় বালিকারা উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সংগীত ও নৃত্যকলা শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করে এবং কয়েকটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। (শ্রীঅক্ষয় কমার বন্দ্যোর সৌজন্যে)

॥ রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাব ॥

পৃঃ ৪৯৬ঃ রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বহু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ক'রে সুনাম ও পুরস্কার লাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :- ১৯২৮ সালে তারকেশ্বরে টুনু মেমোরিয়াল ট্রফি লাভ। ১৯৩০ সালে শ্রীরামপুর কুঞ্জ বিহারী শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার পর ১৯৩৪ সালে আড়িয়াদহকে পরাস্ত ক'রে ইউনিক কাপ জয় করেন। ১৯৪৭ সালে দি রিষড়া ক্লাব প্রযোজিত সোনার-বাংলা শীল্ড প্রাপ্ত হন। ১৯৫২ সালে তাঁরা কোন্নগর শীল্ড, ভদ্রকালী শীল্ড, জগন্নাথ স্পোর্টিং এর অসীম কুমার শীল্ড এবং সোনার-বাংলা শীল্ড বিজয়ী হন। এই ক্লাবের সভ্য শ্রীসত্য প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হলেন শ্রীরামপুর মহকুমা স্পোর্টস এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যেরা আলিপুরদুয়ার, মুর্শিদাবাদ, পলাশী, শান্তি-পুর, কুলটি, ঝরিয়া, ধানবাদ, জলপাইগুঁড়ি, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৩ সালে ইছাপুর টুল্‌সের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে চন্দননগর কাপ প্রাপ্ত হন।

তৎকালীন খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন :- ৺দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য, ৺আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৺শৈল রায়, ৺যোগেশ মুখোপাধ্যায় এবং সর্বশ্রী হীরালাল দে, সত্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবতী বন্দ্যোপা-ধ্যায়, সুধীর কুমার মণ্ডল, হীরালাল ঘোষ, রাধাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শিবদাস নিয়োগী, বিজয়ভূষণ হড়, বিজয় কিশোর গড়গড়ী প্রভৃতি।

॥ দি রিষড়া ক্লাব কর্ত্তৃক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ॥

পৃঃ ৪৯৮ঃ উক্ত ক্লাব কর্ত্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় জীবনে শিক্ষার স্থান' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রীরামপ্রসাদ পাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-পদক প্রাপ্ত হন।

গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে শ্রীমতী ছায়া চ্যাটার্জী (শ্রীঅজিত বন্দ্যোর কনিষ্ঠা ভগিনী) এবং শ্রীমতী ইন্দুলেখা গাঙ্গুলী (ভট্টাচার্য)। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসজনী কান্ত দাস ও শ্রীমনোজ বসু।

॥ স্বয়ং সম্পূর্ণতার পথে রিষড়া ॥

পৃঃ ৬৭৮ঃ একদিকে যেমন নূতন নূতন ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, প্রেস, পেট্রোলপাম্প, খেলার প্রশস্ত মাঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রিষড়া প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে তেমনই বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসকদের আবির্ভাবে দেশবাসী অনেক সুবিধা লাভের সুযোগ পেয়েছেন।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা করলেও অর্থাৎ বহু নামী ও দামী টুথ পেষ্ট, ক্রীম, মাজন, ব্রাস প্রভৃতি ব্যাবহার করলেও দাঁতের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে অনেকেই এর আগে ছুটতেন হয় কলকাতা না হয় শ্রীরামপুরে,। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটতে শুরু করে ১৯৬৭ সাল থেকে। এই সালেই রিষড়া বিদ্যাপীঠের প্রথম যুগের ছাত্র শ্রীকমল পাণ্ডে (পিতা শ্রীগোরক্ষ নাথ পাণ্ডে গাজীপুর থেকে রিষড়ায় আসেন প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে) দন্ত চিকিৎসক হিসাবে পাশ ক'রে ডাঃ আর আহম্মদ ডেণ্টাল কলেজের হাউস সার্জেন হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। তারপর কোন্নগর মাতৃ সদন ও রিষড়া সেবা সদনেও তিনি কিছু দিন অবৈতনিক দন্ত চিকিৎক

হিসাবে কার্য করেন। বর্ত্তমানে কোন্নগর পৌরসভা পরিচালনাধীন দন্ত চিকিৎসা বিভাগের অধিকর্তা। রিষড়া জি, টি, রোডে তিনি যে ডিস্পেনসারী খুলেছেন সেখানে এখন দেখা যায় সকাল সন্ধ্যায় 'গালফোলা গোবিন্দর মা' থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর রোগীদের ভীড়।

প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্বে রিষড়ায় 'ডেণ্টাল মেকানিক' হিসাবে শ্রীসুশীল কুমার দাঁ প্রথমে নিজ বাড়ীতে তারপর জি, টি, রোডে দাঁত বাঁধাই ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ১৫।১৬ বৎসর এই কার্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি এখন অন্য ব্যবসায়ে হাত দিয়েছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কণ্ঠ সঙ্গীতে ছিল তাঁর অনুরাগ। তাঁব স্ত্রী কনিকা দে (বর্ত্তমানে কল্যাণী দাঁ) বিবাহের পূর্বে একনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করেন— রাধারাণী, কমলা ঝরিয়া কাজী নজরুল প্রভৃতির কাছে এবং সেই সময় '।মলন রাতি ভোর হল গানটি মেগাফোনে রেকর্ড করেন। বেতারেও গাইতেন মাঝে মাঝে। বর্ত্তমানে সংসার ধর্মে মেতে থাকলেও তিনি কীর্ত্তন স গীতে রিষড়ার মহিলা শিল্পীদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

॥ রোগও যত ডাক্তারও তত ॥

রিষড়ার ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রিষড়ায় পাশ করা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের নাম এক আঙ্গুলে গোনা যেত। আজ কিন্তু স্থানীয় ও নবাগত চিকিৎসকদের সংখ্যা দু' হাতের সবকটা আঙ্গুলে গুণেও শেষ করা যায় না। কথায় বলে 'শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্'। সাধু মহাত্মা থেকে আরম্ভ করে বিশিষ্ট ব্যাক্তিরাও আধিব্যাধির আক্রমণ থেকে রেহাই পান না। ছেলে পুলে আজকাল যেন রোগের বালাই নিয়ে জন্ম নেয়। তাই বোধহয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ব্রতচারীদের নৃত্যের ছন্দে গাইবার জন্যে গান বেঁধেছিলেন—

„চল্ কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই……… যত ব্যাধির বালাই বলবে পালাই পালাই” ইত্যাদি। শিশু চিকিৎসার টোট্‌কা দাওয়াই আজ আর কাজে লাগে না, তাই হোমিওপ্যাথিক এ্যালোপ্যাথিক সবরকম চিকিৎসারই শরণাপন্ন হতে হয়। অথচ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ঘরে ঘরে খাদ্যেপচন নিবারক যন্ত্র, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষেধক চিকিৎসা, খাবারের দোকানে মশামাছি নিবারক গ্লাসকেস রাখার বাধ্য বাধকতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া সত্বেও নিত্য নূতন নূতন রোগ ও তার ঔষধের তালিকা অসংখ্যই বল্লেই চলে।

রিষড়ার কয়েকজন যুবক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পাশ করার পর চলে গেছেন বিলাতে বা অন্যদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভ এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়। এই শ্রেণীর কয়েকজনের নাম ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। নূতন গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — শ্রীরমেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা)। ইনি এম, বি, বি, এস পাশ করার পর বিলাতে এম, ই, আই; ডি ফিস; আর, সি, পি, এস, প্রভৃতি ডিগ্রী লাভ করেন এবং বর্ত্তমানে ল্যাঙ্কাষ্টার হাসপাতালের সংগে সংযুক্ত আছেন।

দ্বিতীয় হলেন দেওয়ানজী বংশের শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ কল্যাণ মুখার্জী। ইনি ১৯৬৫ সালে কলকাতা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস ডিগ্রী লাভ করার পর চলে যান বিলাতে। সেখানে ১৯৭২ সালে ডাবলিন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক’রে ডি, জি, ও এবং ১৯৭৩ সালে ডাবলিন রটুণ্ডা থেকে ‘এল, এম’ উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে ইংল্যাণ্ডের **Royal College of Gynaecologist and Obstetrician** থেকে ‘এম, এফ, পি, এ’ ডিগ্রী প্রাপ্ত হন।

বর্ত্তমানে তিনি ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ড মন্টেগু হাসপাতালে 'রেজিষ্ট্রার-ইনচার্জ' পদে অধিষ্ঠিত আছেন

রিষড়ার মহিলারাও চিকিৎসা বিদ্যালাভে পিছিয়ে নেই। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উক্ত দেওয়ানজী বংশের শ্রীসুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী চৈতালী মুখার্জী। ১৯৭৫ সালে এম, বি, বি, এস ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি এখন কলকাতা নীল রতন সরকার (এন, আর, এস। হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের হাউস সার্জেন। তাঁর স্বামী হলেন মৈমনসিং নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। গঙ্গোপাধ্যায়) মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীঅরুণ কুমার ভট্টাচার্য (এড্‌ভোকেট-চুঁচুঁড়া)।

রিষড়ার বাইরেও রয়েছেন একজন মহিলা চিকিৎসক। অধুনা দিল্লী প্রবাসী শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা (ডাঃ নারায়ণ ব্যানাজির ভ্রাতু পুত্রী) শ্রীমতী সুপ্রিয়া বন্দোপাধ্যায় (ভাদুড়ী। ১৯৬৯ সালে দিল্লী লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, এস পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৯৭৪ খৃঃ **Obstetries** এবং **Gynaecology** তে এম, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। বর্ত্তমানে দিল্লীতে উইলিংডন হাসপাতালে ওবস্‌ট্রেটিকস্ এবং গাইনাকোলেজি বিভাগে জুনিয়র স্পেসালিষ্ট পদে কর্মরত আছেন। স্বামী হলেন ডাঃ অমিতাভ ভাদুড়ী, পি, এইচ, ডি, দিল্লীতে ভারত সরকারের অধীনে একজন সিনিয়র সায়েনটিফিক অফিসার।

মহিলাদের মধ্যে এর পর উল্লেখযোগ্যা হলেন শ্রীগীতা পূজারী। ১৯৪৮ সালে জন্মের পর থেকে শিক্ষা দীক্ষা সবই রিষড়ায়। পিতা শ্রীভগবান পূজারী বর্ত্তমানে রিষড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। শ্রীমতী গীতা ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যদের প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে হুগলী জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৬৬ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হন। ১৯৭৪ সালে কলকাতা আর, জি, কর

মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস, পরীক্ষায় পাশ করেন। অধুনা তিনি নারিকেলডাঙ্গা বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল শিশু হাসপাতালে শিশু চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত আছেন।

এর পর আরও কয়েকজন ডাক্তারী পাশ করে স্বগ্রামে চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলেন বাঙ্গুর পার্ক বিবেকানন্দ রোড নিবাসী শ্রী কালীচরণ আশের পুত্র শ্রীঅমিত আশ। ইনি ১৯৬৮ সালে আর, জি, কর, মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি; বি, এস ডিগ্রী লাভ করার পর কলকাতা মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে কার্য করার পর বর্ত্তমানে নিজ বাড়ীতে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেছেন।

দ্বিতীয় হলেন শ্রীতারাপদ চন্দ্রের পুত্র ডাঃ সন্দীপ চন্দ্র। রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ইনিও আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭২ সালে এম, বি, বি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর চার বৎসর কাল উক্ত হাসপাতালে হাউস ষ্টাফ্ হিসাবে কার্য করার পর বর্ত্তমানে নবীন পাকড়াশী লেনে নিজ বাসভবনে চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলেছেন।

আরও একজন চিকিৎসক কিছুদিনের মধ্যেই স্বগ্রামে অধিষ্ঠিত ও হবেন; তিনি হলেন এন, কে, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীশম্ভুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৮ সালে রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে লেটার সহ পাশ করেন। ১৯৭৫ সালে কলকাতা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ থেকে ফিজিওলজি, প্যাথলজি ও মেডিসিনে অনার্স সহ এম, বি, বি, এস পরীক্ষায় পাশ করার পর বর্ত্তমানে উক্ত কলেজে মেডিসিন ওয়ার্ডে সিনিয়র হাউস ফিজিসিয়ান রূপে কর্মরত আছেন।

কর্মচারী রাজ্য বীমা আইনানুসারে রিষড়ায় ১৯৬৫ খৃঃ

এমপ্লয়ীজ ষ্টেট ইন্সিওয়েন্স প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে কারখানা সমূহের কর্মীদের চিকিৎসার একটা নূতন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে দেয় চাঁদার পরিবর্ত্তে বীমাকারী শ্রমিকরা এখন বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন; যদিও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে চিকিৎসক ও রোগী উভয় শ্রেণীরই নালিশের অন্ত নেই। চিকিৎসকদের উপর রোগীর চাপ সৃষ্টি হওয়ায় সাধারণ রোগীদের ঘটেছে কিছুটা অসুবিধা ও অন্তরায়। উক্ত প্রকল্প অনুযায়ী একটি স্থানীয় অফিসও খোলা হয়েছে জি, টি, রোডের ধারে সাধুখাদের বাড়ীতে।

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়াও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রও খোলা হয়েছে স্থানে স্থানে। শীতলাতলা লেনে ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গনে শ্রীললিত মোহন হড়ের উদ্যোগে তাঁর স্বর্গীয়া মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে 'তরুবালা-স্মৃতি-হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে' উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৬৯ সালের ৯ই মার্চ তারিখে। ডাঃ মানিক চন্দ্র মুন্সী চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণ করেন।

রিষড়া অনাথ আশ্রমের পরিচালনায় হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ১৪।৭।৭৪ তারিখে শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। ডাঃ তারক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় ছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন পাশ করা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— শ্রীশুভেন্দু পাল, শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

॥ প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ॥

শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সিপ্রা (মুখোপাধ্যায়) ১৯৫২ সালে শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বেথুন কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৫৪ সালে আই, এ, পরীক্ষায়

কলেজ ছাত্রী গণের মধ্যে ইংরাজীতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় বিশেষ সম্মান সূচক বেথুন পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৬ সালে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ, পাশ করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষ্য কার্যে রত আছেন। ১৯৬৯ সালে প্রথম শ্রেণীতে, বি, টি, পরীক্ষাও পাশ করেছেন। শ্রীমতী সুষমা গাঙ্গুলী বি, এ, পাশ করেন ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া কলেজ থেকে।

॥ নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা ॥

গত ১০ই বৈশাখ ১৩৮৪ শনিবার যথাবিধি যাগ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে রিষড়া শীতলাতলা লেনে শ্রীললিত মোহন হড়ের উদ্যোগে তদীয় জননী তরুবালা দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হয়। বহু সজ্জন মণ্ডলী উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

পৃঃ ৪৬৮ঃ- ১৯২৭ সালের দৌড় প্রতিযোগিতায় শ্রীপ্রশান্ত কুমার দাঁর পরিবর্ত্তে শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাঁর নাম হবে।

পৃঃ ৬৭৬ঃ- বীমা বিশেষজ্ঞ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর তারিখ ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ (১৯৭০ নহে)।

পৃঃ ৩ (অতিরিক্ত সংযোজন) মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ কারীদের তালিকায় শ্রীসুশীল কুমার চক্রবর্ত্তীর নাম ৪৭৫ পৃঃ উল্লিখিত আছে। এখানে ৺শীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম হবে।

—০—

"যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যতদিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্ ধূলার মাঝে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৪,
রিষড়া।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী।

শ্রীসন্দীপ দেব সম্পাদিত 'বন্ধু' পত্রিকার মাঘ- ১৩৮৩ সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ দুটি প্রকাশিত হয় :—

॥ ভলিবলে সাফল্য ॥

রিষড়া স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৭৫-৭৬ বর্ষে হুগলী জেলা ভলিবল ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জেলা ভলিবল প্রতিযোগীতায় প্রথম বার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া রানার্স আপ হইয়া দ্বিতীয় বিভাগে উন্নীত হইয়াছে। তাহাদের সাফল্যে আমাদের অভিনন্দন।

॥ গঙ্গাবক্ষে পাঁচ মাইল ব্যাপি বিরাট সন্তরণ প্রতিযোগিতা ॥

গত নভেম্বর মাসে রিষড়া সুই-ই-জিম ক্লাবের পরিচালনায় গঙ্গাবক্ষে রিষড়া হইতে চাতরা পর্যন্ত পাঁচ মাইল ব্যাপী সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর নালীকুল সুইমিং ক্লাবের শ্রীআশীষ দাস এবং রিষড়া সুইমিং ক্লাবের শ্রীহিমাদ্রি পাল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অনুষ্ঠানটি ক্লাবের পরিচালনায় সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন হয়।

॥ শেষ সংবাদ ॥

দন্ত চিকিৎসক হিসাবে শ্রীনীহার দাঁর (শ্রীরবীন্দ্র নাথ দাঁর কনিষ্ঠ পুত্র) নামও উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি কলকাতায় চেম্বার খুলেছেন, বর্ত্তমানে স্বগ্রামে সপ্তাহে রবিবার দিন বসছেন বাঙ্গুর পার্কে রোগী দেখার জন্য। অচিরে তিনি একজন সুচিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

॥ কয়েকটি অভিমত ॥

১। বেতার জগৎ (১ – ১৫ জুন, ১৯৭৬)

তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র— কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী। প্রকাশক : রিষড়া সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ, প্রেমমন্দির, ৫; শ্রীমানী ঘাট লেন, রিষড়া, হুগলী। দাম ১০ টাকা

রিষড়া হুগলী জেলার প্রাচীন স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। কেবল ভারতের প্রথম চটকল স্থাপনের জন্যই নয়, একদা গ্রীক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। সেই গ্রামের তথা শ্রীরামপুর মহকুমার, বহু প্রামানিক তথ্য সংগ্রহ করে লেখক আঞ্চলিক থেকে বৃহত্তর বাংলার বিগত তিন শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিপাশিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। গ্রাম্য ভাষা ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, কবিগান, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির অপূর্ব সমাবেশ পুস্তকটিকে সুখপাঠ্য ও সমৃদ্ধিশালী করেছে। সুধীর কুমার মিত্রের বহু তথ্যে সমৃদ্ধ ভূমিকাটি এই পুস্তকে একটি অমূল্য সংযোজন। বহু চিত্র শোভিত তিন শতকের রিষড়া সহজ সরল ভাষায় রচিত হলেও ছাপা ও কাগজ নিম্নমানের হওয়ায় বইটির সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রকাশক মুদ্রণ পারিপাট্যের দিকে একটু নজর দিলে বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে গ্রন্থটি এই আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষকদের সাহায্য করবে এবং স্থানীয় ব্যক্তিও এ গ্রন্থ পাঠে আনন্দলাভ করবেন।

রামকৃষ্ণ মিত্র

২॥ পল্লীডাক : ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৬। . .... রিষড়া ৩৫নং দেওয়ানজী ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী মহাশয় দুই খণ্ডে "তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র" নামে যে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন সেই ইতিহাস রচনার প্রেরণা ও অনুরাগী হিসাবে গ্রন্থখানি প্রাণাধিক পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। দীর্ঘ পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও নিরলস গবেষণা প্রসূত এই গ্রন্থখানি কেবল মাত্র রিষড়া কেন, রিষড়া শ্রীরামপুর ও কোন্নগরের একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস। ...,... গ্রন্থখানি কেবল মাত্র সুপাঠ্য নয় বরঞ্চ কৌতুহলোদ্দীক।

চৈতন্য যুগ থেকে আরম্ভ করে ১৯৭৫ সালে রিষড়া পৌর সভার হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ধারা বিবরণী এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস পরিক্রমায় গ্রন্থকার যে ভাবে ঘটনা পঞ্জীর উল্লেখ করেছেন তাতে কেবল মাত্র ইতিহাস পাঠের ঔৎসুক্য মেটেনা বরঞ্চ মনে হয় তিনি যেন একখানি জীবন উপন্যাসের পাতা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উন্মোচন করে চলেছেন।...... হুগলী জেলার প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার, মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনে এই দুইখণ্ড গ্রন্থ থাকা প্রয়োজন। আশাকরি রিষড়া, শ্রীরামপুর ও কোন্নগর অঞ্চলের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গুলি এই জ্ঞানতপস্বীকে গুণী সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে প্রকৃত একজন গুণীর স্বীকৃতি দেবেন।

৩। ব্রতচারী সখা:— আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯৭৬। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশীর লেখা 'তিন শতককের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র' পড়ে সকলেই ধন্য ধন্য করবেন। এর দুই খণ্ডই ঐতিহ্যপূর্ণ নানা ছবিতে সমৃদ্ধ, তার মধ্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য-তথ্য মূলক। দেশের প্রায় লুপ্ত অতীতের সংগে পরিচিত হবার সাথে সাথে বর্ত্তমান ইতিহাস রচয়িতার কাছে বা অনুসন্ধিৎসু জন-সমাজের কাছে এই বই বহু মূল্যবান। বইখানির সর্ববিধ বিবরণ সংগ্রহ করতে পাকড়াশী মহাশয়কে যে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি নিজ জাতীয় ইতিহাস খুঁজতে বিদেশীর লেখা হাতড়ে বেড়ায়; কিন্তু হুগলী জেলার অতি প্রাচীন নগরী রিষড়ার যে সকল বৃত্তান্ত পাকড়াশী মহাশয় প্রকাশ করেছেন তা পড়লে সকলেই চমৎকৃত হবেন এবং তিনিও চির আদৃত হবেন। পাকড়াশী মহাশয় দীর্ঘজীবি হয়ে তাঁর অপূর্ব গবেষণা লব্ধ তথ্য প্রকাশে আমাদের ধন্য করুন- এই প্রার্থনা করি,...।

৪। তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র' গ্রন্থের দুটি খণ্ডই খুব আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিলাম। প্রামাণ্য ও তথ্যনিষ্ঠ এই গ্রন্থ সংকলন কেবলমাত্র রিষড়াই নয়, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী এবং সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকূল অঞ্চলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম বিবর্ত্তনের একটি মনোজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। অতীতের সঠিক পরিচিতি ও মূল্যায়নই বর্ত্তমানের ভিত্তি এবং বর্ত্তমানের সঠিক উপলব্ধিই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বহন করে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী মহাশয়ের সযত্ন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা-প্রসূত এই ঐতিহাসিক গবেষণা বাঙালীর নিজস্ব মহামূল্য সম্পদের তালিকায় আরও একটি অমূল্য সংযোজন এবং ইহার জন্য শুধু মাত্র রিষড়াবাসীই নহে প্ররন্তু বাঙালী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

১০ই জৈষ্ঠ্য, ১৩৮৩ শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

(ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ-হাওড়া)

।৫ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী রচিত 'তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র ১ম খণ্ড "গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম।

রিষড়াকে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী তথ্য সমগ্র পশ্চিমঙ্গের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে। পরিণত বয়সে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এই তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি রচনা করিতে পাকড়াশী মহাশয় যে কঠোর পরিশ্রম, অদম্য অধ্যবসায়, অসিম ধৈর্য্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বোতো ভাবে অভিনন্দন যোগ্য।

তাঁহার প্রতিবেশী অঞ্চলের একজন নাগরিক হিসাবে ভবিষ্যৎকালে কোন্নগরের ইতিহাস রচনায় এই গ্রন্থ খানি যে বিশেষ সহায়ক হইবে আমার পক্ষ হইতে সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডগুলি দেখিবার প্রত্যাশায় আমরা উদগ্রীব রহিলাম।

তদুদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের নিকট পাকড়াশী মহাশয়ের নিরাময় শরীর ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

কোন্নগর নীলমনি বন্দ্যোপাধ্যায়

অমোর চতুর্দশী, ভাদ্র ১৩৮৩ ২৪।৮।৭৬

(ডাঃ নীলমনি বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি)